কানুনে শরীয়ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

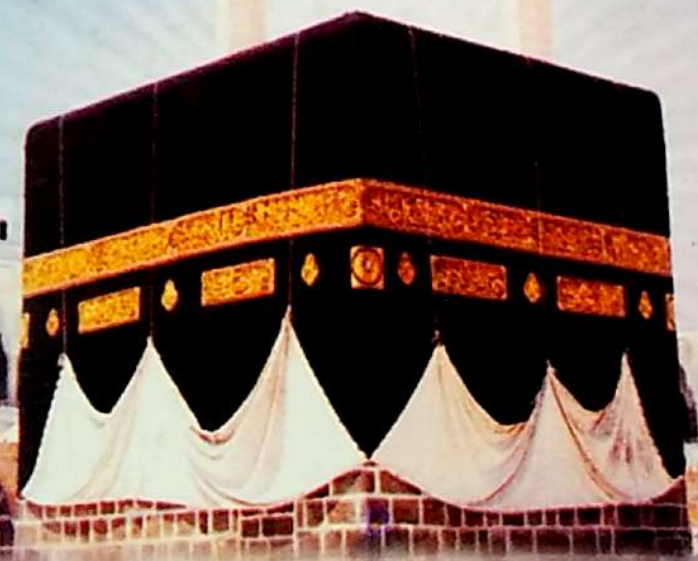

-ঃ প্রকাশক ঃ-

মোঃ সাঈদুর রাহামান আশরাফী

সাঈদ বুক ডিপো

কালিয়াচক (নিউ মার্কেট) রুম নং-৫০

জেলা মালদহ (পঃবঃ) ৭৩২২০১

ফোন ঃ ০৩৫১২-২৪৪১৪৮

মোবাইল ঃ ৯৯৩৩৪৯৪৬৭০

৭৮৬ / ৯২

কানুনে শরীয়ত

(১ম খন্ড)

(আকাইদ, নামাজ, রোযা, যাকাত, কুরবানী ও আকীকার বর্ণনা)

-ঃ মূল ঃ-

হযরাতুল আল্লামা শামসুদ্দিন আহমদ জাফরী রিজভী

(রহমতুল্লাহে তাআলা আলাইহে)

-ঃ অনুবাদক ঃ-

অধ্যাপক মুহাম্মাদ লুৎফুর রাহামান

pdf By Syed Mostafa Sakib

-ঃ প্রকাশক ঃ-

মোঃ সাঈদুর রাহামান আশরাফী

সাঈদ বুক ডিপো

কালিয়াচক (নিউ মার্কেট) রুম নং-৫০

জেলা মালদহ (পঃবঃ) ৭৩২২০১

ফোন ঃ ০৩৫১২-২৪৪১৪৮

মোবাইল ঃ ৯৯৩৩৪৯৪৬৭০

-ঃ প্রকাশক ঃ-
মোঃ সাঈদুর রাহামান আশরাফী
সাঈদ বুক ডিপো
কালিয়াচক (নিউ মার্কেট) রুম নং-৫০
জেলা মালদহ (পঃবঃ) ৭৩২২০১
ফোন ঃ ০৩৫১২-২৪৪১৪৮
মোবাইল ঃ ৯৯৩৩৪৯৪৬৭০

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ-১লা জানুয়ারী ২০০৯

মূল্য ১০০ টাকা মাত্র

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-
সাঈদ বুক ডিপো
কালিয়াচক (নিউ মার্কেট) রুম নং-৫০
জেলা মালদহ (পঃবঃ) ৭৩২২০১
ফোন ঃ ০৩৫১২-২৪৪১৪৮
মোবাইল ঃ ৯৯৩৩৪৯৪৬৭০

অনুবাদকের কথা

আল্লামা শামসুদ্দীন জাফরী রিজভী রচিত কানুনে শরীয়ত হচ্ছে বাহারে শরীয়তের সংক্ষিপ্ত সার। বাহারে শরীয়তের মত শরীয়তের প্রায় মাসায়েল এ কিতাবে স্থান পেয়েছে। তবে সাধারণ পাঠকদের সুবিধার্থে শুধু সঠিক মাসআলাগুলো বর্ণিত হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও দলীল প্রমাণাদি বর্জন করা হয়েছে। অবশ্য আগ্রহী পাঠকদের সুবিধার্থে প্রতিটি মাসআলার শেষে সূত্র উল্লেখিত হয়েছে, যেন প্রয়োজন বোধে যাচাই করে দেখতে পারেন। কিতাবটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। ছাত্র-জনতা নির্বিশেষে সকলের জন্য কিতাবটি খুবই উপকারী।

বাংলা ভাষাভাষীদের উপকারের কথা বিবেচনা করে কিতাবটি বঙ্গানুবাদ করলাম। আশা করি প্রত্যেকের কাছে কিতাবটি সমাদৃত হবে। এ কিতাবে এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ খুটিনাটি মাসায়েল বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো অন্যান্য কিতাবে সচরাচর দেখা যায় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ সংক্ষিপ্ত কিতাবটি যে পূর্ণ আয়ত্ব করতে পারবে, ওর অন্য আর কোন মাসলা-মাসায়েলের কিতাব দেখার প্রয়োজন হবে না এবং কোন আলেমের কাছেও ধর্না দিতে হবে না।

কিতাবটি খালেছ দীনি খেদমতের নিয়তে অনুবাদ করেছি। তাই পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ, কিতাবটি পড়ে উপকৃত হলে, অন্যান্য ইসলামী ভাইবোনদেরকেও পড়ার জন্য অনুপ্রানিত করবেন যেন কিতাবটি প্রত্যেকের হাতে পৌঁছে যায়। আর কোন ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে, মেহেরবানী করে দীনি কর্তব্য মনে করে অবহিত করাবেন, যেন পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিতে পারি।

পরিশেষে সকলের দুআ কামনা করি, আল্লাহ তাআলা যেন এ ধরণের অন্যান্য কিতাব অনুবাদ করার তৌফিক দান করেন। আমীন!

অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

কিতাবটি প্রকাশিত হওয়ার দু'বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু নানা প্রতিকুল অবস্থার কারণে সাথে সাথে পুঃমুদ্রণ করা সম্ভব হয়নি। যাহোক পাঠকদের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে কিতাবটি নতুন সাজে পুণঃপ্রকাশ করলাম। আশা করি সুধী পাঠক মহলের মনঃপুত হবে।

প্রকাশক

pdf By Syed Mostafa Sakib

মূল লেখকের ভূমিকা

নাহমাদুহু ওয়া নুছল্লী আলা রাসুলিহির করীম

যেহেতু মানুষের পরিপূর্ণতা ও সৌভাগ্য ঈমান ও আমলের বিশুদ্ধতার উপর নির্ভরশীল এবং যেহেতু দীনি ইল্‌ম ছাড়া অসম্ভব, সেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তির, যে স্বীয় জিন্দেগীকে সৎ ও সাফল্যমণ্ডিত করতে চায়, দীনি ইল্‌ম হাছিল করা আবশ্যক।

দীনি ইল্‌ম চার প্রকার। প্রথম প্রকারে ওসমস্ত মাসায়েল অন্তর্ভূক্ত, যেগুলো ঈমান ও আক্বীদার সাথে সম্পর্কিত (যেমন তওহীদ, রেসালত, নাবুয়াত, জান্নাত, দোযখ, হাশর, ছওয়াব, আযাব ইত্যাদি) দ্বিতীয় প্রকারে ওসমস্ত বিষয় রয়েছে, যেগুলো শারীরিক ও অর্থনৈতিক ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত। (যেমন নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি)। তৃতীয় প্রকারে ওসমস্ত বিষয় রয়েছে, যেগুলো লেনদেন ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত। (যেমন বেচাকেনা, বিবাহ, তালাক, জিহাদ, রাজত্ব রাজনীতি ইত্যাদি)। চতুর্থ প্রকারে ওসমস্ত বিষয় সন্নিবেসিত করা হয়েছে, যেগুলো স্বভাব-চরিত্র, জজবা, সংযম ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত। (যেমন বীরত্ব, দানশীলতা, সবর, শোকর ইত্যাদি)।

এ চার প্রকার দীনি বিষয় এক সাথে প্রকাশ করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কিতাব অধিক বড় হয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে দু'খণ্ড করতে হলো। প্রথম খণ্ডে আকাইদ, নামায, রোযা, যাকাত, কুরবানী ও আক্বীকার মাসায়েল বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে হজ্ব, নিকাহ, তালাক, বেচাকেনা, জায়েয-নাজায়েয ইত্যাদির মাসায়েল বর্ণিত হয়েছে।

এ কিতাবে ইমামদের মতভেদের কথা উল্লেখিত হয়নি। সংক্ষিপ্তকরণ ও সাধারণ পাঠকদের বোধগম্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে শুধু সঠিক মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। অধিকন্তু এ কিতাবে কেবল খুবই জরুরী ও নিত্য প্রয়োজনীয় মাসআলাগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিটি মাসআলা সুন্নী হানাফীর একান্ত নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে সংগৃহিত হয়েছে। যতটুকু সম্ভব, ভাষা ও বর্ণনাকে সহজ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আল্লাহ তাবারক তাআলা যেন এ প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। আমীন।

শামসুদ্দীন জাফরী রেজভী

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
❖ আক্বীদার বর্ণনা	১
আল্লাহ তাআলার সত্বা ও গুণাবলী	১
আল্লাহ তাআলা যাবতীয় দোষ থেকে মুক্ত	৪
❖ তকদীরের বর্ণনা	৪
তকদীরের সঠিক অর্থ	৪
তকদীর নিয়ে চিন্তা ভাবনা নিষেধ	৪
❖ নবী ও রসূল	৫
নবী ও রসূলের পার্থক্য	৫
নবীগণের মর্যাদা	৬
আমাদের নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বিশেষ ফযীলত ও কামালিয়াত	৭
❖ মুজেযা	৮
মুজেয়ার অর্থ	৮
❖ আল্লাহর তাআলার কিতাবসমূহ	৯
❖ ফিরিশতাগণের বর্ণনা	৯
❖ জ্বীনের বর্ণনা	১০
❖ মৃত্যু ও কবরের বর্ণনা	১০
❖ কিয়ামতের হাল-হাকিকত ও লক্ষণসমূহ	১৩
❖ শাফায়াত	১৮
❖ শাফায়াতের অধিকারীগণ	১৮
❖ মীযান	২০
❖ পুলছিরাত	২০
❖ হাউজে কাউসার	২০
❖ মকামে মাহমুদ	২০
❖ লেওয়াউল হাম্‌দ	২১
❖ জান্নাতের বর্ণনা	২১
❖ দোযখের বর্ণনা	২১
❖ ঈমান ও কুফরের বর্ণনা	২৩
শিরকের অর্থ	২৪
বিদআতের সংজ্ঞা	২৫
❖ ইমামত ও খিলাফতের বর্ণনা	২৬
খুলাফায়ে রাশেদীন	২৬
সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বায়ত	২৭
❖ বিলায়েতের বর্ণনা	২৮
অলীর সংজ্ঞা	২৯
পীরের মাপকাঠি	২৯

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিষয়	পৃষ্ঠা
❖ নামাযের প্রথম শর্ত পবিত্রতা বর্ণনা	৩১
ওযুর নিয়ম	৩১
গোসলের নিয়ম	৩১
কোন্ ধরণের পানি দ্বারা ওযু-গোসল জায়েয	৩৪
কূপের বর্ণনা	৩৭
নাপাক কূপ পাক করার নিয়ম	৩৯
❖ নাপাকীর বর্ণনা	৪৪
নাজাসতে গলীজা ও খলিফা	৪৫
এঁটো ও ঘামের বর্ণনা	৪৭
❖ তায়াম্মুমের বর্ণনা	৪৮
❖ হায়যের বর্ণনা	৫৬
❖ নিফাসের বর্ণনা	৫৮
হায়েয ও নিফাসের আহকাম	৫৯
❖ ইস্তেহাজার বর্ণনা	৫৯
❖ মাযুরের বর্ণনা	৬০
❖ নাপাক জিনিস পবিত্র করার নিয়ম	৬১
❖ শৌচকার্যের বর্ণনা	৬৬
শৌচকার্যের নিয়ম	৬৬
শৌচকার্যের আগে-পরের দুআ	৬৭
ইসতেবরার নিয়ম	৬৮
❖ নামাযের দ্বিতীয় শর্ত সতরের বর্ণনা	৬৯
পুরুষের সতর	৬৯
মহিলার সতর	৬৯
❖ নামাযের তৃতীয় শর্ত ওয়াক্তের বর্ণনা	৭০
❖ আযানের বর্ণনা	৭৭
আযানের নিয়ম ও শব্দসমূহ	৭৮
❖ ইকামতের বর্ণনা	৮১
❖ নামাযের চতুর্থ শর্ত কিবলামুখি হওয়ার বর্ণনা	৮২
কিবলার বিবরণ	৮২
কোন্ অবস্থাসমূহে কিবলা ভিন্ন অন্য দিকে নামায পড়া যায়	৮২
❖ নামাজের পঞ্চম শর্ত নিয়তের বর্ণনা	৮২
❖ নামাজের ষষ্ঠ শর্ত তকবীর তাহরীমার বর্ণনা	৮৪
নামাযের নিয়ম	৮৪
❖ সিজদায়ে সহুর বর্ণনা	৮৪
❖ তিলাওয়াতে সিজদার বর্ণনা	৮৯
❖ বৈঠক পরিবর্তনের বিবরণ	৯২
❖ কিরাতের বর্ণনা	৯৪
কিরাতে ভুল হয়ে যাওয়ার বর্ণনা	৯৫
নামাযের বাইরে কুরআন শরীফ পড়ার বর্ণনা	৯৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
❖ জমাতের বর্ণনা	১০১
ছানি জমাতের বর্ণনা	১০২
যে সমস্ত অজুহাতে জমাত ত্যাগ করা যায়	১০২
ইমামের যোগ্যতা	১০৩
মসবুক সম্পর্কিত মাসায়েল	১০৪
জামাত কায়েম করার নিয়ম	১০৭
আমলে কছীর ও কলীল	১০৯
❖ সুতরার বর্ণনা	১১১
❖ নামাযের মকরূহ সমূহের বর্ণনা	১১২
মকরূহ তাহরীমী	১১২
মকরূহ তানযীহ	১১২
নামায ভঙ্গের অজুহাতসমূহ	১১৫
❖ মসজিদের হুকমাদি	১১৭
❖ বিতরের নামায	১১৭
দু'আ কুনুত ও এর হুকুম	১২০
❖ সুন্নাত ও নফল নামায সমূহের বর্ণনা	১২২
❖ তাহাজ্জুদের নামায	১২৪
❖ ইশরাকের নামায	১২৪
❖ চাশতের নামায	১২৪
❖ ইস্‌তেখারার নামায	১২৪
❖ তারাবীহের নামায	১২৭
❖ রোগীর নামায	১২৯
❖ কাযা নামাযের বর্ণনা	১৩০
কাযা নামাযসমূহে তরতীব ওয়াজিব হওয়ার বর্ণনা	১৩২
❖ নামাযের ফিদয়া	১৩৪
❖ মুসাফিরের নামাযের বর্ণনা	১৩৫
মুসাফিরের হুকমাদি	১৩৬
মহিলার মোহরেম বিনা সফর জায়েয নেই	১৩৯
❖ বাহনের উপর নামায পড়ার বর্ণনা	১৩৯
চলন্তগাড়ীতে নামাযের হুকমাদি	১৪০
নৌকা বা জাহাজে নামায পড়ার হুকমাদি	১৪০
❖ জুমার বর্ণনা	১৪১
জুমার শর্তসমূহ	১৪১
জুমার নামায কে পড়াতে পারেন	১৪১
জুমার খুতবা ও কিছু মাসায়েল	১৪২
❖ দু'ঈদের বর্ণনা	১৪৯
ঈদের দিনে মুস্তহাব বিষয়সমূহ	১৪৯
ঈদের নামাযের নিয়ম	১৪৯
বকর ঈদের নামাযের সময়	১৫০
তকবীর তশরীফ	১৫২
❖ গ্রহণের নামায	১৫৩

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিষয়	পৃষ্ঠা
❖ জানাযার বর্ণনা	১৫৪
❖ কাফনের বর্ণনা	১৬২
কাফন পরিধান করানোর নিয়ম	১৬৪
❖ জানাযা নিয়ে যাবার নিয়ম	১৬৪
জানাযার নামাযের বর্ণনা	১৬৫
জানাযার নামাযের দুআ	১৬৬
জানাযার নামাযে ইমামতির হকদার	১৬৯
❖ কবর ও দাফনের বর্ণনা	১৭০
কবরের দৈর্ঘ-প্রস্থ	১৭০
কবরের উপর গুম্বুজ তৈরী ও পাকা করার বর্ণনা	১৭২
কবর যিয়ারত	১৭৩
❖ ইসালে ছওয়াবের বর্ণনা	১৭৪
শোক প্রকাশ	১৭৫
বিলাপ করা	১৭৭
❖ শহীদের বর্ণনা	১৭৭
❖ রোযা	১৭৯
চাঁদ দেখার বর্ণনা	১৮১
রোয়া ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের বর্ণনা	১৮৪
রোযা ভঙ্গের ওসব অবস্থাদির বর্ণনা যেগুলোর বেলায় কেবল কাযা ওয়াজিব	১৮৬
রোযা ভঙ্গের ওসব অবস্থাদি, যে সবের বেলায় কাফ্ফারাও প্রয়োজন	১৮৮
কাফ্ফারা আবশ্যক হওয়ার শর্তসমূহ	১৮৮
যেসব বিষয় দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না	১৮৯
রোযার মকরূহসমূহের বর্ণনা	১৯১
ইফতার-সাহরীর বর্ণনা	১৯২
ইফতারের দুআ	১৯৩
কোন্ কোন্ অবস্থায় রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে	১৯৪
❖ কয়েকটি নফল রোযার ফযীলত	১৯৬
❖ ইতেকাফের বর্ণনা	১৯৮
❖ যাকাতের বর্ণনা	১৯৮
সোন-চান্দি ও বাণির্জ্যিক মালামালের যাকাত	২০৫
চারণভূমিতে পালিত পশুর যাকাত	২০৮
ক্ষেত ও ফসলের যাকাত	২১০
যাকাত কোন্ ধরণের লোকদেরকে দেয়া যায়	২১৩
মিসকীন ও ফকীরের পার্থক্য	২১৩
❖ সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ	২১৭
সদকায়ে ফিতরের হকদার	২১৯
❖ কুরবানীর বর্ণনা	২১৯
কুরবানীর সময়	২২০
অংশীদারী কুরবানীর মাসায়েল	২২০
❖ আকীকার বর্ণনা	২২৩

আকীদাসমূহের বর্ণনা

আল্লাহ তাআলার সত্বা ও গুণাবলী সম্পর্কিত আকীদাসমূহ

আকীদা নং ১ঃ আল্লাহ এক, পবিত্র, অতুলনীয় ও নিষ্কলঙ্ক। তিনি প্রত্যেক পরিপূর্ণতা ও সৌন্দর্যের সমষ্টি । কেউ কোন বিষয়ে তাঁর অংশীদার নয়, বরাবর বা অগ্রগামীও নয়। তিনি তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলী সহকারে সব সময় আছেন এবং সব সময় থাকবেন। চিরস্থায়ী কেবল তাঁর সত্বা ও গুণাবনীর জন্যই নির্দিষ্ট। তিনি ব্যতীত সমস্ত কিছু আগে ছিলনা, তিনি সৃষ্টি করার দ্বারা হয়েছে। তিনি নিজে নিজেই। তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি। তিনি কারো বাপও নন, বেটাও নন। তাঁর কোন স্ত্রী স্বজন নেই। সব কিছু থেকে তিনি স্বাধীন। তিনি কোন বিষয়ে কারো মুখাপেক্ষী নন, কিন্তু সবকিছু তাঁর মুখাপেক্ষী। রিজিক প্রদান, জন্ম, মৃত্যু তাঁরই অধীনে। তিনি সবের মালিক, যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। তাঁর নির্দেশে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না, তাঁর মর্জি ব্যতীত এক বিন্দুও এদিক সেদিক হতে পারেনা। তিনি প্রত্যেক প্রকাশিত, লুক্কায়িত, ঘটিত ও অঘটিত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত। কোন জিনিষ তাঁর ইলমের বহির্ভূত নেই, সমগ্র জগতের সব কিছু তাঁরই সৃষ্টি। সব তারই বান্দা। তিনি স্বীয় বান্দাদের জন্য মা-বাপ থেকে অধিক মেহেরবান দয়ালু, ক্ষমা প্রদান কারী ও তওবা গ্রহণকারী। তাঁর ধরা খুবই কঠিন। তিনি রেহাই না দিলে এ ধরাটা থেকে কেউ রেহাই পেতে পারে না। সম্মান অপমান তাঁরই ইচ্ছাধীন। যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন, যাকে ইচ্ছে অপদস্থ করেন। ধন সম্পদ তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। যাকে ইচ্ছে আমীর এবং যাকে ইচ্ছে ফকীর করেন। হেদায়েত ও গোমরাহী তাঁরই পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। যাকে ইচ্ছে ঈমান নসীব করেন এবং যাকে ইচ্ছে কুফরীতে নিয়োজিত করেন। তিনি যা কিছু করেন,তা হেকমতপূর্ণ ও ন্যায় ভিত্তিক। মুসলমানদেরকে জান্নাত প্রদান করবেন এবং কাফিরদেরকে দোযখের আযাব প্রদান করবেন। তাঁর প্রতিটি কাজ হেকমত পূর্ণ, তা বান্দার বুঝে আসুক বা না আসুক। তাঁর নিয়ামতসমূহ, করুণাসমূহ অসীম। তিনিই একমাত্র ইবাদতের উপযোগী। তিনি ভিন্ন অন্য কেউ ইবাদতের উপযোগী নয়।

আকীদা নং ২ঃ আল্লাহ তাআলা শরীর ও জড়ত্ব থেকে পবিত্র। অর্থাৎ তাঁর কোন শরীর নেই বা তাঁর মধ্যে এমন কিছু নেই যা শরীরের সাথে সম্পর্কিত বরং এটা তাঁর ব্যাপারে অসম্ভব। সুতরাং তিনি স্থান, কাল, দিক, আকৃতি, ওজন, পরিমাণ, কমবেশী, সংশ্রব, সংমিশ্রণ, জন্মগ্রহণ, জন্মদান, নড়াচড়া,

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইস্তেকাল, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ইত্যাদি সমস্ত শারীরিক গুণাবলী ও অবস্থাদি থেকে মুক্ত ও পবিত্র। কুরআন, হাদীছে এমন যেসব শব্দসমূহ আছে, যেমন –

يَد، وجهه، رجل، ضحك وغيره (আল্লাহর হাত, পা, চেহারা, মুখ ইত্যাদি) যেগুলো বাহ্যিকভাবে শরীরের সাথে সম্পর্কিত বুঝায়, ওগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা গোমরাহী ও বদ মাযহাবীর পরিচায়ক। এ ধরণের শব্দসমূহের ব্যাখ্যামূলক অর্থ গ্রহণ করতে হয়। কেননা ওগুলোর বাহ্যিক অর্থ হতে পারে না, যা আল্লাহর ব্যাপারে অসম্ভব। যেমন 'হাত' দ্বারা কুদরত, 'চেহারা' দ্বারা সত্ত্বা 'বরাবর' দ্বারা প্রাধান্য ও মনোনিবেশের ভাবার্থ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু উত্তম ও উৎকৃষ্ট হচ্ছে, বিনা প্রয়োজনে যেন তাবীল বা ব্যাখ্যামূলক অর্থও গ্রহণ করা না হয়। তবে হক হওয়া সম্পর্কে যেন ধারণা রাখা হয় এবং ভাবার্থ যেন আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়া হয়। অর্থাৎ এর ভাবার্থ তিনিই জানেন। আমাদের তো আল্লাহ ও রসুলের উক্তির উপর ঈমান আছে, আল্লাহর জ্ঞান বুদ্ধি ও হাত আছে , তবে তার জ্ঞান বুদ্ধি বা হাত সৃষ্ট জীবের অনুরূপ নয়। তাঁর দেখা, শোনা ও কথা বলা মখলুকের অনুরূপ নয়।

আকীদা নং ৩ঃ আল্লাহ তাআলার সত্ত্বা ও গুণাবলী সৃষ্টও নয়, সীমিতও নয়।

আকীদা নং ৪ঃ আল্লাহর সত্ত্বা ও গুণাবলী ব্যতীত যত কিছু আছে, সব কিছু নশ্বর অর্থাৎ প্রথমে ছিল না, পরে হয়েছে।

আকীদা নং ৫ঃ আল্লাহ তাআলার গুণাবলীকে সৃষ্ট বলা বা নশ্বর বলা গোমরাহী ও বিভ্রান্তির পরিচায়ক।

আকীদা নং ৬ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সত্ত্বা ও গুনাবলী ব্যতীত অন্য কোন জিনিষকে অবিনশ্বর মনে করে বা পৃথিবী নশ্বর হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে, সে কাফির।

আকীদা নং ৭ঃ আল্লাহ তাআলা যে রকম পৃথিবী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা, অনুরূপ আমাদের সমস্ত আমল, কর্মেরও তিনি সৃষ্টি কর্তা। আল্লাহ তাআলা ওয়াজিবুল ওজুদ অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্ব অপরিহার্য এবং অস্তিত্বহীন অসম্ভব।

আকীদা নং ৮ঃ কোন জিনিষ আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের বাইরে নয়। বর্তমান হোক বা অবর্তমান, সম্ভব হোক বা অসম্ভব, পরিপূর্ণ হোক বা আংশিক, সমস্ত কিছুকে আদি কাল থেকে জানতেন, এখনও জানেন এবং অনন্তকাল পর্যন্ত জানবেন। জিনিষসমূহ পরিবর্তন হয় কিন্তু তার জ্ঞান পরিবর্তন হয় না। মনের কল্পনা ও ধারণা সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত। তাঁর জ্ঞানের কোন শেষ নেই।

আকীদা নং ৯ঃ আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় ও ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছু হতে পারে না। কিন্তু তিনি ভাল কাজের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং অসৎ কাজের প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

আকীদা নং ১০ঃ আল্লাহ তাআলা সম্ভাব্য সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। সম্ভাব্য কোন কিছু তাঁর কুদরতের বাইরে নয়। অসম্ভব কোন কিছু কুদরতের অন্তর্ভূক্ত নয়। অসম্ভবের উপর কুদরত রাখা মনে করাটা আল্লাহর একত্বের অস্বীকার করার সামীল।

আকীদা নং ১১ঃ ভাল ও মন্দ, কুফর ও ঈমান, আনুগত্য ও পাপ আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্দিষ্ট ও সৃষ্ট।

আকীদা নং ১২ঃ মূলতঃ রিজিক দাতা আল্লাহ তাআলাই। ফিরিশতা ইত্যাদি হলো ওসীলা এবং মাধ্যম মাত্র।

আকীদা নং ১৩ঃ আল্লাহ তাআলার জিম্মায় কোন কিছু অপরিহার্য নয়। যেমন ছওয়াব দান করা বা শাস্তি দেয়া বা এমন কাজ করা, যা বান্দার জন্য উপকারী। কারণ তিনি সর্বশক্তিমান। যা ইচ্ছে তা করেন, যা ইচ্ছে তা নির্দেশ দেন। ছওয়াব দেয়াটা তাঁর করুণা। আজাব দেয়াটা তাঁর ইনসাফ। তবে এটা তাঁর বড় মেহেরবানী যে তিনি তা–ই নির্দেশ দেন, যা বান্দা করতে পারে। মুসলমানদেরকে নিশ্চয়ই স্বীয় মেহেরবানীতে জান্নাত দান করবেন। আর কাফিরদেরকে স্বীয় ন্যায় বিচারে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। কারণ তিনি ওয়াদা করেছেন কুফর ভিন্ন যে কোন গুনাহ ইচ্ছে করলে মাফ করে দিবেন। তাঁর ওয়াদা ও ভীতি পরিবর্তন হয়না। এ জন্য আযাব ও ছওয়াব নিশ্চয়ই হবে।

আকীদা নং ১৪ঃ আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোন লাভ–ক্ষতি নেই। কেউ তাঁর লাভ–ক্ষতি করতে পারে না। তিনি যা কিছু করেন এতে তাঁর নিজস্ব কোন লাভ–ক্ষতি নেই। দুনিয়া সৃষ্টি করার মধ্যে তাঁর কোন লাভ নেই। না করার মধ্যে তাঁর কোন ক্ষতি নেই। স্বীয় ফজল, ইনসাফ, কুদরত, ও কামালিয়াত প্রকাশ করার জন্য মখলুককে সৃষ্টি করেছেন।

আকীদা নং ১৫ঃ আল্লাহ তাআলার প্রতিটি কাজে অনেক হেকমত রয়েছে, তা আমাদের বুঝে আসুক বা না আসুক। এটা তাঁর হেকমত যে দুনিয়ার এক জিনিষকে অপর জিনিষের উপায় পরিণত করেছেন। যেমন আগুনকে গরম পৌছানোর উপায়, পানিকে ঠান্ডা পৌছানোর উপায় করেছেন। চোখকে দেখার জন্য, কানকে শোনার জন্য সৃষ্টি করেছেন। যদি তিনি ইচ্ছে করেন, তাহলে

pdf By Syed Mostafa Sakib

আগুন ঠান্ডা দায়ক, পানি গরম দায়ক, চোখ শ্রবণকারী, কান দর্শনকারী হতে পারে।

আক্বীদা নং ১৬ঃ আল্লাহ তাআলার জন্য সব রকমের কলংক ও দুর্বলতা অসম্ভব। যেমন মিথ্যা, মূর্খতা, ভুল-ভ্রান্তি, জুলুম, নির্লজ্জতা ইত্যাদি মন্দ কাজ সমূহ আল্লাহর জন্য অসম্ভব। যারা এটা মনে করে যে আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন, কিন্তু বলেন না, তারা সম্ভবত মনে করে যে আল্লাহ কলংকময় বটে, তবে স্বীয় কলংক গোপন করেন। শুধু মিথ্যা কেন সকল মন্দ কাজের যেমন জুলুম, চুরি, যেনা, জন্মদান ইত্যাদি নিন্দনীয় দোষসমূহের একই অবস্থা হবে অর্থাৎ তিনি ক্ষমতা রাখেন কিন্তু করেন না। অথচ আল্লাহ তাআলা এসব থেকে অনেক উর্ধে। আল্লাহ তাআলার জন্য কোন দুর্বলতা ও দোষণীয় কাজকে সম্ভব মনে করাটা আল্লাহকে দোষত্রুটি পূর্ণ মনে করারই নামান্তর। বরং আল্লাহকে অস্বীকার করা বুঝায়। এ রকম নিকৃষ্ট আক্বীদাসমূহ থেকে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক লোককে রক্ষা করুক।

তকদীর

তকদীরঃ আল্লাহ তাআলার জ্ঞানে পৃথিবীতে যা কিছু হওয়ার ছিল এবং বান্দা যা কিছু করার ছিল তা আগে থেকে জেনে আল্লাহ তাআলা লিখে রেখেছেন, কারো কিসমতে কল্যাণ এবং কারো কিসমতে অকল্যাণ লিখেছেন; এ লিখে দেয়ার দ্বারা বান্দাকে বাধ্য করে দেয়া হয়নি অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা লিখে দিয়েছেন বলে বান্দাকে বাধ্যগত করতে হয়। বরং বান্দা যে রকম করার ছিল সে রকমই তিনি লিখে দিয়েছেন। কোন ব্যক্তির ভাগ্য মন্দ লিখেছেন, কারণ সে মন্দকারী ছিল। যদি সে সৎকাজকারী হতো ওর ভাগ্যে কল্যাণই লিখতেন। আল্লাহ তাআলার জ্ঞান বা লিখা কাউকে বাধ্য করেননি।

মাসআলাঃ তকদীরের বিষয়ে চিন্তাভাবনা, তর্কবিতর্ক নিষেধ। এতটুকু বুঝে নেয়া চাই যে মানুষ পাথরের মত একেবারে অক্ষম নয় বরং আল্লাহ তাআলা মানুষকে এক প্রকার ইখতিয়ার দিয়েছেন যে একটি কাজ ইচ্ছে করলে করতে পারে আবার নাও করতে পারে। এ ইখতিয়ারের ভিত্তিতে ভালমন্দের ভাগী বান্দাকে করা হয়। নিজেকে একেবারে অক্ষম বা একেবারে স্বাধীন মনে করা উভয়টা গোমরাহী।

মাসআলাঃ মন্দ কাজ করে 'খোদার ইচ্ছায় হয়েছে বা তকদীরে ছিল বলে করেছে' এ রকম বলা অনুচিত ও বেআদবী। বরং শরীয়তের নির্দেশ হচ্ছে ভাল কাজকে আল্লাহর প্রতি এবং মন্দ কাজকে স্বীয় নফসের কুপ্রবৃত্তির প্রতি ইঙ্গিত করা চাই।

নবী ও রসুল

আল্লাহ তাআলার সত্বা ও গুণাবলী সম্পর্কে জানা যেমন প্রয়োজন, তেমনি এটাও জানা প্রয়োজন যে নবীর জন্য কি কি বিষয় হওয়া চাই এবং কি কি না হওয়া চাই, যাতে মানুষ কুফরী থেকে বিরত থাকে।

রসুলের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সেখান থেকে বান্দাদের কাছে আল্লাহর পয়গাম আনয়নকারী আর নবী হচ্ছে যার কাছে ওহী হয় অর্থাৎ লোকদেরকে আল্লাহর রাস্তা প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর পয়গাম আসা। এ পয়গাম নবীর কাছে হয়তো ফিরিশতা নিয়ে আসতে পারে অথবা স্বয়ং নবী প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞাত হতে পারেন। রসুলদের মধ্যে কিছু নবী আছেন এবং ফিরিশতাদের মধ্যে কিছু রসুল আছেন, সকল নবী পুরুষ ছিলেন। কোন জ্বীন বা মহিলা নবী হয়নি। ইবাদত রিয়াজত দ্বারা মানুষ নবী হয়নি। আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীর দ্বারাই নবী হয়েছেন। এ ব্যাপারে মানুষের প্রচেষ্টায় কোন কাজ হয় না। অবশ্য আল্লাহ তাআলা ওকেই নবী মনোনীত করেন, যাকে এ দায়িত্বের উপযোগী করে সৃষ্টি করেন, যিনি নবী হওয়ার আগে থেকেই সমস্ত মন্দ কাজ থেকে দূরে সরে থাকেন এবং ভাল কাজে নিয়োজিত থাকেন। নবীর মধ্যে এমন কোন বিষয় থাকে না, যার জন্য মানুষ ঘৃণা করতে পারে। নবীর চাল-চলন, আকার আকৃতি, বংশ, স্বভাব চরিত্র, কথাবার্তা সবকিছু উত্তম ও নিষ্কলুষ হয়ে থাকে। নবীর জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। নবী সকল লোক থেকে অধিক বুদ্ধিমান হয়ে থাকে। বড় বড় ডাক্তার দার্শনিকের জ্ঞান নবীর জ্ঞানের লক্ষ ভাগের এক ভাগও হতে পারে না। যে এটা বিশ্বাস করে যে কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রচেষ্টায় নবী হতে পারে, সে কাফির। যে এটা মনে করে যে, নবীর নাবুয়াত প্রত্যাহার করা যেতে পারে, সেও কাফির। নবী ও ফিরিশতা নিষ্পাপ হয়ে থাকে অর্থাৎ গুনাহের থেকে কোন গুনাহ প্রকাশ পেতে পারে না। নবী ও ফিরিশতা ব্যতীত কোন ইমাম বা ওলীকে নিষ্পাপ বলে বিশ্বাস করা গোমরাহী ও বদ মাযহাবী। যদিওবা ইমামগণ ও প্রখ্যাত ওলীগণ থেকেও গুণাহ হয় না তবে কোন সময় কোন গুনাহ হয়ে গেলে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে অসম্ভবও নয়। আল্লাহর পয়গাম পৌছানোর ব্যাপারে নবীর কোন ভুল ত্রুটি হতে পারে না, তা অসম্ভব। যে এ রকম বলে যে কিছু আহকাম জনগণের ভয়ে বা অন্য কারণে পৌছায়নি, সে কাফির। নবীগণ সমস্ত মখলুক থেকে উৎকৃষ্ট। এমনকি ওসব ফিরিশতাদের থেকেও আফজল, যারা রসুল মনোনীত। ওলী যত বড় মর্যাদাশালী হোক না কেন, কোন নবীর বরাবর হতে পারে না। যে নবী ভিন্ন অন্য কাউকে নবী থেকে আফজল বলে, সে কাফির।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আকীদা নং ১ঃ নবীর তাজীম ফরযে আইন বরং সমস্ত ফরযসমূহের মূল। কোন নবীর যৎসামান্য নিন্দা বা অস্বীকৃতি কুফরী। (শিফা, হিন্দীয়া ইত্যাদি) সমস্ত নবী আল্লাহ তাআলার কাছে বড় সম্মানিত ও মর্যাদাশালী। ওনাদেরকে আল্লাহ তাআলার কাছে (মাজাল্লা) নগণ্য চামারের মত বলা সুস্পষ্ট বেআদবী এবং কুফরী। নবীগণ (আলাইহিস সালাম) নিজ নিজ কবরে ওরকম জীবিত, যে রকম পৃথিবীতে ছিলেন। আল্লাহ তাআলার ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য এক মুহূর্তের জন্য ওনাদের মৃত্যু হয়েছিল। পুনরায় জীবিত হয়ে গেছেন। তাঁদের জিন্দেগী শহীদদের জিন্দেগী থেকে অনেক উর্ধে।

আকীদা নং ২ঃ আল্লাহ তাআলা নবীগণকে অদৃশ্য বিষয়সমূহ জ্ঞাত করায়েছেন। আসমান জমীনের প্রতিটি কণা প্রত্যেক নবীর সামনে সুস্পষ্ট। তাদের এ অদৃশ্য জ্ঞান খোদা প্রদত্ত। সুতরাং তাঁদের এ জ্ঞান প্রদত্ত জ্ঞান হিসেবে গণ্য এবং আল্লাহ তাআলার জ্ঞান যেহেতু কারো প্রদত্ত নয় বরং তাঁর নিজস্ব, তাই এ জ্ঞান সত্ত্বাগত হিসেবে গণ্য। এবার যখন আল্লাহ তাআলা এবং রসুলের জ্ঞানের পার্থক্য জানা গেল, তাহলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে নবী ও রসুলের বেলায় খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়বের অধিকারী বলে বিশ্বাস করা শিরক নয় বরং ঈমানের অংশ যা বিভিন্ন আয়াত ও হাদীছসমূহ থেকে প্রমাণিত।

আকীদা নং ৩ঃ কোন উম্মত ইবাদত, আনুগত্য, তাকওয়া, সাধনায় নবী থেকে অগ্রগামী হতে পারে না। নবীগণ নিদ্রায়-জাগরণে সব সময় আল্লাহর যিকরে নিয়োজিত থাকেন।

আকীদা নং ৪ঃ নবীদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা না জায়েয। তাঁদের সঠিক সংখ্যা, সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলারই আছে।

নবীগণের মর্যাদা

হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) সর্ব প্রথম মানুষ, তাঁর আগে মানুষের অস্তিত্ব ছিল না। সমস্ত মানুষ তাঁরই ঔরসজাত। তিনিই সর্বপ্রথম নবী। আল্লাহ তাআলা তাঁকে মা-বাপ ছাড়া মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর খলীফা মনোনীত করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সমস্ত জিনিষ ও এ সবের নাম শিখায়েছেন।

ফিরিশতাগণকে হুকুম দেয়া হলো–আদমকে সিজদা কর। শয়তান ব্যতীত সবাই সিজদা করলেন। শয়তান অমান্য করলো, ফলে চিরকালের জন্য অভিশপ্ত ও মরদুদ হয়ে গেল। হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে শুরু করে আমাদের নবী মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম)

পর্যন্ত অনেক নবী আগমন করেন। হযরত নূহ (আলাইহিস সালাম) হযরত ইব্রাহীম, হযরত মুসা, হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এ চার জন নবী ও রসুল ছিলেন। সর্বশেষ নবী ও রসুল হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ, সবের পেশওয়া, খোদার হাবীব, আমাদের আকা হযরত আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পরে কোন নবী হয়নি, হবে না। যে ব্যক্তি আমাদের নবীর পরে বা তাঁর যুগে অন্য কোন নবী স্বীকার করে বা নাবুয়াত লাভকে জায়েয মনে করে, সে কাফির।

আমাদের নবীর বিশেষ বিশেষ ফযীলত ও কামালিয়াতসমূহ

আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম আমাদের হুযুর (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) কে স্বীয় নূরের তজল্লী দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। ফিরিশতা আসমান-জমীন আরশ-কুরসীও সমস্ত জাহানকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) এর নূরের ঝলক থেকে তৈরী করেছেন। আল্লাহ বা আল্লাহর সমতুল্য জ্ঞাপক বিষয় ব্যতীত যত কামালিয়াত ও সৌন্দর্য আছে, সবকিছু আল্লাহ তাআলা আমাদের হুযুর (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) কে দান করেছেন। সমস্ত জগতে কেউ কোন সৌন্দর্যে হুযুরের বরাবর হতে পারে না। হুযুর সর্ব উৎকৃষ্ট সৃষ্টি এবং আল্লাহ তাআলার পরেই হুযুর (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) এর স্থান। হুযুর (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) সমস্ত নবীদের নবী এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাঁর অনুসরণ অপরিহার্য। আল্লাহ তাআলা তাঁর সমস্ত ভাণ্ডারের চাবিসমূহ হুযুরকে দান করেছেন। দুনিয়া ও দীনের সমস্ত নিয়ামতসমূহ প্রদানকারী হলেন আল্লাহ আর বন্টনকারী হলেন হুযুর (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তাআলা তাঁকে (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) মিরাজ প্রদান করেছেন অর্থাৎ আরশের উপর আহবান করেছেন এবং চাক্ষুস দীদার দান করেছেন, স্বীয় কালাম শুনায়েছেন, জান্নাত, দোযখ, আরশ-কুরসী ইত্যাদি সমস্ত কিছু পরিভ্রমণ করায়েছেন। এ সব কিছু রাতের সামান্য সময়ে ঘটেছিল। কিয়ামতের দিন তিনিই (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) সর্বপ্রথম শাফায়াত করবেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সমীপে লোকদের সুপারিশ করবেন। গুনাহ মাফ করাবেন, পদমর্যাদা বৃদ্ধি করাবেন। এ ছাড়া আরও অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার বর্ণনা এ সংক্ষিপ্ত জায়গায় সম্ভব নয়।

আকীদাঃ যে হুযুর (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) এর

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোন উক্তি, কাজ, আমল ও অবস্থাকে ঘৃণার চোখে দেখে, সে কাফির (কাযী খান, শেফা ইত্যাদি)

মু'জিযা

সেই দুর্লভ ও অদ্ভুত কাজ যা সাধারণত অসম্ভব, নবী স্বীয় নাবুয়াতের সমর্থনে পেশ করেন এবং অস্বীকারকারীরা এর থেকে অপারগ হয়ে যায়, সেটা হচ্ছে মু'জিযা। যেমন মৃতকে জীবিত করা, আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদকে দুটুকরা করা, এরকম দুর্লভ ও অদ্ভুত বিষয় যদি কোন ওলী থেকে প্রকাশ পায়, সেটাকে কারামত বলা হয়। আর বিধর্মী কাফির থেকে প্রকাশ পেলে সেটাকে ইসতেদরাজ (যোগসাধন) বলা হয়। মু'জিযা দেখে নবীর সত্যতা সম্পর্কে আস্থা জন্মে। কারণ যার হাতে কুদরতের এমন নির্দশনসমূহ প্রকাশ পায়, যেগুলোর ব্যাপারে সমস্ত লোকেরা অক্ষম ও আশ্চর্যান্বিত, তিনি নিশ্চয় খোদার প্রেরিত। কেউ মিথ্যা নাবুয়াত দাবী করে কখনো মুজিযা দেখাতে পারে না। আল্লাহ তাআলা মিথ্যুকদেরকে কখনো মুজিযা দান করেন না। অন্যথায় আসল নকলের পার্থক্য থাকতো না।

প্রয়োজনীয় মাসআলাঃ আম্বিয়ায়ে কিরাম (আলাহিমুস সালাম) থেকে যে সব পদস্খলন হয়েছে, তা তিলাওয়াতে কুরআন ও হাদীছ রেওয়ায়েতের সময় ব্যতীত অন্য সময় আলোচনা করা হারাম এবং খুবই জঘন্য হারাম। এসব বিশিষ্ট বান্দাদের ব্যাপারে অন্যদের নাক গলানোর কী অধিকার। আল্লাহ তাআলা ওনাদের মালেক, যে সময় যেভাবে ইচ্ছে তাবীর করেন। তাঁরা হলেন তাঁর প্রিয় বান্দা। স্বীয় সৃষ্টিকর্তার কাছে যতটুকু পারেন অনুনয় বিনয় করেন। অন্যরা এ সব বাক্যকে দলীল হিসেবে উথাপন করতে পারেন না। অর্থাৎ নবীর কোন ভুল – ভ্রান্তির ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা যে কথাটি কোন নবীকে বলেছেন বা কোন নবী বিনয়ী ও মিনতি সহকারে নিজের বেলায় কোন বাক্য বলেছিলেন, কোন উম্মত কর্তৃক যেসব বাক্যসমূহ কোন নবীর শানে বলা নাজায়েয ও হারাম।

আল্লাহ তাআলার কিতাবসমূহ

আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবীদের প্রতি নিজের কালামে পাক অবতীর্ণ করেছেন। হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) এর প্রতি তাওরাত, হযরত দাউদ (আলাইহিস সালাম) এর প্রতি যবুর, হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর প্রতি ইনজিল এবং অন্যান্য নবীদের প্রতি অন্যান্য কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। কিন্তু ওসব

নবীগণের উম্মতেরা ওসব কিতাবসমূহ রদবদল করে ফেলেছে এবং আল্লাহর আহকামকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি কুরআনে পাক অবতীর্ণ করেন। কুরআন মজিদ এমন অদ্বিতীয় কিতাব, এ রকম অন্য কোনটা হতে পারে না। সমস্ত পৃথিবীর সবাই মিলে চেষ্টা করলেও এরকম কিতাব প্রণয়ন করতে অক্ষম। কুরআনের মধ্যে সমস্ত জ্ঞান রয়েছে এবং প্রত্যেক কিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। চৌদ্দশ বছর থেকে আজ পর্যন্ত ওরকমই রয়েছে যেরূপ অবতীর্ণ হয়েছিল বরং সব সময় ওরকমই থাকবে। সর্বযুগে চেষ্টা করলেও এর একটি শব্দও পরিবর্তন করতে পারবে না। যে বলে যে কুরআনে পাকে কেউ পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছে, বা মুল কুরআন ইমামুলগায়েবের কাছে রয়েছে, সে কাফির। এটাই মুল কুরআন, এ কুরআনের উপর ঈমান আনা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য। এখন আর কোন নবীও আসবে না, না কোন আল্লাহর কিতাব। যে এর বিপরীত বিশ্বাস করে , সে মুমিন নয়।

ফিরিশতাগণের বর্ণনা

ফিরিশতাগণ নূরের শরীর বিশিষ্ট মখলুক, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা এ ক্ষমতা দিয়েছেন যে যখন যে আকৃতি ধারন করতে চায়, সে আকৃতি ধারন করতে পারে। সেটা মানুষের আকৃতি হোক বা অন্য কিছুর । ফিরিশতাগণ আল্লাহ তাআলার নির্দেশের বিপরীত কিছু করেনা, ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলে। কারণ তাঁরা মাসুম। বড় ছোট সব রকমের গুনাহ থেকে পবিত্র। আল্লাহ তাআলা অনেক কাজ ফিরিশতাদের উপর সোপর্দ করেছেন -কোন ফিরিশতা জানকবজের জন্য নিয়োজিত, কোন ফিরিশতা বৃষ্টিপাত করার কাজে, কোন ফিরিশতা মায়ের পেটে শিশুর আকৃতি তৈরীর কাজে, কোনটা আমলনামা লিখার কাজে ও অন্যান্য কাজে অন্যান্য ফিরিশতা নিয়োজিত করেছেন। ফিরিশতাগণ পুরুষও নয় মহিলাও নয়। ওনাদেরকে কদীম বা স্থায়ী মনে করাটা বা সৃষ্টিকর্তা মনে করাটা কুফরী। কোন ফিরিশিতার প্রতি সামান্য বেআদবীও কুফরী। (আলমগীরী) অনেক লোক স্বীয় শত্রুকে বা চাপ সৃষ্টিকারীকে আজরাইল ফিরিশতা বলে। এ রকম বলা নাজায়েয বরং কুফরীর কাছাকাছি। ফিরিশতাগণের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা বা এ রকম বলা যে নেকীর শক্তিকে ফিরিশতা বলে এবং এ ছাড়া অন্য কিছু নয়, এ উভয় বাক্য কুফরী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জ্বীনের বর্ণনা

জ্বীনকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ওদের কতেককে আল্লাহ তাআলা এ শক্তি দিয়েছেন যে, যে আকৃতি ধারণ করতে চায়, করতে পারে। দুষ্ট ও বদকার জ্বীনকে শয়তান বলা হয়। এরা মানুষের মত জ্ঞান, রূহ ও শরীর বিশিষ্ট হয়ে থাকে। এরা পানাহার করে, জীবন ধারণ, মৃত্যু বরণ ও বংশ বিস্তার করে। এদের মধ্যে কাফির, মুমিন, সুন্নী, বদমযহাবী সব রকম হয়ে থাকে। এদের মধ্যে বদকারের সংখ্যা মানুষের তুলনায় অধিক। এদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা বা এ রকম বলা যে জ্বীন ও শয়তান অশুভ শক্তির নাম, কুফরী।

মৃত্যু এবং কবরের বর্ণনা

প্রত্যেক লোকের বয়স নির্ধারিত। এর থেকে এদিক সেদিক হতে পারে না। যখন জিন্দেগীর সময় পূর্ণ হয়ে যায়, তখন হযরত আজরাইল (আলাইহিস সালাম) রূহ বের করার জন্য আসেন। সে সময় মৃত্যু বরণকারীর ডানে বামে যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু ফিরিশতা আর ফিরিশতা দেখা যায়। মুসলমানের পাশে রহমতের ফিরিশতা হয়ে থাকে এবং কাফিরের পাশে শাস্তির। ও সময় কাফিরেরও ইসলামের সত্যতার প্রতি আস্থা এসে যায়। কিন্তু সেই সময় কারো ঈমান গ্রাহ্য নয়। কেননা, ঈমান হচ্ছে আল্লাহ ও রসূলের বর্ণিত বিষয়সমূহের উপর না দেখে বিশ্বাস করার নাম। কিন্তু এখনতো ফিরিশতাদেরকে দেখেই ঈমান আনতেছে। এজন্য এ রকম ঈমান আনার দ্বারা মুসলমান হবে না। মুসলমানের রূহ সহজভাবে বের করা হয় এবং একে রহমতের ফিরিশতাগণ ইজ্জত সহকারে নিয়ে যায়। আর কাফিরের রূহ বড় কষ্টদায়কভাবে বের করা হয় এবং একে আযাবের ফিরিশতাগণ খুবই জিল্লতীপূর্ণ ভাবে নিয়ে যায়। মৃত্যুর পর রূহ অন্য কারো শরীরে গিয়ে পুণরায় জন্ম গ্রহণ করে না বরং কিয়ামত আসা পর্যন্ত আলমে বরযখে (রূহের জগত) থাকে। রূহ অন্য কারো শরীরে চলে যায় সেটা মানুষে হোক বা পশু বা বৃক্ষলতা–এ রকম ধারণা ভুল। এরূপ বিশ্বাস করা কুফরী (একে পূণর্জন্ম বলে থাকে)

মৃত্যুঃ মৃত্যু হচ্ছে শরীর থেকে রূহ বের হয়ে যাওয়া। কিন্তু বের হওয়ার পর রূহ বিলীন হয়ে যায় না বরং আলমে বরযখে (রূহের জগতে) থাকে এবং ঈমান ও আমলের তারতম্য অনুসারে প্রত্যেক রূহের জন্য পৃথক পৃথক জায়গা নির্ধারিত আছে। কিয়ামত আসা পর্যন্ত ওখানেই থাকবে। কারো রূহের জায়গা আরশের

নীচে, কারো ইল্লিনে, কারো রূহ যমযম কূপে, কারো রূহ কবরে থাকবে এবং কাফিরদের রূহ বন্দী অবস্থায় থাকবে। এদের কারো রূহ বরহুত কূপে, কারো রূহ পাতালপুরিতে এবং কারো রূহ শ্মশান ঘাটে বা কবরে থাকবে। যে কোন অবস্থায় রূহ মৃত্যুবরণ বা বিলীন হয় না বরং বহাল থাকে এবং যে অবস্থায় হোক বা যেখানেই হোক স্বীয় শরীরের সাথে এক প্রকার সম্পর্ক বজায় থাকে। শরীরের কষ্টের দ্বারা সেটারও কষ্ট হয় এবং শরীরের আরামের দ্বারা সেটারও আরাম বোধ হয়। যে কেউ কবরের পার্শ্বে আসলে ওকে চিনে, দেখে এবং ওর কথা শুনে। মুসলমান সম্পর্কে হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, যখন মুসলমান মারা যায়, তখন ওর পথ খুলে দেয়া হয়, যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে। হযরত শাহ আবদুল আজিজ সাহেব লিখেছেন যে রূহের জন্য দূর–নিকটবর্তী এক বরাবর অর্থাৎ রূহের জন্য কোন জায়গা দূরের বা কাছের নয় বরং সব জায়গা একই বরাবর। যে এটা মনে করে যে মৃত্যুর পর রূহ বিলীন হয়ে যায়, সে বদমযহাবী। মৃত ব্যক্তি কথাও বলে। এর কথাবার্তা সাধারণ লোক ও জ্বীন ছাড়া জীবজন্তু ইত্যাদিও শুনে থাকে।

দাফনের পর কবর মৃত ব্যক্তিকে চাপ দেয়। মুমিনকে এভাবে চাপ দেয়, যেভাবে মা শিশুকে আদর করে চেপে ধরে। কিন্তু কাফিরকে এভাবে চাপ দেয় যে ওর এদিকের হাড় ওদিকে চলে য়ায়। যখন লোক দাফন করে ফিরে যায়, তখন মৃত ব্যক্তি ওদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। ওসময় মুনকার-নকীর নামক দু'ফিরিশতা মাটি ভেদ করে আসে। ওদের আকৃতি খুবই ভয়ংকর হয়ে থাকে। ওদের শরীর কালো, চোখদ্বয় নীল ও কালো এবং খুব বড় বড় হয়ে থাকে, যেগুলো থেকে আগুনের মত ঝলক বের হয়। ওদের ভীতিকর চুল মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিস্তৃত, দাঁত খুব বড় বড়, যেগুলোর দ্বারা মাটি ভেদ করে আগমন করে মৃত ব্যক্তিকে ধাক্কা ও ধমক দিয়ে উঠায় এবং খুবই কঠোরভাবে ও খুবই কর্কশ ভাষায় তিনটি প্রশ্ন করে (১) مَنْ رَبُّكَ ؟ (তোমার প্রভু কে?) (২) مَا دِيْنُكَ ؟ তোমার ধর্ম কি?) (৩) مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ (ওনার ব্যাপারে তুমি কি বলতে?) মৃত ব্যক্তি যদি মুসলমান হয়, তাহলে প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেয় رَبِّيَ اللّٰهُ (আমার প্রভু আল্লাহ) দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেয় دِيْنِيَ الْاِسْلَامُ (আমার ধর্ম ইসলাম) এবং তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর এটাই দেয় هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ইনি আল্লাহর রসূল, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি রহমত ও শান্তি নাযিল হোক)। তখন আসমান থেকে এ রকম আওয়াজ আসে-আমার বান্দা সত্য বলেছে ওর জন্য জান্নাতী বিছানা বিছায়ে দাও এবং জান্নাতী পোষাক পরিধান করাও এবং ওর জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দাও। তখন জান্নাতের ঠান্ডা হাওয়া এবং সুগন্ধ আসতে থাকবে এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

যতদুর পর্যন্ত দৃষ্টি যাবে সে পর্যন্ত কবর সম্প্রসারিত ও অলোকিত করে দেয়া হবে। ফিরিশতাগণ বলবেন, বরের মত শুয়ে যাও। এটা নেক পরহিজগার মুসলমানদের বেলায় হবে। গুনাহগারদের বেলায় ওদের গুনাহের উপযুক্ত নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শাস্তিও হবে, অতঃপর বুযুর্গানে কিরামের শাফায়াত বা ইসালে ছওয়াব ও দুআয়ে মাগফিরাত দ্বারা বা কেবল আল্লাহর মেহেরবানীতে এ শাস্তি মাফ হয়ে যাবে। এরপর একেবারে আরামদায়ক হয়ে যাবে। আর মৃতব্যক্তি যদি কাফির হয়, সে প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না এবং বলবে هَاهْ لَا أَدْرِىْ (আফসোস! আমার তো কিছুই জানা নেই)। তখন এক আহবানকারী আসমান থেকে ডাক দিয়ে বলবেন, এ মিথ্যুক এর জন্য আগুনের বিছানা বিছায়ে দাও এবং আগুনের কাপড় পরিধান করাও এবং জাহান্নামের একটি দরজা খুলে দাও। এর উত্তাপ ও ঝলক ওর কাছে পৌছবে, ওকে শাস্তি দিবার জন্য দুটি ফিরিশতা নির্ধারিত হবে, যারা বড় বড় হাতুড়ি দিয়ে মারতে থাকবে এবং সাপ বিচ্ছুও কামড়াতে থাকবে, কিয়ামত পর্যন্ত নানা রকম আজাব হতে থাকবে।

বিঃ দ্রঃ নবীগণ (আলাইহিস সালাম) থেকে কবরে কোন সওয়াল জবাব নেই এবং তাঁদের জন্য কবরের কোন চাপও নেই। এমনকি কবরের সওয়াল অনেক উম্মত থেকেও হবে না, যেমন যারা শুক্রবার ও রমযান মাসে মৃত্যু বরণ করে। কবরে আরাম ও কষ্ট হওয়াটা হক এবং এ আজাব ও ছওয়াব শরীর ও রূহ উভয়ের উপর হবে। শরীর যদিওবা গলে, জ্বলে মাটির সাথে মিশে যায়, এর মূল অংশ কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে। ওটার উপরেই আজাব ও ছওয়াব হবে। ওটার উপরেই কিয়ামতের দিন পুণরায় শরীর গঠিত হবে। এটা মেরুদন্ডের হাড্ডিতে অবস্থিত এবং এত সুক্ষ্ম যে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও দৃষ্টিগোচর হয় না। এটাকে আগুনে পুড়তে পারেনা, মাটি হজম করতে পারে না। এটা শরীরের মূল অংশ। এ অংশের সাথে শরীরের অন্যান্য অংশকে আল্লাহ তাআলা একত্রিত করবেন, যেগুলো জ্বলে ছাই বা ধুলি হয়ে এদিক সেদিক ছড়িয়ে রয়েছে এগুলোর দ্বারা পুণরায় শরীর গঠিত হবে এবং সেই শরীরেই রূহ আগমন করে কিয়ামতের ময়দানে গমন করবে। এর নাম হাশর। এখন এর দ্বারা এটাও বুঝা গেল যে কিয়ামতের দিন রূহ স্বীয় প্রথম শরীরেই ফিরে আসবে, অন্য কোন নুতন শরীরে নয়। কেননা মূল অংশ অটল রয়ে বাহ্যিক অংশের পরিবর্তন-পরিবর্ধন হওয়াটা কোন জিনিষের পরিবর্তন বুঝায় না বরং এ ধরণের পরিবর্তনের পরও মূল জিনিষটা বহাল থাকে। দেখুন! যখন শিশুর জন্ম হয়, তখন কতইনা ছোট থাকে। যুবক হওয়া পর্যন্ত ওর মধ্যে কতইনা পরিবর্তন আসে। কিন্তু সব সময় সর্বাবস্থায় সে সেই থেকে যায়, অন্য কেউ হয়ে যায় না। সে নিজেও বিশ্বাস

করে যে দশ পাঁচ বছর আগেও আমি আমিই ছিলাম, এখনও আমি আমিই আছি। এটা প্রত্যেকে সব সময় নিজের বেলায় ও অন্যের ক্ষেত্রেও বিশ্বাস করে। মৃত ব্যক্তিকে যদি কবরে দাফন করা না হয়, তাহলে যেখানে পড়ে রয়েছে বা ফেলে দেয়া হয়েছে, মোট কথা যেখানেই হোক না কেন, ওখানেই প্রশ্ন করা হবে এবং ওখানেই আজাব বা ছওয়াব পৌছবে। এমন কি, যাকে বাঘে খেয়ে ফেললো, ওকে বাঘের পেটে সওয়াল করা হবে এবং আজাব ও ছওয়াব ওখানেই হবে। কবরের আজাব ও ছওয়াবের অস্বীকারকারী গোমরাহ।

মাসআলাঃ নবী, ওলী, আলেমেদ্বীন, শহীদ, হাফেজে কুরআন, যিনি কুরআনের উপর আমলও করেন এবং যিনি মহব্বতের পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত, সেই ব্যক্তি, যে কখনো গুনাহ করেনি এবং যে ব্যক্তি সবসময় দরূদ শরীফ পড়ে, ওনাদের শরীর মাটি হজম করতে পারে না। যে ব্যক্তি নবীদের শানে এটা বলে, 'মরে মাটির সাথে মিশে গেছে', সে গোমরাহ এবং নবীর শানে বেআদবীকারী।

কিয়ামত আসার হাল-হাকিকত এবং এর লক্ষণসমূহ

একদিন সমস্ত দুনিয়া, মানুষ, জীব–জন্তু, জ্বিন, ফিরিশতা, আসমান জমীন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে, সব বিলীন হয়ে যাবে। আল্লাহ ব্যতীত কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। একেই কিয়ামত বলা হয়। কিয়ামত আসার আগে কিছু লক্ষণ প্রকাশ পাবে। এর মধ্যে থেকে কয়েকটি এখানে লিপিবদ্ধ করা হলোঃ

(১) ভূমি ধ্বস অর্থাৎ তিন জায়গায় মানুষ জমীনে ধ্বসে যাবে। এ তিন জায়গা হবে পূর্ব পশ্চিম ও আরবে।

(২) দ্বীনে ইলম উঠে যাবে অর্থাৎ উলামায়ে দ্বীনকে উঠায়ে নেয়া হবে।

(৩) মুর্খতা বৃদ্ধি পাবে।

(৪) মদ্যপান, যিনা বৃদ্ধি পাবে, গরু গাধার প্রজননের মত মানুষের মধ্যে বেহায়াপনা বৃদ্ধি পাবে।

(৫) পুরুষের সংখ্যা কম এবং নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। শেষ পর্যন্ত একজন পুরুষের ভাগে পঞ্চাশ জন মহিলা পড়বে।

(৬) ধন সম্পদ বৃদ্ধি পাবে।

(৭) আরবে ক্ষেত–খামার বাগান এবং নদীর উৎপত্তি হবে। ফুরাত নদী স্বীয় গুপ্তভান্ডার খুলে দিবে এবং তা সোনার পাহাড়ে পরিণত হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৮) পুরুষ নিজের স্ত্রীর কথা মত চলবে। মা বাপের কথা শুনবে না। বন্ধুবান্ধব নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকবে এবং মা–বাপকে অবজ্ঞা করবে।

(৯) গান-বাজনা বৃদ্ধি পাবে।

(১০) লোক পূর্বপুরুষদের প্রতি লানত দিবে এবং ওদেরকে মন্দ বলবে।

(১১) বদকার ও অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে সরদার বানানো হবে।

(১২) ঘৃণিত লোক যাদের ভাগ্যে পরণের কাপড় পর্যন্ত জুটতো না, তারা বড় বড় প্রাসাদেই বিচরণ করবে।

(১৩) মসজিদে লোকেরা চেঁচামেচি করবে।

(১৪) হাতের মুঠোয় অগ্নিকণা নেয়ার মত ইসলামের উপর অটল থাকাটা খুবই কঠিন হবে। এমনকি মানুষ কবরস্থানে গিয়ে আরজু করবে-আহ! আমি যদি এ কবরে হতাম।

(১৫) সময়ের মধ্যে কোন বরকত হবে না। বছর মাসের মত, মাস সপ্তাহের মত, সপ্তাহ দিনের মত এবং দিন এমন হবে যেমন কোন কিছুতে আগুন লাগলো এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে গেল। অর্থাৎ সময় খুব তাড়াতাড়ি অতিবাহিত হবে।

(১৬) হিংস্রজন্তু মানুষের সাথে কথা বলবে, চাবুকের অগ্রভাগ, জুতার ফিতা কথা বলবে, ঘরে যা কিছু হয়েছে, বলে দিবে। এমন কি মানুষের রান ওকে খবর দিবে।

(১৭) সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। এ লক্ষণটা প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। ওসময় ইসলাম গ্রহণ গৃহীত হবে না।

(১৮) বড় দাজ্জালের আবির্ভাব ছাড়াও আরও ত্রিশজন দাজ্জাল প্রকাশ পাবে; যারা সবাই নবী হওয়ার দাবী করবে। অথচ নবীর আগমন শেষ হয়ে গেছে। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) এর পরে কোন নবী আসবে না। ওসব দাজ্জালের মধ্যে অনেক অতিবাহিত হয়ে গেছে। যেমন মুসাইলামা কাজ্জাব, তলহা বিন খাওলিদ, আসওয়াদ আনসী, সাজাহ, মির্জা আলী মুহাম্মদ বাব, মির্জা আলী হোসাইন বাহাউল্লাহ, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রমুখ এবং যারা আসার বাকী আছে, তারা নিশ্চয়ই আসবে।

(১৯) দাজ্জালের আবির্ভাবঃ

দাজ্জাল কানা হবে। সে একচোখ বিশিষ্ট হবে এবং খোদা দাবী করবে। ওর কপালে ك ف ر কাফ, ফা, রা, অর্থাৎ কাফির লিখা থাকবে। প্রত্যেক

মুসলমান তা পড়তে পারবে কিন্তু কাফিরেরা তা দেখবে না। সে খুবই দ্রুততার সাথে পরিভ্রমণ করবে। চল্লিশ দিনের মধ্যে পবিত্র মক্কা –মদীনা ব্যতিত দুনিয়ার সমস্ত জায়গা ঘুরে আসবে। সেই চল্লিশ দিনের মধ্যে প্রথম দিন এক বছরের বরাবর হবে। দ্বিতীয় দিন একমাসের বরাবর। তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের বরাবর এবং অবশিষ্ট দিনগুলো চব্বিশ ঘন্টা হিসেবে হবে। এর ফিৎনাটা খুবই মারাত্মক হবে। একটি বাগান ও একটি অগ্নিকুণ্ড ওর সাথে থাকবে, যার নাম যথাক্রমে জান্নাত ও দোযখ রাখবে। যেখানেই যাবে এ দুটা ওর সাথে থাকবে। ওর জান্নাত আসলে অগ্নিকুণ্ড হবে এবং ওর জাহান্নাম আরামের জায়গা হবে। লোকদেরকে বলবে আমাকে খোদা স্বীকার কর। যে ওকে খোদা স্বীকার করবে, ওকে ইহা জান্নাতে স্থান দিবে এবং যে অস্বীকার করবে, ওকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। মৃত্যুকে জীবিত করবে, পানি বর্ষণ করবে। জমীনকে যখন নির্দেশ দিবে, সবজী উৎপন্ন করবে। পরিত্যক্ত জায়গা দিয়ে যখন যাবে, ওখানকার খনিজসম্পদ মৌমাছির মত ওর পিছনে পিছনে চলতে থাকবে। এ রকম অনেক আজগুবী বিষয় দেখাবে। কিন্তু মূলতঃ এসব কিছু যাদুরই কারসাজী, বাস্তবে কিছুই হবে না। এ জন্য সে ওখান থেকে চলে যাওয়ার পর লোকদের কাছে কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। যখন পবিত্র মক্কা মদীনায় প্রবেশ করতে চাইবে, ফিরিশতাগণ ওর মুখ ফিরায়ে দিবেন। দাজ্জালের সাথে ইহুদী সেনারা যোগ দিবে।

(২০) হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর আসমান থেকে অবতরনঃ

যখন দাজ্জাল সারা পৃথিবী ঘুরে শাম (সিরিয়া) দেশে পৌছবে, তখন হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) দামেস্কের জামে মসজিদের পূর্ব মিনারের উপর আসমান থেকে অবতীর্ণ হবেন। তখন সময়টা হবে প্রাতঃকাল। ফজরের নামাযের ইকামত হতে থাকবে। হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) ইমাম মাহদী (রাদি আল্লাহু তাআলা আনহু) কে ইমামতির জন্য হুকুম দিবেন। হযরত ইমাম মাহদী নামায পড়াবেন। অভিশপ্ত দাজ্জাল হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর শ্বাসের সুঘ্রাণে গলতে থাকবে যেমন পানির দ্বারা লবণ গলে থাকে। তাঁর শ্বাসের ঘ্রাণ অতদূর পর্যন্ত যাবে যতদূর দৃষ্টি পৌঁছে। দাজ্জাল পালাবে। তিনি তার পিছু নিবেন এবং ওর পিঠে বল্লম মেরে শেষ করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিবেন। অতঃপর হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) ক্রশ চিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন। শুকুর হত্যা করবেন। যত ইহুদী খৃষ্টান বেঁচে থাকবে, ওরা সবাই তাঁর প্রতি ঈমান আনবেন। সেসময় সমগ্র পৃথিবীতে একমাত্র দ্বীনে ইসলামই কায়েম হবে এবং একমাত্র আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মযহাবটা বলবৎ থাকবে, শিশু সাপের সঙ্গে খেলবে, বাঘ–ছাগল একসাথে অবস্থান করবে। তিনি (আলাইহিস সালাম) বিবাহ করবেন। সন্তানাদিও হবে। চল্লিশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন। ইন্তেকালের পর তাঁকে রওজা

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাকে দাফন করা হবে।

(২১) হযরত ইমাম মাহদীর আবির্ভাবঃ

হযরত ইমাম মাহদী (রাদি আল্লাহ তাআলা আনহু) হুযুর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) এর বংশোদ্ভুত হুসাইনী সায়্যিদ হবেন। তিনি (রাদি আল্লাহ তাআলা আনহু) ইমাম ও মুজতাহিদ হবেন। কিয়ামতের সন্নিকট যখন সারা দুনিয়ায় কুফরী বিস্তার লাভ করবে এবং ইসলাম শুধু পবিত্র মক্কা মদীনায় অবশিষ্ট থাকবে, তখন সমস্ত আওলিয়া ও আবদালগণ হিজরত করে ওখানে চলে যাবেন। মাসটি রমযান মাসই হবে। আবদালগণ কাবা শরীফ তওয়াফ করতে থাকবেন। হযরত ইমাম মাহদীও তথায় থাকবেন, আওলিয়ায়ে কিরাম ওনাকে চিনে ফেলবেন। ওনার কাছে বায়াত হওয়ার জন্য সবাই আরয করবেন। কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করবেন। তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসবে:

هٰذَا خَلِيْفَةُ اللّٰهِ الْمَهْدِىُّ فَاسْمَعُوْا لَهٗ وَاَطِيْعُوْا ۝

(ইনি আল্লাহর খলীফা মাহদী। ওনার কথা শুন ও ওনার হুকুম মান্য কর) সমস্ত লোক তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করবে। অতঃপর ইমাম মাহদী (রাদি আল্লাহ তাআলা আনহু) সবাইকে সাথে নিয়ে শাম দেশে (সিরিয়া) চলে যাবেন।

(২২) ইয়াজুজ মাজুজের অবস্থাঃ

ইয়াজুজ মাজুজ হচ্ছে ইয়াফেছ বিন নুহ (আলাইহিস সালাম) এর বংশোদ্ভুত একটি গোত্র । এদের সংখ্যা অনেক বেশী। এরা পৃথিবীতে ঝগড়া ফ্যাসাদ করতো, বসন্তকালে বের হতো। তরতাজা জিনিষগুলো খেয়ে ফেলতো, শুষ্ক জিনিষগুলো বিনষ্ট করে ফেলতো, মানুষদেরকে খেয়ে ফেলতো, এমনকি অন্য জীব জন্তু, সাপ বিচ্ছু কিছুই এদের হাত থেকে রক্ষা পেত না। হযরত যুল কারনাইন লোহার দেয়াল তৈরী করে ওদের আগমন বন্ধ করে দিয়েছেন। যখন দাজ্জালকে হত্যা করে আল্লাহর নির্দেশে হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) মুসলমানদেরকে তুর পাহাড়ে নিয়ে যাবেন, তখন দেয়াল ভেঙ্গে এ ইয়াজুজ মাজুজ বাহিনী বের হবে এবং পৃথিবীতে বড় ফিতনা ফ্যাসাদের সৃষ্টি করবে, লুটপাট, মারামারি হত্যা ইত্যাদি করবে। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর দুআয় ওদেরকে ধ্বংস ও বিলীন করে দিবেন।

(২৩) 'দাববাতুল আরদ' এর আবির্ভাবঃ

এটা একটা অদ্ভুত ধরণের জন্তু, সাফা পাহাড় থেকে বের হবে। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত শহরগুলো পরিভ্রমণ করবে, সুস্পষ্টভাবে কথা বলবে। ওর হাতে হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) এর লাঠি এবং হযরত সুলাইমান

(আলাইহিস সালাম) এর আংটি থাকবে। লাঠি দ্বারা মুসলামানদের মাথায় একটি উজ্জ্বল চিহ্ন এবং আংটি দ্বারা কাফিরদের মাথায় একটি কাল দাগ দিবে। সে সময় সমস্ত মুসলমান ও কাফির প্রকাশ্যভাবে প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে চেনা যাবে। এ চিহ্ন কখনও পরিবর্তন হবে না। যে কাফির সে কখনও ঈমান আনবে না, যে মুসলমান সে সব সময় ঈমানের উপর অটল থাকবে।

(২৪) সুগন্ধময় হিম প্রবাহঃ

হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর ইন্তেকালের পর যখন কিয়ামত আসার চল্লিশ বছর বাকী থাকবে, তখন এমন এক ঠান্ডা সুগন্ধময় হাওয়া প্রবাহিত হবে, যেটা লোকদের বগলের নীচ দিয়ে অতিবাহিত হবে, যার প্রতিক্রিয়ায় মুসলমানদের রূহ বের হয়ে যাবে এবং শুধু কাফির আর কাফিরই থেকে যাবে। ওসব কাফিরদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

কিয়ামতের এ কয়েকটি লক্ষণ বর্ণনা করা হলো। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি প্রকাশিত এবং কয়েকটি প্রকাশ হওয়া বাকী রয়েছে। যখন সব লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাবে এবং মুসলমানদের বগলের নীচ দিয়ে সেই সুগন্ধময় হাওয়া প্রবাহিত হবে যদ্বারা সমস্ত মুসলমান মারা যাবে, তখন এরপর চল্লিশ বছরের যুগটা এমনভাবে অতিবাহিত হবে যে যার মধ্যে কারো কোন সন্তানাদি হবে না। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন চল্লিশ বছরের কম বয়সের কেউ থাকবে না এবং দুনিয়াতে শুধু কাফিরই থাকবে। আল্লাহ বলার মত কেউ থাকবে না। কেউ দেয়াল ধরাবস্থায় হবে, কেউ পানাহারে রত থাকবে। মোট কথা সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকবে। হঠাৎ আল্লাহ তাআলার নির্দেশে হযরত ইস্রাফিল (আলাইহিস সালাম) শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন। প্রথমে এর আওয়াজ মৃদু হবে। অতঃপর এর আওয়াজ ক্রমান্বয়ে বড় হতে হতে ভীষণ বিকট হয়ে যাবে। লোকেরা কান লাগিয়ে সেই আওয়াজ শুনবে এবং বেহুস হয়ে পড়ে যাবে ও মারা যাবে। এরপর আসমান, জমীন, সাগর, নদী, পাহাড়, পর্বত, এমন কি স্বয়ং শিঙ্গা, ইস্রাফিল (আলাইহিস সালাম) ও সমস্ত ফিরিশতা ফানা হয়ে যাবে। সেসময় একমাত্র আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কিছু থাকবে না। অতঃপর আল্লাহ তাআলা যখন ইচ্ছে করবেন, ইস্রাফিল (আলাইহিস সালাম) কে জীবিত করবেন এবং শিঙ্গা তৈরী করে দ্বিতীয় বার ফুঁক দিবার নির্দেশ দান করবেন। শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার সাথে সাথে আগে পরের সমস্ত কিছু, ফিরিশতা, মানুষ, জ্বীন, জীবজন্তু সবকিছু মওজুদ হয়ে যাবে। লোকেরা কবরসমূহ থেকে বের হয়ে আসবে। ওদের আমল নামা ওদের হাতেই দেয়া হবে এবং সবাইকে হাশরের ময়দানে আনা হবে। এখানে হিসেব নিকাশ ও পরিণতির অপেক্ষায় থাকবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জমীন তামার হবে, সূর্য খুবই প্রখরতার সাথে মাথার খুবই নিকটে হবে। সূর্যের তেজে শরীর ঝলসে যাবে, জিহ্বা শুকিয়ে চৌচির হয়ে যাবে। অনেকের জিহ্বা বের হয়ে-আসবে। অনেক ঘাম বের হবে। কারো গিরা, কারো হাটু, কারো গলা এবং কারো মুখ পর্যন্ত ঘামে ডুবে যাবে। যার যে রকম আমল সে রকম কষ্ট পাবে। তদুপরি সেই ঘাম খুবই দুর্গন্ধময় হবে। এ অবস্থায় অনেক সময় অতিবাহিত হবে। সেই দিনটা হবে পঞ্চাশ বছরের সমতুল্য। এভাবে অর্ধ দিবস অতিবাহিত হওয়ার পর লোকেরা সুপারিশকারীর সন্ধান করবে, যে এ মুসিবত থেকে রেহাই দিতে পারেন এবং বিচার কার্যটা যেন সহসা হয়ে যায়। লোকেরা পরামর্শ করে আদম (আলাইহিস সালাম) এর কছে যাবে। তিনি বলবেন, হযরত নূহ (আলাইহিস সালাম) এর কাছে যাও। তিনি (নূহ আলাইহিস সালাম) হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) এর কাছে পাঠাবেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) এর কাছে যাবার জন্য বলবেন। হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর কাছে পাঠাবেন। হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) আমাদের আকায়ে মওলা রহমতে আলম সায়্যিদুল আম্বীয়া মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহ তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে পাঠাবেন। যখন লোকেরা হুযুর (সাল্লাল্লাহ তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে এসে ফরিয়াদ করবে এবং সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করবে, তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহ তাআলা আলাইহে ফরমাবেন, 'আমি এ কাজের জন্য প্রস্তুত'। এ বলে তিনি আল্লাহ তাআলার বারগাহে সিজদায় পতিত হবেন। আল্লাহ তাআলা ফরমাবেন, মস্তক উত্তোলন কর, যা বল, শুনা হবে, চাও, দেয়া হবে, সুপারিশ কর, গৃহীত হবে। এবার হিসাব নিকাশ শুরু হবে। আমলের মীযানে (পাল্লায়) আমল ওজন করা হবে। স্বীয় হাত–পা ও শরীরের অন্যান্য অংগ নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে। জমীনের কোন অংশে কোন আমল করে থাকলে সেটাও সাক্ষী দেয়ার জন্য তৈরী থাকবে। কোন বন্ধু বা কোন সাহায্যকারী থাকবে না। বাপ ছেলের কাজে আসবে না এবং ছেলে বাপের কাজে লাগবে না। আমলসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে থাকবে। সারা জীবনের আমলসমূহ সামনেই থাকবে। গুনাহ থেকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। অন্য কোন জায়গা থেকে নেকী লাভ করারও কোন পথ নেই। এ অসহায় অবস্থায় একমাত্র হুযুর (সাল্লাল্লাহ তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) ই সহায় হবেন। তিনি তাঁর আনুগত্যদের জন্য সুপারিশ করবেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহ তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) এর সুপারিশ কয়েক রকমের হবে। অনেক লোক তাঁর সুপারিশে বিনা হিসাব নিকাশে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অনেক লোক দোযখের উপযোগী হবে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ তাআলা

আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) এর সুপারিশে দোযখ থেকে রক্ষা পাবে। যেসব গুনাহগার মুসলমান দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে, হুযুর (সাল্লাল্লাহ তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) এর সুপারিশে দোযখ থেকে বের করে আনা হবে। অনেক জান্নাতীদের সুপারিশ করে পদমর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। হুযুর (সাল্লাল্লাহ তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়াও অন্যান্য নবীগণ, সাহাবা, উলামা, আওলিয়া, শহীদগণ, হাফেজ ও হাজীগণও সুপারিশ করবেন। লোকেরা আলেমদেরকে তাদের সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে। যদি দুনিয়াতে কোন ব্যক্তি কোন আলেমকে ওযু করার জন্য পানি এনে দিয়ে থাকে, সেটার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়ে সুপারিশের জন্য বলবে এবং উনি ওর জন্য সুপারিশ করবেন। কিয়ামতের এ দিন যেটা পঞ্চাশ হাজার বছরের সমতুল্য হবে এবং যার মুসিবত সমূহ অগণিত ও একান্ত অসহ্যকর হবে, নবী, ওলী ও নেককার দের জন্য এত হালকা করে দেয়া হবে যে মনে হবে যেন এক ওয়াক্ত ফরয নামায পড়ার সমতুল্য সময় লেগেছে। বরং এর থেকেও কম সময় মনে হবে। এমন কি অনেকের জন্য এক পলকে সারা দিন অতিবাহিত হয়ে যাবে। ওদিন মুসলমানেরা সবচেয়ে বড় নিয়ামত যেটা লাভ করবেন, সেটা হলো আল্লাহর দীদার।

এ পর্যন্ত হাশরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো। এবার মানুষের স্থায়ী নিবাসে যাবার পালা। কারো জুটবে আরামের নিবাস, যার আরাম আয়েশের কোন শেষ নেই। একে জান্নাত বলা হয়। কাউকে কষ্টের আবাসে যেতে হবে, যার কষ্টের কোন সীমা নেই। ওটাকে জাহান্নাম বা দোযখ বলা হয়। জান্নাত ও দোযখ সত্য। এগুলোর অস্বীকারকারী কাফির। জান্নাত ও দোযখ তৈরী হয়ে গেছে। এখনও মওজুদ আছে।

এটা নয় যে কিয়ামতের দিন তৈরী করা হবে, কিয়ামত, হিসেব, হাশর, ছওয়াব, আজাব, জান্নাত, দোযখ সবের ওটাই অর্থ, যেটা মুসলমানদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে। সুতরাং যে ব্যক্তি ওগুলোকে হক বলে, কিন্তু ওগুলোর অর্থ অন্য রকম বলে থাকে, যেমন ছওয়াব অর্থ স্বীয় নেকীসমূহ দেখে সন্তুষ্টি হওয়া এবং আজাব অর্থ নিজের মন্দ আমলসমূহ দেখে অনুশোচনা করা বা হাশর কেবল রূহের হবে শরীরের নয়, সে ব্যক্তি মূলতঃ এগুলো অস্বীকারকারী এবং অস্বীকারকারী কাফির। কিয়ামত অবশ্যই কায়েম হবে। এর অস্বীকার কারী কাফির।

হাশর রূহ ও শরীর উভয়ের উপর হবে। যে ব্যক্তি বলে কেবল রূহ উঠবে শরীর জীবিত হবে না, সেও কাফির। দুনিয়াতে রূহ যে শরীরে ছিল এই রূহের হাশর সেই শরীরে হবে। এমন নয় যে কোন নতুন শরীর তৈরী করে সেখানে রূহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

স্থাপন করা হবে। শরীরের অংগপ্রত্যংগ মৃত্যুর পর যদিওবা এদিক সেদিক হয়ে গেছে বা পশুর খাদ্য হয়ে গেছে কিন্তু আল্লাহ তাআলা ওসব অংগপ্রত্যংগ একত্রিত করে উঠাবে। হিসেব হক। আমলসমূহের হিসেব হবে। এর অস্বীকারকারী কাফির।

মীযান

মীযান হক। এটা এক প্রকার পরিমাপন দন্ড। এর দু'টি পাল্লা হবে। এতে লোকদের ভাল–মন্দ আমলসমূহ ওজন করা হবে। নেকীর পাল্লা ভারী হওয়া মানে দুনিয়ারী ওজনের বিপরীত উপর দিকে উঠে যাওয়া।

পুলসিরাত

পুলসিরাত হক। এটা একটা পুল বিশেষ, যেটা জাহান্নামের উপরে হবে। এটা চুল থেকে অধিক সরু এবং তলোয়ার থেকে অধিক ধারালো হবে। জান্নাতে যাবার এটাই একমাত্র পথ। সবাইকে এটার উপর দিয়ে যেতে হবে। কাফিরেরা এটা অতিক্রম করতে পারবে না, দোযখে পড়ে যাবে। মুসলমানগণ পার হয়ে যাবে। অনেকে পার হবে বিদ্যুৎ চমকের মত। এ মাত্র এখানে ছিল, ওখানে পৌছে গেল। অনেকে তেজি হাওয়ার মত, অনেকে দ্রুতগামী ঘোড়ার মত, অনেকে আস্তে আস্তে, অনেকে খুবই নাজুক অবস্থায়, ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় পার হবে। যত ভাল আমল হবে,ততই তাড়াতাড়ি পার হবে।

হাউজে কাউছার

আমাদের নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) কে যে হাউজে কাউছার দেয়া হয়েছে, তা সত্য। এর দৈর্ঘ্য একমাসের পথ এবং প্রস্থও অনুরূপ। এর কিনারা স্বর্ণের, যার উপর মুক্তার গুম্বুজ স্থাপিত আছে। এর তলা মেশকের তৈরী এবং এর পানি দুধ থেকে অধিক সাদা ও মধু থেকে অধিক মিষ্ট এবং মেশক থেকে অধিক সুগন্ধময়। যে এর পানি একবার পান করবে, সে কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। ওখান থেকে পানি নেয়ার পাত্র তারকারাজি থেকেও সংখ্যায় অধিক। ওটাতে জান্নাত থেকে দু'টি নল দিয়ে পানি পতিত হয়। নলদুটির একটি স্বর্ণের এবং অপরটি চান্দির।

মকামে মাহমুদ

আল্লাহ তাআলা স্বীয় হাবীব মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) কে মাকামে মাহমুদ দান করবেন, যেখানে আগে পরের

সবাই তারই প্রশংসা করবেন। (তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করবেন)

লেওয়াউল হামদ

এটা একটা ঝাণ্ডা, যেটা আমাদের আকা মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) কিয়ামতের দিন লাভ করবেন। যার নীচে হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমান হয়েছে, নবী, ওলী সবাই সমবেত হবেন।

জান্নাতের বর্ণনা

জান্নাত হচ্ছে একটি খুবই বড় ও খুবই উত্তম প্রাসাদযেটা আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জন্য তৈরী করেছেন। এর দেয়াল হচ্ছে সোনা ও চান্দির ইট এবং মেশকের সিমেন্ট দ্বারা তৈরী, মেঝ জাফরান ও আম্বরের তৈরী এবং পাথরসমূহ মনিমুক্তার। এর মধ্যে জান্নাতীগণ থাকার জন্য খুবই সুন্দর হীরা মুক্তার বড় বড় মহল ও তাঁবু রয়েছে। জান্নাতের একশটি দরজা রয়েছে। প্রত্যেক দরজার প্রশস্ততা আসমান থেকে জমীনের দুরত্বের সমান। দরজার এক পাশ থেকে আর এক পাশে যেতে দ্রুতগামী ঘোড়ার সময় লাগে সত্তর বছর। জান্নাতে এত নিয়ামতসমূহ হবে,যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। নানা রকম ফলমুল, দুধ, মধু, শরাব, ভাল ভাল খাবার এবং উত্তম কাপড় যা দুনিয়াতে পরার কারো সৌভাগ্যে হয়নি, জান্নাতীদেরকে দেয়া হবে। খেদমত করার জন্য হাজার হাজার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গেলমান এবং সুহবতের জন্য হাজার হাজার হুর পাওয়া যাবে, যেগুলো এত সুন্দর যে যদি এদের মধ্যে কেউ দুনিয়ার দিকে একবার উকি মেরে দেখে, তাহলে এর ঝলক ও সৌন্দর্যে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ বেহুঁস হয়ে যাবে। বেহেশতে কোন ঘুম আসবেনা। কোন রোগ হবে না, কোন ভয় হবে না, কোন সময় মৃত্যু হবে না বা কোন প্রকারের কষ্টভোগ করবে না বরং সব রকমের আরাম অর্জিত হবে, প্রত্যেক বাসনা পূর্ণ হবে এবং সবচেয়ে বড় নিয়ামত আল্লাহ তাআলার দীদার নসীব হবে।

দোযখ

এটাও একটি আবাসস্থল ,যার মধ্যে ঘোর অন্ধকার এবং খুবই উত্তপ্ত কালো আগুন বিরাজমান,যেথায় আলোর কোন নাম নিশানা নেই। এটা বদকার ও কাফিরদের জন্য তৈরী করা হয়েছে। কাফিরদেরকে সব সময় এতে বন্দী রাখা

pdf By Syed Mostafa Sakib

হবে। এর আগুন প্রতি মুহূর্তে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। দোযখের আগুন এত উত্তপ্ত যে সুঁই এর ছিদ্র বরাররও যদি খুলে দেয়া হয়, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত লোক এর গরমে মারা যাবে। যদি জাহান্নামের কোন দারোগা দুনিয়াতে আসে, তাহলে ওর ভয়াল আকৃতি দেখে সমস্ত লোকের প্রাণ বের হয়ে যাবে। জাহান্নামীদেরকে নানা প্রকারের আজাব দেয়া হবে। বড় বড় সাপ, বিচ্ছু কামড়ারে, ভারীভারী হাতুড়ী দিয়ে মাথায় আঘাত করা হবে।যখন ক্ষুধা,তৃষ্ণা, অনুভব হবে, তখন তেলের ফুটন্ত তলানি ও পূঁজ পান করার জন্য এবং কাঁটা বিশিষ্ট ও বিষাক্ত ফল খাবার জন্য দেয়া হবে। যখন সেই ফল খাবে, তখন তা গলায় আটকে যাবে। ওটাকে অপসারিত করার জন্য পানি তালাশ করলে সেই ফুটন্ত পানি দেয়া হবে। সেই পানি পান করার ফলে নাড়িভূঁড়ি টুকরা টুকরা হয়ে বের হয়ে আসবে। তা সত্ত্বেও উটের পালের মত সেই পানি পান করার জন্য সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বে। কাফিরেরা আজাব থেকে অতিষ্ট হয়ে যখন মৃত্যু কামনা করবে এবং মৃত্যুও আসবে না, তখন সবাই পরস্পর পরামর্শ করে জাহান্নামের দারোগা হযরত মালেক (আলাইহিস সালাম)কে আহবান করে বলবে-আপনার রবকে বলে আমাদের ব্যাপারটা মিটমাট করে ফেলুন। হযরত মালেক (আঃ) হাজার বছর পর্যন্ত কোন উত্তর দিবেননা। হাজার বছর পর বললেন-আমাকে কেন বলছ, ওনাকেই বল যার নাফরমানী করেছ। অতঃপর হাজার বছর পর্যন্ত আল্লাহ তাআলাকে তাঁর রহমতের বিভিন্ন নামে আহবান করবে। হাজার বছর পর্যন্ত কোন উত্তর দিবেন না। এর পর যা বলবেন, তা হচ্ছে-দুর হও, জাহান্নামে পড়ে থাক, আমার সাথে কোন কথা বলনা। ওসময় কাফিরেরা সকল প্রকারের কল্যাণ থেকে নিরাশ হয়ে যাবে এবং গাধার আওয়াজের মত চীৎকার করে কাদঁবে। প্রথমে চোখের পানি বের হবে এরপর বের হবে রক্ত। কাঁদতে কাঁদতে দুগন্ডে কূপের মত গর্ত হয়ে যাবে। কান্নার রক্ত ও পূঁজ এত অধিক হবে যে যদি এর উপর নৌকা রাখা হয়, তাহলে চলতে থাকবে। জাহান্নামীদের আকৃতি এমন বিশ্রী হবে যে যদি কোন জাহান্নামীকে দুনিয়াতে সেই আকৃতিতে আনা হয়, তাহলে এর বীভৎস চেহারা ও দুর্গন্ধের কারণে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ মারা যাবে। শেষ পর্যন্ত কাফিরদের জন্য এটাই করা হবে যে, প্রত্যেক কাফিরকে প্রত্যেকের মাপ বরাবর সিন্দুকে বন্ধ করবে। অতঃপর আগুন প্রজ্বলিত করবে এবং আগুনের তালা লাগাবে। এরপর এ সিন্দুককে আর একটি আগুনের সিন্দুকে রাখা হবে এবং উভয়ের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হবে আর ওটাতেও তালা লাগিয়ে তালা লাগিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। তখন প্রত্যেক কাফির মনে করবে যে

সে ব্যতীত আর কেউ জাহান্নামে নেই। এটা আজাবের উপর আজাব এবং এ আজাব সব সময়ের জন্য থাকবে, যেটা কখনও শেষ হবে না। যখন সমস্ত জান্নাতী জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামে কেবল ওসব লোকেরাই রয়ে যাবে, যাদেরকে ওখানে সব সময় থাকতে হবে, তখন জান্নাত ও দোযখের মাঝখানে মৃত্যুকে ভেড়ার আকৃতিতে এনে দাঁড় করানো হবে। অতঃপর এক আহবানকারী জান্নাতবাসীদেরকে আহবান করবে। ওনারা ভয় পেয়ে উকি মেরে দেখবেন যে, বের হয়ে যাবার হুকুম হলো কিনা। এরপর জাহান্নামীদেরকে আহবান করবে। ওরা আনন্দিত হয়ে উকি মেরে দেখবে যে মুসীবত থেকে মুক্তি দেয়ার নির্দেশ হলো কিনা। পুণরায় সবাইকে জিজ্ঞাসা করা হবে, এটাকে চিন? সবাই বলবে হ্যাঁ, এটা মৃত্যু। অতঃপর সেটাকে জবেহ করে দেয়া হবে, আর বলবে হে জান্নাতবাসীগণ চিরস্থায়ী হয়ে গেছ। এখন আর মৃত্যু নেই এবং হে দোযখবাসীগণ চিরস্থায়ী হয়ে গেছ। আর মৃত্যু নেই। এতে জান্নাতীদের আনন্দের সীমা থাকবে না আর জাহান্নামীরা সীমাহীন মর্মাহত হবে।

نَسْئَلُ اللّٰهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۝

(অর্থাৎ আল্লাহর কাছে দীন,দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা ও পানা চাই।)

ঈমান ও কুফরের বর্ণনা

ঈমান হচ্ছে আল্লাহ ও রসূল কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত বিষয় বিশ্বাস করা এবং আন্তরিক ভাবে সত্য মনে করা। যদি কেউ এমন একটি বিষয়ও অস্বীকার করে, যেটা ইসলামী বিষয় বলে নিশ্চিত ভাবে জানা আছে, তাহলে এটা কুফর। যেমন কিয়ামত, ফিরিশতা, জান্নাত, দোযখ, হিসেবকে বিশ্বাস না করা বা নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতকে ফরয মনে না করা বা কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে বিশ্বাস না করা, কুরআন বা কোন নবী বা ফিরিশতার প্রতি অবজ্ঞা করা বা কোন সুন্নাতকে নগণ্য বলা, শরীয়তের বিধান নিয়ে রসিকতা করা এবং অনুরূপ ইসলামের কোন জানা ও প্রসিদ্ধ বিষয় অস্বীকার করা বা এতে সন্দেহ পোষণ করা নিঃসন্দেহে কুফরী। মুসলমান হওয়ার জন্য ঈমান ও আস্থার সাথে সাথে মুখে বলাটাও জরুরী, যদি কোন অপারগতার সম্মুখীন না হয়। যেমন মুখ দিয়ে কথা বের হয় না বা মুখ দিয়ে বলতে গেলে জীবন নাশের বা অংগহানির সম্ভাবনা আছে। এমতাবস্থায় মুখে স্বীকার করার প্রয়োজন নেই বরং জান বাঁচানোর জন্য ইসলাম বিরোধী কথাও বলা যেতে পারে, তবে না বলাটাই উত্তম ও ছওয়াবের কাজ। এরকম অবস্থা ছাড়া অন্য কোন সময় মুখে কুফরী শব্দ বললে, কাফির মনে করা হবে। যদিওবা এটা বলে যে কেবল মাত্র মুখে বলা

pdf By Syed Mostafa Sakib

হয়েছে, অন্তরে নয়। অনুরূপ কুফরীর লক্ষণ বিশিষ্ট কাজ করলে কাফির মনে করা হবে। যেমন টিকি রাখা, ক্রুশচিহ্ন ঝুলানো। মুসলমান হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে কেবল দ্বীনে ইসলামকে সত্য মুযহাব মনে করা এবং দ্বীনের কোন জরুরী বিষয়কে অস্বীকার না করা এবং দ্বীনের প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ের বিপরীত আকীদা পোষণ না করা. যদিওবা,দ্বীনের সমস্ত বিষয় সম্পর্কে ওর জ্ঞান না থাকে। অতএব একেবারে মূর্খ ব্যক্তি, যে ইসলাম ও ইসলামের নবীকে হক মনে করে এবং ইসলামী আকীদার বিপরীত কোন আকীদা পোষণ না করে এবং যদিওবা সে কলেমাও শুদ্ধভাবে পড়তে পারেনা, সে মুসলমান ও মুমিন, কাফির নয়। অবশ্য নামায, রোযা, হজ্ব ইত্যাদি আমলসমূহ বর্জন করার দ্বারা গুনাহগার হবে কিন্তু মুমিন গণ্য হবে । কেননা আমল ঈমানের অন্তর্ভূক্ত নয়।

আকীদাঃ যে জিনিষটা নিঃসন্দেহে হারাম, ওটাকে হালাল মনে করা এবং যেটা নিঃসন্দেহে হালাল ওটাকে হারাম মনে করা কুফরী। তবে কথা হল যে, এ হালাল–হারাম হওয়াটা প্রসিদ্ধ হওয়া চায় বা লোকটার জানা থাকা চায়।

শির্‌ক

শির্‌ক হচ্ছে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে খোদা মনে করা বা ইবাদতের উপযুক্ত মনে করা। এটা কুফরীর সর্ব নিকৃষ্ট বিষয়। এটা ব্যতীত অন্যান্য বিষয় যতই মারাত্মক কুফরী হোক না কেন, বাস্তবে শির্‌ক নয়। কোন কুফরীর ক্ষমা হবে না। কুফরী ভিন্ন সমস্ত গুনাহ আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন, ক্ষমা করে দিবেন।

আকীদাঃ কবীরা গুনাহ করার দ্বারা মুসলমান কাফির হয়ে যায় না বরং মুসলমানই রয়ে যায়। যদি বিনা তওবায় মৃত্যুবরণ করে, তবুও জান্নাত লাভ করবে। গুনাহের শাস্তি ভোগ করে বা ক্ষমা পেয়ে এবং এ ক্ষমা হয়তো আল্লাহ তাআলা স্বীয় মেহেরবানীতে বা হুযুর (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) এর শাফায়াতের বদৌলতে লাভ করবে।

মাস্‌আলাঃ যে কোন মৃত কাফিরের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বা কোন কাফির মুরতাদকে মরহুম, মগফুর বা জান্নাতী বলে অথবা কোন বিধর্মীকে বৈকুণ্ঠবাসী বলে, সে নিজেই কাফির।

আকীদাঃ মুসলমানকে মুসলমান মনে করা এবং কাফিরকে কাফির জানা প্রয়োজন। অবশ্য কোন বিশেষ লোকের কাফির বা মুসলমান হওয়ার নিশ্চয়তা ওসময় পর্যন্ত হওয়া যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের দলীল দ্বারা পরিসমাপ্তির অবস্থা জানা না যায়, সে ইসলামের উপর, না কুফরীর উপর মৃত্যুবরণ করলো। কিন্তু এটার অর্থ এ নয় যে, যে নিঃসন্দেহে কুফরী করলো, ওর কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ করা। কারণ নিশ্চিত কাফিরের ব্যাপারে সন্দেহ করলে নিজেই

কাফির হয়ে যায়। এ জন্য শরীয়তের হুকুম বাহ্যিক আচরণের উপরই হয়ে থাকে। অবশ্য কিয়ামতের দিন বাস্তব অনুসারে ফয়সালা হবে। এটাকে এভাবে বুঝে নিন যে কোন কাফির ইহুদী, খৃষ্টান বা হিন্দু মৃত্যু বরণ করলো, তখন এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে সে কুফরীর উপর মৃত্যু বরণ করলো। কিন্তু আমাদের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হুকুম হচ্ছে ওকে কাফির মনে করা এবং ওর সাথে কাফির হিসেবে আচরণ করা। অনুরূপ যে প্রকাশ্যভাবে মুসলমান এবং ওর কোন কথা বা কাজ ইসলাম বিরোধী পাওয়া না যায়, তখন আমাদের উপর ফরয যে ওকে মুসলমান মনে করা যদিওবা আমাদের কাছে ওর পরিসমাপ্তির কথা জানা নেই।

আকীদাঃ কুফর ও ইসলাম ছাড়া তৃতীয় কোন স্তর নেই। মানুষ হয়তো মুসলমান হবে অথবা কাফির। কাফিরও নয়, মুসলমানও নয়, এরকম কোন স্তর নেই। বরং যে কোন একটা হতে হবে।

আকীদাঃ মুসলমান সব সময় জান্নাতে থাকবে। কখনো বের করে দেয়া হবে না এবং কাফির সব সময় দোযখে থাকবে। কখনো বের করে আনা হবে না।

মাসআলাঃ আল্লাহ তাআলা ভিন্ন অন্য কাউকে ইবাদতের সিজদা কুফরী এবং তাজিমের সিজদা হারাম।

বিদআত

যে বিষয়টা হুযুর (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত নয়, সেটা বিদআত। বিদআত দু প্রকার (১) বিদআতে হাসনা (২) বিদআতে সাইয়া। বিদআতে হাসনা হচ্ছে, যেটা কোন সুন্নাতের বিপরীত বা বিলুপ্তিকারক নয়। যেমন মসজিদসমূহ পাকা করা, সোনালী হরফে কুরআন শরীফ লিখা, মুখে নিয়ত করা, ইলমে কালাম. ইলমে ছরফ, ইলমে নাহ, ইলমে রেযায়ি, বিশেষ করে জ্যোতিষ বিদ্যা ও অঙ্ক শাস্ত্র ইত্যাদি পড়া ও পড়ানো, আজকালকার মাদ্রাসাসমূহ, ওয়াজের মাহফিল, সনদপত্র, দস্তারবন্দী ইত্যাদি অনেক বিষয়, যা হুযুর (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগে ছিল না, ওসববিদআতে হাসনা। এমনকি এ রকম অনেক বিদআত ওয়াজীব পর্যন্ত হয়ে থাকে। যেমন তারাবীহ সম্পর্কে হযরত উমর (রাদি আল্লাহু তাআলা আনহু) ইরশাদ করেছেন نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهٖ - (এটা উত্তম বিদআত)। বিদআতে সাইয়া হচ্ছে সেটাই, যেটা কোন সুন্নাতের বিপরীত বা সুন্নাত বিলুপ্তকারী হয়ে থাকে। এরকম বিদআত মকরূহ বা হারাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমামত ও খিলাফতের বর্ণনা

ইমামত দু'প্রকার। এক, ইমামতে সুগরা অর্থাৎ ছোট ইমামতি। দুই, ইমামতে কুবরা অর্থাৎ বড় ইমামতি। নামাযের ইমামতি হচ্ছে ইমামতে সুগরা; যার আলোচনা নামাযের অধ্যায়ে করা হবে। ইমামতে কুবরা হচ্ছে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতিনিধি হিসেবে মুসলমানদের সমস্ত দ্বীনি ও দুনিয়াবী কাজে শরীয়ত মুতাবিক সার্বিক হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা এবং পাপ নয়, এমন সব বিষয়ে মুসলমানদের থেকে আনুগত্য আদায়ের অধিকার। এ ধরণের ইমামতের জন্য মুসলমান, আযাদ, পুরুষ, জ্ঞানী, প্রাপ্ত বয়স্ক, কুরাইশী ও সামর্থবান হওয়া শর্ত। হাশেমী-আলীর বংশধর হওয়া শর্ত নয়। এটাও শর্ত নয় যে স্বীয় যুগে সবচে উত্তম হতে হবে।

মাসআলাঃ ইমামের আনুগত্য সাধারণ ভাবে প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয, যদি ইমামের হুকুম শরীয়তের বিপরীত না হয়। শরীয়তের বিরুদ্ধে কারো হুকুমের আনুগত্য নেই।

মাসআলাঃ এমন লোককে ইমাম মনোনীত করা চায়, যিনি সাহসী রাজনীতিবিদ ও আলেম হবেন বা উলামায়ে কিরামের সাহায্যে কার্য পরিচালনা করেন।

মাসআলাঃ মহিলা ও অপ্রাপ্ত বয়স্কের ইমামত না জায়েয।

মাসআলাঃ ইমাম অন্যায়াচরণ করার দ্বারা বরখাস্ত হয় না।

খুলাফায়ে রাশেদীন

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) এর পর বরহক খলীফা ও সার্বিক ইমাম হচ্ছেন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক (রাদি আল্লাহু তাআলা আনহু)। অতঃপর যথাক্রমে হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক (রাদি আল্লাহু তাআলা আনহু), হযরত সায়্যিদুনা উছমান গনী (রাদি আল্লাহু তাআলা আনহু) ও হযরত সায়্যিদুনা মওলা আলী (রাদি আল্লাহু তাআলা আনহু)। এরপর হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান (রাদি আল্লাহু তাআলা আনহু) এদের খিলাফতকে খিলাফতে রাশেদা বলা হয়। কারণ তাঁরা হুযূর (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) এর সঠিক প্রতিনিধিত্বের পূর্ণ হক আদায় করেছেন।

আকীদাঃ নাবুয়্যাতের অনুসরণে খিলাফতে রাশেদা ত্রিশ বছর পর্যন্ত বহাল ছিল। অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান (রাদি আল্লাহু তাআলা আনহু) এর ছয়মাস খিলাফত করার পর শেষ হয়ে যায়। আবার আমিরুল মুমেনীন উমর বিন আবদুল

আজিজের খিলাফতও খিলাফতে রাশেদা হিসেবে গণ্য। এবং শেষ যুগে হযরত ইমাম মাহদীর খিলাফতও খিলাফতে রাশেদা হিসেবে বিবেচ্য হবে। হযরত আমীরে মাবিয়া হচ্ছে ইসলামী জগতের প্রথম বাদশাহ। (তকমীলুল ঈমান ও কামাল ইবনে হাম্মাম)

আকীদাঃ নবীগণ ও প্রেরিত পুরুষগণের পর খোদার সমস্ত সৃষ্ট কূলের মধ্যে জ্বীন, মানুষ ও ফিরিশতা থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে হযরত সিদ্দীকে আকবর। অতঃপর যথাক্রমে হযরত ফারুকে আযম, হযরত উছমান এবং হযরত মওলা আলী (রাদি আল্লাহু তাআলা আনহুম)। যে ব্যক্তি মওলা আলীকে হযরত সিদ্দীকে আকবর বা ফারুকে আযম থেকে শ্রেষ্ঠ বলে, সে গোমরাহ ও বদমযহাবী।

সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বায়ত

সাহাবী ওই মুসলমানকে বলা হয়, যিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে উপস্থিত হয়েছেন এবং ঈমান সহকারে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। সমস্ত সাহাবী মর্যাদাবান, ন্যায় পরায়ণ ও সম্মানের পাত্র। যখন কোন সাহাবীর আলোচনা হয়, তখন সম্মান পূর্বক হওয়া ফরয।

আকীদাঃ কোন সাহাবীর সাথে বদআকীদা পোষণ করা গোমরাহী ও বদমযহাবীর পরিচায়ক। হযরত আমীরে মাবিয়া, হযরত আমর বিন আস, হযরত ওয়াহাশী প্রমুখ সাহাবীর শানে বেআদবী করা পাপ। এটা রাফেজীদের আচরণ। হযরত শায়খাইন অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রাদি আল্লাহু তাআলা আনহুমা) এর নিন্দা বরং ওনাদের খিলাফতকে অস্বীকার করা ফকীহগণের মতে কুফরী।

আকীদাঃ কোন ওলী যতই মরতবাশালী হোন না কেন, কোন সাহাবীর মর্যাদায় পৌছতে পারে না। হযরত মওলা আলী (রাদি আল্লাহু তাআলা আনহু) এর সাথে হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার যুদ্ধ ইজতেহাদী ভুল ছিল, যেটা গুনাহ নয়। এ জন্য হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাদি আল্লাহু তাআলা আনহু) কে জালিম, বিপ্লবী, বিদ্রোহী এবং এ জাতীয় কোন মন্দ শব্দ বলা হারাম ও নাজায়েয বরং অভিশপ্ত ও রাফেজী আচরণ। আহলে বায়ত অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) এর বিবিগণ এবং বংশধর সাহাবাদের মত ওনাদেরও অনেক ফযীলতের কথা কুরআন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। সাহাবা ও আহলে বায়তের প্রতি মহব্বত রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি মহব্বত বুঝায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আক্বীদাঃ উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাদি আল্লাহ তাআলা আনহা) কে মিথ্যার অপবাদদানকারী নিঃসন্দেহে কাফির মুরতাদ (শরহে আকাইদ, তকমীল, হিন্দীয়া ইত্যাদি)

আক্বীদাঃ হযরত হাসান ও হুসাইন (রাদি আল্লাহ তাআলা আনহুমা) সর্বোচ্চ স্তরের শহীদদের অন্তর্ভূক্ত। ওনাদের মধ্যে কারো শাহাদতের অস্বীকারকারী গোমরাহ ও বদময়হাবী।

আক্বীদাঃ যে ইমাম হুসাইন (রাদি আল্লাহ তাআলা আনহু)কে বিদ্রোহী বা ইয়াযীদকে বরহক বলে, সে মরদুদ খারেজী ও জাহান্নামের অধিকারী। ইয়াযীদ নাহক ও ফাসিক–ফাজির হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য ইয়াযীদকে কাফির বা মুসলমান না বলা চাই বরং এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয়।

আক্বীদাঃ যে সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বায়তের প্রতি মহব্বত রাখে না, সে গোমরাহ ও বদময়হাবী।

মাসআলাঃ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে পরস্পর যেসব ঘটনাবলী হয়েছে, ওগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করা জঘন্য হারাম। ওনাদের পদস্খলনের জন্য অভিযুক্ত করা, ওনাদের সমালোচনা করা বা ওনাদের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা না জায়েয এবং আল্লাহ ও রসূলের আদর্শের বিপরীত।

বেলায়তের বর্ণনা

ওলী হচ্ছে সেই পূণ্যবান মুমিন, যিনি মারেফাত ও আল্লাহর নৈকট্যের বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন। প্রায়শঃ শরীয়ত মতে রিয়াযত ও ইবাদত করার পর বেলায়তের দরজা পাওয়া যায় এবং কোন কোন সময় শুরুতেই বিনা রিয়াযত ও মুজাহেদায়ও বেলায়ত অর্জিত হয়। সমস্ত ওলীগণের মধ্যে সবচেয়ে বড় মর্যাদা হচ্ছে চার খলীফার। সব যুগেই ওলী হয়ে থাকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে। কিন্তু ওনাদেরকে চিনা সহজ নয়। হযরাত আওলিয়ায়ে কিরামকে আল্লাহ তাআলা বড় আধ্যাত্মিক শক্তি দান করেছেন যে ওনাদের থেকে সাহায্য প্রার্থনা করলে, হাজার হাজার মাইল দূর থেকেও সাহায্য করেন। ওনাদের জ্ঞান খুবই ব্যাপক হয়ে থাকে। এমনকি অনেককে مَاكَانَ وَمَا يَكُوْنُ (যা হয়েছে এবং যা হবে) ও লাউহে মাহফুজের ব্যাপারে অবহিত করা হয়। ইন্তেকালের পর ওনাদের কামালাত ও ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়। ওনাদের মাযারে উপস্থিতি ফয়েজ ও বরকত হাসিলের সহায়ক।ওনাদের প্রতি ঈসালে ছওয়াব পূণ্যময় ও বরকতময়। ওলীগণের উরস অর্থাৎ প্রতি বছর বেছালের দিন কুরআন খানি, ফাতিহা পাঠ, ওয়াজ, ঈসালে ছওয়াব ইত্যাদি ভাল ও ছওয়াবের কাজ।

তবে নাচ, খেলাধূলা, রং তামাশা যে কোন অবস্থায় নিন্দনীয়, বিশেষ করে পবিত্র মাযারসমূহের পার্শ্বে এগুলো অধিক নিন্দনীয়।

ওলীগণের সিলসিলায় দাখিল হওয়া, ওনাদের মুরীদ ও ভক্ত হওয়া উভয় জাহানের কল্যাণকর ও বরকতময়। বায়াত হওয়ার আগে পীরের মধ্যে এ চারটি বিষয় নিশ্চয় দেখে নেয়া চাই।

(১) সুন্নী ও সঠিক আকীদাবান হওয়া চাই। অন্যথায় ঈমানও হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

(২) এতটুকু জ্ঞান থাকা চাই যে স্বীয় প্রয়োজনীয় মাসায়েল যেন কিতাবসমূহ থেকে খুঁজে বের করতে পারেন। তা নাহলে হালাল–হারাম ও জায়েয নাজায়েযের পার্থক্য করতে পারবে না।

(৩) ফাসিক না হওয়া চাই। কারণ ফাসিকের নিন্দা ওয়াজিব এবং পীরের সম্মান জরুরী।

(৪) পীরের সিলসিলা নবী (সাল্লাল্লাহ তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট হওয়া চাই। অন্যথায় উপরস্থ থেকে ফয়েজ পৌছবে না।

نَسْئَلُ اللّٰهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

(আল্লাহ থেকে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা ও পানা কামনা করি।)

তাক্বলীদের বর্ণনা

তাক্বলীদ হচ্ছে চার ইমামের যে কোন এক জনের অনুসরণে শরীয়তের আহকাম পালন করা। যেমন ইমামে আযম আবু হানিফা বা ইমাম মালেক অথবা ইমাম শাফেঈ কিংবা ইমাম হাম্বলের নীতি অনুসারে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি আদায় করা। যে কোন একজনের অনুসরণ ওয়াজিব। একে তকলীদে শখসী বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, এসব ইমামগণ নিজের পক্ষ থেকে কোন মাসআলা পেশ করেন নি বরং কুরআন হাদীছের ভাবার্থ পরিস্কার করে বর্ণনা করেছেন, যা সাধারণ লোকদের, এমনকি সাধারণ আলেমদেরও বুঝে আসে না। সুতরাং ওসব ইমামদের অনুসরণ মূলতঃ কুরআন হাদীছেরই অনুসরণ।

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি এক ইমামের অনুসরণ করে, সে অন্য ইমামের অনুসরণ করতে পারে না। যেমন–কিছু মাসআলায় এক ইমামের আর কিছু মাসআলায় অন্য ইমামের অনুসরণ করা যায় না। বরং সমস্ত মাসআলায় একজন নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ ওয়াজিব। এটাও জায়েয নেই যে হানাফী শাফেঈ হয়ে যাওয়া বা শাফেঈ হানাফী হয়ে যাওয়া। বরং যে আজ পর্যন্ত যে ইমামের অনুসারী,

pdf By Syed Mostafa Sakib

আগামীতেও যেন ওনাকে অনুসরণ করে। এটা সমস্ত উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত অভিমত যে এ চার ইমাম ব্যতীত অন্য কোন ইমাম বা মুজতাহিদের অনুসরণ জায়েয নেই।

নামায

ঈমান ও আক্বীদা বিশুদ্ধ করার পর ফরয সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফরয হচ্ছে নামায। কুরআন-হাদীছে এর অনেক গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। যে নামাযকে ফরয বলে বিশ্বাস করে না বা নগণ্য মনে করে, সে কাফির। আর যে নামায পড়ে না, সে বড় গুনাহগার। পরকালে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। ইসলামী শাসক ওকে কতল করার নির্দেশ দিতে পারবে।

মাসআলাঃ শিশু যখন সাত বছরের হয়, তখন ওকে নামায পড়ার জন্য শিক্ষা দিতে হবে এবং যখন দশ বছরে পদার্পণ করে, তখন প্রয়োজনে প্রহার করে নামায পড়াতে হবে।

নামায পড়ার নিয়ম বর্ণনা করার আগে নামাযের সেই ছয়টি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করছি, যেগুলো ব্যতীত নামায শুরু হতে পারে না। এগুলোকে নামাযের পূর্ব শর্ত বলা হয়।

নামাযের শর্তসমূহঃ পবিত্রতা, সতর ঢাকা, সময়, কিবলামূখী, নিয়ত ও তকবীর তাহরীমা।

প্রথম শর্ত হচ্ছে, পবিত্রতা। এর অর্থ হচ্ছে নামাযীর শরীর, কাপড় ও নামাযের জায়গায় কোন নাপাক বস্তু যেমন মল–মূত্র, রক্ত, মদ, গোবর, ঘোড়া-গাধার মল, মুরগীর বিষ্টা ইত্যাদি না লাগা এবং নামাযী বিনা গোসল ও বিনা ওযু না হওয়া।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, সতর ঢাকা। অর্থাৎ পুরুষের শরীর নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা (হাঁটুসহ)। আর মহিলার সমস্ত শরীর, মুখ ও হাতের তালু ব্যতীত পায়ের গিরা পর্যন্ত ঢেকে রাখা (গিরা সহ)।

তৃতীয় শর্ত হচ্ছে, সময়, অর্থাৎ নামাযের জন্য যে সময় নির্দিষ্ট, সেই সময়ে নামায পড়া। যেমন, ফযরের নামায সুবহে সাদিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত, যোহর সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে প্রত্যেক কিছুর ছায়া মুল ছায়া ব্যতীত দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত। আসর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর থেকে সূর্য ডুবার আগ পর্যন্ত, মগরীব সূর্য ডুবার পর থেকে শ্বেতবর্ণ বিলোপ হওয়া পর্যন্ত এবং ইশা শ্বেতবর্ণ বিলোপ হওয়ার পর থেকে সুবহে সাদিক শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত বলবৎ থাকে।

চতুর্থ শর্ত হচ্ছে, কেবলা মূখী হওয়া অর্থাৎ কাবা শরীফের দিকে মুখ করা।

পঞ্চম শর্ত হচ্ছে, নিয়ত। অর্থাৎ যে সময় যে নামায পড়া হয়, ফরয হোক বা ওয়াজিব বা সুন্নাত অথবা নফল বা কাযা হোক, মনে মনে এর পূর্ণ নিয়ত করা।

৬ষ্ঠ শর্ত হচ্ছে, তকবীর তাহরীমা। অর্থাৎ আল্লাহু আকবর বলা। এটা শেষ শর্ত। এটা বলার সাথে সাথেই নামায শুরু হয়ে গেল। এখন যদি কারো সাথে কথা বলা হয়, কোন কিছু পানাহার করা হয় বা নামাযের বিপরীত কোন কাজ করা হয়, তাহলে নামায ভেঙ্গে যাবে। প্রথম পাঁচ শর্ত তকবীর তাহরীমার আগে এবং নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকা জরুরী। অন্যথায় নামায হবে না।

নামাযের প্রথম শর্তঃ পবিত্রতার বর্ণনা

ওযুর নিয়মঃ যখন ওযু করতে হয়, মনে মনে ওযুর নিয়ত করে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুইবেন। এরপর ডান হাতে মিসওয়াক করবেন। অতঃপর তিনবার কুলি করবেন। কুলি খুব ভাল করে করতে হবে যেন পানি গলা পর্যন্ত এবং দাঁতের গোড়া ও জিহবার নীচে পৌঁছে। যদি দাঁত বা অন্যত্র কোন কিছু আটকে থাকে, বের করে নিবেন। এরপর ডান হাতে তিনবার নাকে পানি দিবেন যেন নাকের হাড় পর্যন্ত পানি পৌঁছে এবং বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুল নাকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করায়ে নাক পরিষ্কার করবেন। অতঃপর দু'হাতে পানি নিয়ে মুখ এমনভাবে ধৌত করবেন, যেন চুল গজানোর স্থান থেকে থুঁতনী পর্যন্ত এবং ডান কানের লতি থেকে বাম কানের লতি পর্যন্ত কোন জায়গা অবশিষ্ট না থাকে। দাঁড়ি থাকলে, সেটাও ধুইবেন এবং গুচ্ছাতে খিলালও করবেন, তবে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় যেন খিলাল করা না হয়। এর পর কনুই পর্যন্ত বরং কনুই এর উপরিভাগ পর্যন্ত উভয় হাত তিন তিনবার ধৌত করবেন। এরপর একবার এভাবে মাথা মুসেহ করবেন যেন উভয় হাত ভিজ্জায়ে বৃদ্ধাঙ্গুলী ও শাহাদত আঙুল বাদ দিয়ে উভয় হাতের অবশিষ্ট আঙুলগুলো পরস্পর নখের সাথে মিলে এবং এ ছয় আঙুলের পেটের অগ্রভাগ মাথার উপর রেখে পিছনের দিকে ঘাড় পর্যন্ত এমনভাবে নিয়ে যাবেন যেন উভয় হাতের শাহাদত ও বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয় এবং দু'হাতের তালু মাথা থেকে আলগা থাকে। এবার ঘাড় থেকে উভয় হাত মাথার দিকে পুণরায় এমনভাবে ফিরায়ে আনবেন যেন উভয় হাতের পিঠ মাথার দুপার্শ্বে লাগে। তারপর শাহাদত আঙুলের পেট দ্বারা কানের ভিতর এবং বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা কানের উপরিভাগ মুসেহ করবেন। আর উভয় হাতের আঙুল সমূহের পিঠের দ্বারা ঘাড় মুসেহ করবেন। তবে হাত যেন গলা পর্যন্ত না যায়। কারণ গলা মুসেহ করা মকরূহ। এবং ডান পায়ের আঙুল থেকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

শুরু করে গিরার উপরিভাগ পর্যন্ত ধৌত করবেন। অতঃপর পায়ের আঙুলগুলো খিলাল করবেন। ওযু শেষ করার পর এ দুআটি পড়ে নিবেনঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

(হে আল্লাহ! আমাকে অধিক তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদের মধ্যে গণ্য কর।) অতঃপর ওযুর অবশিষ্ট পানি থেকে সামান্য দাঁড়িয়ে পান করুন। এটা শিফাদায়ক। এর পর আসমানের দিকে মুখ করে পড়বেন–

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

এরপর কলেমা শাহাদত ও সূরা কদর পড়বেন। উত্তম হচ্ছে, প্রতি অংগ ধোয়ার সময় বিসমিল্লাহ, দরূদ শরীফ ও কলেমা শাহাদত পাঠ করা।

উপরে যে ওযুর নিয়ম বর্ণিত হয়েছে,এতে কিছু বিষয় ফরয, যেগুলো বাদ পড়লে ওযু হবে না, কিছু বিষয় সুন্নাত,যেগুলো ইচ্ছেকৃত বর্জন করলে শাস্তি যোগ্য এবং কিছু বিষয় মুস্তাহাব, যেগুলো বাদ দিলে ছওয়াব কম হয়।

ওযুর ফরযসমূহঃ ওযুর মধ্যে চারটি ফরয। যথা–১) মুখ ধোয়া, অর্থাৎ মাথার গোড়া, যেখান থেকে চুল গজায়, সেখান থেকে থুঁতনী পর্যন্ত এবং এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত মুখের চামড়ার প্রতিটি অংশের উপর একবার পানি প্রবাহিত করা। ২) কনুইর উপর পর্যন্ত উভয় হাত একবার ধোয়া। (৩) এক চতুর্থাংশ মাথা মুসেহ করা অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ মাথার উপর ভিজা হাতে মুসেহ করা বা অন্য কোন উপায়ে কমপক্ষে সে পরিমাণ জায়গা ভিজানো। (৪) উভয় পা গিরা সহ একবার ধোয়া। এ চারটি বিষয় ওযুর জন্য ফরয। এ চারটি বিষয় ছাড়া উপরে যা বর্ণিত হয়েছে, তা সুন্নাত বা মুস্তাহাব। ওযুর অনেক সুন্নাত ও মুস্তাহাব বিষয় রয়েছে। যারা এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক, তারা বাহারে শরীয়ত, ফতওয়ায়ে রেজভীয়া ইত্যাদি দেখতে পারেন।

মাসআলাঃ কোন অংগ ধৌত করার অর্থ হচ্ছে, সেই অংগের প্রতিটি অংশে কমপক্ষে দু'ফোঁটা পানি প্রবাহিত হওয়া। ভিজে গেলে বা তৈলের মত পানি লাগালে বা এক আধ ফোঁটা পানি গড়িয়ে গেলে ধোয়া শুদ্ধ হবে না। এভাবে ধোয়ার দ্বারা ওযু গোসল কোনটা হবে না।

মাসআলাঃ ঠোঁট, নখ, চোখের উপর–নীচের চামড়া, চোখের পলক, অলংকারের নীচের চামড়া, এমন কি নাকফুল ও নথ পড়ার ছিদ্র, দাঁড়ি ও

গোঁফের নীচের চামড়া বা ওই চার অংগের কোন অংশ যদি এক চুলের মাথা পরিমাণ অংশও ধোয়া না হয়, তাহলে ওযু হবে না।

মাসআলাঃ ওযু শুদ্ধ না হলে নামায হবে না। তিলাওয়াতে সিজদা ও কুরআন শরীফ স্পর্শ করার জন্যও ওযু ফরয এবং তওয়াফের জন্য ওয়াজিব।

ওযুর মকরূহ সমূহঃ ওযুর মকরুহাত হচ্ছে ওসব বিষয়,যা ওযুতে না হওয়া বাঞ্চনীয়। যেমন (১) মহিলার গোসল বা ওযুর অবশিষ্ট পানি দ্বারা ওযু করা (২) নাপাক জায়গায় ওযুর পানি নিক্ষেপ করা (৩) মসজিদের ভিতর ওযু করা (৪) ওযুর পানির ফোঁটা ওযুর পাত্রে পড়া (৫) কিবলার দিকে কুলির পানি, নাকটি ব কফ বা থুথু নিক্ষেপ করা। (৬) বিনা প্রয়োজনে ওযুর সময় দুনিয়াবী কথা বলা (৭) অতিরিক্ত পানি খরচ করা (৮) এতটুকু কম পানি খরচ করা,যার ফলে ঠিকমত সুন্নাত আদায় হয় না। (৯) একহাতে মুখ ধোয়া (১০) মুখে পানি নিক্ষেপ করা (১১) ওযুর ফোঁটা কাপড়ে বা মসজিদে পড়তে দেয়া (১২) ওযুর কোন সুন্নাত বাদ দেয়া।

ওযু ভঙ্গকারী বিষয়সমূহঃ মলমূত্র ত্যাগ করলে, পিছনের রাস্তা দিয়ে হাওয়া বের হলে, মলমূত্রের রাস্তা দিয়ে ক্রিমি, পাথর বের হলে, অদি (যৌন উত্তেজক রস) বীর্য ও মযি (বীর্য পাতের পর নির্গত রস) বের হলে, রক্ত, পুঁজ, লালচে পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে, আহার্য দ্রব্য, পানি, পীত বা জমাট রক্ত মুখ ভরে বমি হলে, পাগল বা সংজ্ঞাহীন হলে, চলার সময় পা ঢলে পড়ার মত নেশাগ্রস্থ হলে, জানাযার নামায ব্যতীত অন্য কোন নামাযে অট্টহাসি দিলে, ঘুম গেলে, বেহায়াপনা আচরণ করলে, অর্থাৎ পুরুষ স্বীয় উত্তেজিত লিঙ্গ মহিলার লজ্জাস্থান বা অন্য কোন পুরুষের লজ্জাস্থানের সাথে লাগালে বা মহিলা মহিলা পরস্পর লাগালে এবং মাঝখানে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকলে, এসব কারণে ওযু ভঙ্গ হয়েযায়।

মাসআলাঃ ক্ষত চক্ষু থেকে যে পানি বা ময়লা বের হয়, এর দ্বারা ওযু ভঙ্গ হয়ে যায় এবং সেটা নাপাকও বটে। যে জায়গায় লাগে, সেটা পাক করা প্রয়োজন।

মাসআলাঃ নামাযে এতটুকু আওয়াজ করে হাসলো যে নিজে শুনলো কিন্তু পার্শ্বের লোকেরা শুনে নাই, তাহলে ওযু ভঙ্গ হল না। তবে নামায ভেঙ্গে যাবে।

মাসআলাঃ যদি মুচকি হাসে অর্থাৎ দাঁত বের হলো কিন্তু আওয়াজ মোটেই বের হলো না, তাহলে এর দ্বারা ওযু নামায কোনটাই নষ্ট হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ যে পদার্থ মানুষের শরীর থেকে বের হলে ওযু ভঙ্গ হয় না, তা নাপাক নয়। যেমন সেই রক্ত, যা গড়িয়ে পড়ে না বা সামান্য বমি, যা মুখ ভরা না হয়, সেটা পাক।

মাসআলাঃ কফ, নাকটি, থুথু, ঘাম, ময়লা পাক। এসব জিনিষ শরীর বা কাপড়ে লাগলে, নামায হয়ে যাবে তবে পরিস্কার করে নেয়া উত্তম।

মাসআলাঃ ক্রন্দনের সময় যে অশ্রু বের হয়, সেটার দ্বারা ওযুও ভঙ্গ হয় না এবং নাপাকও নয়।

মাসআলাঃ সতর খুলে গেলে, নিজের বা অন্যের সতর দেখলে বা স্পর্শ করলে ওযু ভঙ্গ হয় না।

মাসআলাঃ দুগ্ধ পোষ্য শিশু বমি করলো, যদি মুখ ভরে বমি করে, তাহলে নাপাক। এক দেরহাম (চান্দির টাকা সমতুল্য) পরিমাণ থেকে অধিক জায়গায় লাগলে, সেটা নাপাক হয়ে যাবে। যদি এ বমিকৃত দুধ পেট থেকে না আসে বরং বুক থেকে ফিরে আসে, তাহলে পাক।

মাসআলাঃ ওযু করার মাঝখানে যদি ওযু ভঙ্গ হল, তাহলে প্রথম থেকে ওযু করবে। এমনকি যদি হাতে পানি নিল, তারপর হাওয়া বের হল, তাহলে সে পানি অকেজো হয়ে গেল এবং সেই পানি দিয়ে কোন অংগ ধৌত করা ঠিক নয়।

গোসলের নিয়ম

গোসলের নিয়ত করে প্রথমে উভয় হাত গিরা পর্যন্ত তিন বার ধুইবেন। এরপর প্রস্রাবের অংগ ধৌত করবেন, নাপাক কিছু লাগুক বা নালাগুক। অতঃপর শরীরের যে সব স্থানে নাপাকী লেগেছে, সেটা ধুইয়ে ফেলবেন। এরপর নামাযের ওযুর মত ওযু করবেন, কিন্তু পা ধুইবেন না। তবে যদি চৌপায়া, খাট বা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে গোসল করেন, তাহলে পাও ধুইয়ে নিবেন। এর পর সমস্ত শরীরে তৈলের মত পানি ছিটায়ে দিবেন। তারপর তিনবার ডান কাঁধে, তিনবার বাম কাঁধে এবং তিন বার মাথায় ও সমস্ত শরীরে পানি দিবেন। অতঃপর গোসলের জায়গা থেকে একটু সরে দাঁড়াবেন এবং ওযু করার সময় পা না ধুইয়ে থাকলে, ধুইয়ে নিবেন। গোসলের সময় কিবলামুখী হবেন না। সমস্ত শরীরে হাত দ্বারা মর্দন করবেন এবং এমন জায়গায় গোসল করবেন, যেথায় কেউ দেখতে না পায়। যদি এরকম না হয়, তাহলে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত সতর ঢেকে রাখা আবশ্যক। গোসল করার সময় কোন প্রকার কথা বলবেন না এবং কোন দুআ দরূদ পাঠ করবেন না। গোসলের পর

গামছা দিয়ে শরীর মুছে ফেললে, কোন ক্ষতি নেই।

মাসআলাঃ নিরাপদ জায়গায় উলঙ্গ গোসল করলে কোন ক্ষতি নেই। তবে মহিলাদের ব্যাপারে খুবই সতর্কতা প্রয়োজন। এমনকি মহিলাদের বসে গোসল করা উত্তম এবং গোসল করার পর সাথে সাথে কাপড় পরে নেয়া প্রয়োজন। ওযুর মধ্যে যেসব বিষয় সুন্নাত ও মুস্তাহাব, গোসলের মধ্যেও তা তদ্রুপ। অবশ্য উলঙ্গ গোসল করার সময় যেন কিবলার দিকে মুখ করা না হয়। তবে লুঙি পরা থাকলে, কিবলার দিকে মুখ করলে কোন ক্ষতি নেই। এটাই হলো গোসলের নিয়ম। এর মধ্যে তিনটি ফরয রয়েছে, যে গুলো ব্যতীত গোসল হবে না এবং নাপাকী দুরীভূত হবে না। বাদবাকীগুলো সুন্নাত বা মুস্তাহাব। ওগুলোর মধ্যে কোনটাই বাদ না দেয়া চাই। তবে কোনটা বাদ পড়লে গোসল হয়ে যাবে।

গোসলের ফরয তিনটিঃ (১) এমনভাবে কুলি করা যেন মুখের প্রতিটি জায়গায়, ঠোঁট থেকে গলার মাথা পর্যন্ত পানি প্রবাহিত হয়। মাড়ি, দাঁত, দাঁতের ফাঁক, জিহবার উভয় পার্শে গলার কিনারা পর্যন্ত যেন পানি প্রবাহিত হয়। রোযাদার না হলে যেন গড়গড়া করে, যাতে পানি ভালমতে সব জায়গায় পৌছে। দাঁতে কোন কিছু আটকে থাকলে (যেমন মাংসের আঁশ, সুপারীর টুকরা, পানের অংশ ইত্যাদি) কোন আঘাত বা কষ্ট না হলে, বের করে ফেলা প্রয়োজন। এরকম না করলে গোসল হবে না এবং গোসল না হলে নামাযও হবে না। (২) নাকে পানি দেয়া। অর্থাৎ নাকের উভয় ছিদ্রে যতদুর নরম জায়গা আছে, ওই পর্যন্ত ধৌত করা এবং পানি নাক টেনে উপরে নিয়ে যাওয়া, যেন চুল বরাবর কোন অংশও বাকী না থাকে। অন্যথায় গোসল হবে না। যদি নাকফুল, নথ ইত্যাদির ছিদ্র থাকে, তাহলে ওখানেও পানি পৌছানো প্রয়োজন। নাকের ভিতর শ্লেষ্মা শুকায়ে থাকলে, ওটাকে পরিস্কার করাও ফরয এবং নাকের পশম ধোয়াও ফরয (৩) সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত হওয়া যেন পায়ের তলা পর্যন্ত কোন অংশ অধৌত রয়ে না যায়। একটি নখের মাথা পরিমাণ অংশও যদি অধৌত থাকে, তাহলে গোসল হবে না।

সতর্কবাণীঃ অনেক লোক নাপাক লুঙি পরে গোসল করে এবং মনে করে যে গোসল করার সময় সব পাক হয়ে যায়। অথচ পানি ঢেলে লুঙি ও শরীরে হাত মর্দনের সময় নাপাকী ছড়িয়ে পড়ে এবং সমস্ত শরীর ও গোসলের পাত্র নাপাক করে ফেলে। এজন্য গোসল করার সময় সব সময় সতর্কতার সাথে শরীর ও সেই কাপড় থেকে নাপাকী পরিস্কার করেই যেন গোসল করা হয়। অন্যথায় গোসলতো দূরের কথা, সেই ভিজা হাত দিয়ে যেসব জিনিষ স্পর্শ করবে, সব না পাক হয়ে যাবে। তবে নদী, পুকুরে গোসল করলে ভিন্ন কথা। অবশ্য তখনও

pdf By Syed Mostafa Sakib

নাপাকীটা এমন হওয়া চাই যেন পানি লাগার সাথে সাথে দূরীভূত হয়ে যায়। অন্যথায় সেখানেও সমস্যা রয়েছে।

গোসল ফরয হওয়ার কারণ সমূহঃ পাঁচটি কারণে গোসল ফরয হয়। যথা– (১) মনি স্বীয় জায়গা থেকে কামভার সহকারে পৃথক হয়ে অংগ দিয়ে বের হলে (২) স্বপ্ন দোষ অর্থাৎ ঘুমের মধ্যে মনি বের হলে (৩) মহিলার লজ্জাস্থানের মুখের সাথে পুরুষের লিঙ্গের সংশ্রব হলে, এতে কামভাব থাকুক বা না থাকুক, বীর্যপাত হোক বা না হোক, উভয় অবস্থায় গোসল ফরয হয়ে যায়। (৪) মহিলার হায়েয অর্থাৎ ঋতুস্রাব বন্ধ হলে (৫) নেফাজ অর্থাৎ শিশু জন্মের পর মহিলার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যে রক্ত ক্ষরণ হয়, সেটা বন্ধ হলে, গোসল ফরয হয়।

মাসআলাঃ মনি কামভাব সহকারে স্বীয় জায়গা থেকে বের হয়নি বরং কোন বোঝা উঠানোর কারণে বা উপর থেকে পড়ে যাবার কারণে বের হয়েছে, তখন গোসল ফরয হবে না, অবশ্য ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ যদি কামভাব ব্যতীত প্রস্রাব করার সময় বা এমনিতে কয়েক ফোঁটা মনি বের হয়ে আসে, গোসল ওয়াজিব হবে না, তবে ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ জুমা, ঈদ, কুরবানী, আরাফাতের দিন এবং ইহরাম বাঁধার সময় গোসল করা সুন্নাত।

মাসআলাঃ যার গোসল অপরিহার্য হয়ে পড়ে, ওর মসজিদে যাওয়া, তওয়াফ করা, কুরআন শরীফ স্পর্শ করা হারাম, যদিওবা এর অলিখিত অংশ বা জিলদ হোক না কেন (হেদায়া, আলমগীরী)। স্পর্শ না করে দেখে বা মুখে পাঠ করা বা কোন আয়াত লিখা বা এমন অংশটি স্পর্শ করা বা পরিধান করা যেটাতে কুরআনী বর্ণ থাকে, সব হারাম।

মাসআলাঃ যদি কুরআন শরীফ জুলদান বা রুমাল ইত্যাদি দ্বারা জড়ানো থাকে, তখন ওটার উপর হাত লাগালে কোন ক্ষতি নেই। (হেদায়া, হিন্দিয়া)

মাসআলাঃ যদি কুরআন শরীফের আয়াত কুরআন পাঠের নিয়তে পড়া না হয়, তাতে কোন ক্ষতি নেই। যেমন বরকতের জন্য 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়লো বা শুকরিয়া জ্ঞাপন করার জন্য 'আলহামদুলিল্লাহে রব্বিল আলামীন' পড়লো বা মুসিবত পেরেশানীর সময় 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন' পড়লো বা দুআর নিয়তে সূরা ফাতিহা বা আয়াতুল কুরসী বা এরকম কোন আয়াত পড়লো, এতে কোন ক্ষতি নেই। (হিন্দিয়া ইত্যাদি)

মাসআলাঃ ওযুবিহীন অবস্থায় কুরআন মজীদ বা এর কোন আয়াত স্পর্শ করা হারাম। স্পর্শ না করে দেখে বা মুখস্থ পড়লে কোন ক্ষতি নেই।

মাসআলাঃ নাপাক অবস্থায় কুরআন শরীফের দিকে তাকালে কোন ক্ষতি

নেই, যদিওবা কুরআন শরীফের বর্ণের উপর দৃষ্টি পড়ে এবং শব্দসমূহ বুঝে আসে এবং মনে পড়ে যায়।

মাসআলাঃ উল্লেখিত লোকদের ফিকহ, হাদীছ ও তফসীরের কিতাব সমূহ স্পর্শ করা মকরূহ।

কোন্ ধরণের পানি দ্বারা ওযু–গোসল জায়েয এবং কোন্ ধরণের পানি দ্বারা নাজায়েয

বৃষ্টি, সাগর, নদী, খাল, নালা, ঝর্ণা, কুপ, বড় হাউজ, বড় পুকুর, চলমান পানি, শিলা বৃষ্টি, বরফ এসব পানি দ্বারা ওযু, গোসল এবং সব রকমের পবিত্রতা অর্জন জায়েয।

মাসআলাঃ চলমান পানি হচ্ছে সেটাই, যেটা খড়কুটা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এধরণের পানি পাক ও পবিত্রকারী। নাপাকী কোন কিছু পড়লে নাপাক হবে না যতক্ষণ এ নাপাকী বস্তু পানির রং, ঘ্রাণ বা স্বাদকে পরিবর্তন না করে। যদি পরিবর্তন করে ফেলে, তাহলে নাপাক হয়ে যাবে। এ নাপাক থেকে তখনই পাক হবে, যখন নাপাক বস্তু পানির তলায় বসে যায় এবং রং ঘ্রাণ ও স্বাদ তিনটা ঠিক হয়ে যায়। বা এতটুকু পবিত্র পানির সংমিশ্রণ ঘটে, যদ্বারা নাপাক বস্তুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় বা পানির রং, ঘ্রাণ ও স্বাদ ঠিক হয়ে যায়। পবিত্র কোন জিনিষের কারণে রং, ঘ্রাণ ও স্বাদ পরিবর্তন হয়ে গেলে, সেটা দিয়ে ওযু, গোসল জায়েয, যতক্ষণ অন্য জিনিষে রূপান্তরিত না হয়।

মাসআলাঃ দশ হাত লম্বা ও দশ হাত প্রস্থ বিশিষ্ট হাউজ বা পুকুরকে বড় হাউজ বলা হয়। এরকম যদি বিশ হাত লম্বা, পাঁচ হাত প্রস্থ বা পঁচিশ হাত লম্বা, চার হাত প্রস্থ মোট কথা লম্বা ও প্রস্থ মিলে একশ বর্গহাত হয় এবং যদি গোল হয় এবং গোলাকারে প্রায় সাড়ে পঁয়ত্রিশ হাত হয় এবং গভীরতা এতটুকুই যথেষ্ট যাতে পানির তলা দেখা না যায়। এ রকম হাউজের বেলায় চলমান পানিরই হুকুম। নাপাকী বস্তু পড়লে নাপাক হবে না, যতক্ষণ নাপাক বস্তুর কারণে রং, ঘ্রাণ ও স্বাদ পরিবর্তন হয়ে না যায়।

মাসআলাঃ বড় হাউজে যদি এরকম নাপাক বস্তু পতিত হয়, যা দেখা যায় না, যেমন মদ, প্রস্রাব ইত্যাদি, তাহলে চারিদিক থেকে ওযু করা যেতে পারে। আর যদি নাপাক বস্তু দৃষ্টি গোচর হয়–যেমন পায়খানা বা মৃত জীব, তাহলে যেদিকে সেই নাপাক বস্তু রয়েছে, সেদিক দিয়ে ওযু না করা উত্তম, অন্য দিক দিয়ে ওযু করা যাবে।

মাসআলাঃ বড় হাউজে এক সাথে অনেক লোক ওযু করতে পারে যদিওবা

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওযুর পানি ওখানে পতিত হয়। কিন্তু নাকটি, থুথু, কফ, কুলি ওখানে না ফেলা চাই। কারণ সেটা নোংরামির পরিচায়ক।

মাসআলাঃ ওযু ও গোসল করার সময় শরীর থেকে যে পানি পতিত হয়, সেটা পাক। কিন্তু সেটা দ্বারা ওযু বা গোসল জায়েয নয়।

মাসআলাঃ যদি ওযুবিহীন ব্যক্তির হাত বা আঙুলী বা নখ অথবা শরীরের এমন কোন অংগ যা ওযুর সময় ধুইতে হয়, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে বড় হাউজ থেকে কম পানি বিশিষ্ট কূপে অধৌত অবস্থায় পতিত হয়; তাহলে সে পানি ওযু গোসলের উপযুক্ত রইলো না। অনুরূপ যে ব্যক্তির উপর গোসল ফরয ওর শরীরের কোন অংশ অধৌত ভাবে পানিতে লাগলে সেই পানি ওযু গোসলের অনুপযুক্ত হয়ে গেল। তবে ধৌত কোন হাত বা শরীরের অংশ পতিত হলে কোন ক্ষতি নেই।

মাসআলাঃ পানিতে হাত পড়লো বা অন্য কোন ভাবে ব্যবহৃত পানিতে পরিণত হয়ে গেল, এখন যদি সেই পানিকে কাজে লাগাতে চান, তাহলে এর থেকে অধিক ভাল পানি সেটার সাথে মিলায়ে নিন। এভাবেও করা যায় যে একদিকে পানি ঢাললেন, অন্য দিকে বের হয়ে গেল, তখন সমস্ত পানি কাজের হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ ছোট ছোট গর্তে পানি রয়েছে এবং ওটাতে নাপাক কোন কিছু পতিত হওয়াটা জানা নেই। তাহলে ওটা দ্বারা ওযু জায়েয।

মাসআলাঃ কোন কাফিরের সংবাদ যে এ পানিটা পাক বা নাপাক, উভয় অবস্থায় পানি পবিত্র থাকবে, কারণ এটা এর আসল রূপ।

মাসআলাঃ কোন বৃক্ষ বা ফলের নিংড়ানো পানি দ্বারা ওযু জায়েয নেই। যেমন কলা গাছ বা তরমুজের পানি বা ইক্ষুর রস।

মাসআলাঃ যে পানিতে সামান্য কোন পবিত্র জিনিষ মিশে গেল যেমন গোলাপ জল, কেওড়ার জল, জাফরান, হরতকি, বালু, সে পানি দ্বারা ওযু গোসল জায়েজ।

মাসআলাঃ কোন রং বা জাফরান পানিতে এতটুকু পড়লো যদ্বারা কাপড় রঙিন হয়ে যাবার মত হয়েছে, তাহলে এর দ্বারা ওযু গোসল জায়েয নেই।

মাসআলাঃ পানির মধ্যে এতটুকু দুধ পডলো, যদ্বারা দধের মত রং হয়ে গেছে, তাহলে ওযু গোসল জায়েয হবে না।

কুপ সমূহের বর্ণনা

মাসআলাঃ কূপে মানুষ বা জীব জন্তুর প্রস্রাব, প্রবাহিত রক্ত, তাড়ি বা যে কোন

প্রকারের মদের ফোঁটা, নাপাক লাকড়ী, নাপাক কাপড় বা অন্য কোন নাপাক জিনিষ পতিত হলে, সম্পূর্ণ পানি বের করে ফেলতে হয়। (খানিয়া ও অন্যান্য গ্রন্থ)

মাসআলাঃ যেসব চতুষ্পদ জন্তুর মাংস খাওয়া হয় না, ওসব জন্তুর মলমূত্র পতিত হলে কূপের পানি নাপাক হয়ে যাবে। অনুরূপ মুরগী ও হাঁসের বিষ্টা পতিত হলে নাপাক হয়ে যাবে এবং এসবের জন্য কূপের সম্পূর্ণ পানি বের করে ফেলতে হবে।

মাসআলাঃ যে কূপের পানি নাপাক হয়ে গেছে, ওখান থেকে এক ফোঁটা পানিও যদি পাক কূপে পতিত হয়, তাহলে সেটার পানিও নাপাক হয়ে যাবে এবং উভয় কূপের একই হুকুম হবে। এরকম বালতি বা রশি বা কলসী যেটাতে নাপাক কূপের পানি লেগেছে, পাক কূপে ফেলা হলে, সেটাও নাপাক হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ কূপে মানুষ,গরু, কুকুর বা অন্য কোন রক্ত বিশিষ্ট জন্তু ওগুলোর বরাবর বা ওগুলো থেকে বড় আকৃতির জন্তু পড়ে মারা যায়, তাহলে সম্পূর্ণ পানি বের করে ফেলতে হবে।

মাসআলাঃ মোরগ মুরগী, বিড়াল, ইঁদুর, টিকটিকি বা অন্য কোন বন্য পশু যদি কূপে পড়ে মরে ফুলে যায় বা ফেটে যায়, তাহলে সম্পূর্ণ পানি বের করে ফেলতে হবে।

মাসআলাঃ যদি এসব বাইরে মারা গিয়ে পরে কূপে পতিত হয়, তখনও একই হুকুম। অর্থাৎ সম্পূর্ণ পানি বের করে ফেলতে হবে।

মাসআলাঃ টিকটিকি বা ইঁদুরের লেজ কেটে গিয়ে কূপে পতিত হলো এবং যদিওবা ফুলে বা ফেটে গেল না, তবুও কূপের সম্পূর্ণ পানি বের করে ফেলতে হবে। কিন্তু যদি ওটার গোড়ায় মোম লাগিয়ে দেয়া হয়, তাহলে বিশ বালতি পানি ফেলে দিতে হবে।

মাসআলাঃ বিড়াল একটি ইঁদুর ধরলো এবং একে আহত করলো। পরে ইঁদুরটা পালিয়ে কূপে গিয়ে পতিত হলো, তখন কূপের সম্পূর্ণ পানি বের করে ফেলতে হবে।

মাসআলাঃ অপরিপূর্ণ শিশু বা যে শিশুটা মৃত জন্ম হয়েছে, কূপে পড়ে গেলে, সমস্ত পানি বের করে ফেলতে হবে, যদিওবা পড়ার আগে গোসল করানো হয়েছিল।

মাসআলাঃ শূকর কূপে পড়ে জীবিত বের হয়ে আসলেও সম্পূর্ণ পানি বের করে ফেলতে হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ শূকর ভিন্ন অন্য কোন প্রাণী যেটার এঁটো নাপাক (যেমন বাঘ, নেকড়ে বাঘ, শৃগাল, কুকুর) কূপে পতিত হলো এবং ওটার শরীরে কোন প্রকারের নাপাকী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ভাবে জানা নেই এবং ওটার মুখ পানিতে পড়েনি, তাহলে পানি পাক এবং এর ব্যবহার জায়েয। কিন্তু সতর্কতামূলক বিশ বাল্‌তি পানি বের করে ফেলা উত্তম।

মাসআলাঃ কোন জন্তু যেটার লালানাপাক (যেমন কুকুর, বাঘ, চিতাবাঘ, শৃগাল, নেকড়ে বাঘ ইত্যাদি) যদি কূপে পতিত হয় এবং এর মুখ পানিতে লাগে তাহলে কূপের পানি নাপাক হয়ে গেল। সম্পূর্ণ পানি বের করে ফেলতে হবে।

মাসআলাঃ গাধা বা খচ্চর কূপে পতিত হলো এবং জীবিত বের হয়ে আসলো, তখন এর মুখ যদি পানিতে পড়ে, তাহলে কূপ নাপাক হয়ে গেল, সম্পূর্ণ পানি বের করে ফেলতে হবে। আর যদি মুখ পানিতে না লাগে, তাহলে বিশ বাল্‌তি পানি বের করতে হবে। (কাজী খা ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ উন্মুক্তমুরগী কূপে পতিত হলো এবং জীবিত বের হয়ে আসলো। তখন চল্লিশ বালতি পানি বের করে ফেলতে হবে।

মাসআলাঃ যেসব পশুর এঁটো পাক (যেমন ভেড়া, ছাগল, গরু, মহিষ, হরিণ, নীল গরু) এগুলোর কোন একটা যদি কূপে পতিত হয় এবং জীবিত বের হয়ে আসে, তাহলে কূপ পাক থাকবে, তবে বিশ বাল্‌তি পানি বের করে ফেলা চাই। (কাজী খা ও অন্যান্য গ্রন্থ)

মাসআলাঃ কোন পশু ছোট হোক বা বড় হোক কূপে পতিত হলে এবং ওটার শরীরে নাপাকী লেগে থাকাটা নিঃসন্দেহে জানা থাকলে, কূপ না পাক হয়ে যাবে এবং সম্পূর্ণ পানি বের করে ফেলতে হবে। যেমন মুরগী পায়খানা ঘাটলো এবং তক্ষুনি পা পরিস্কার হওয়ার আগে কূপে পতিত হলো তখন কূপ নাপাক হয়ে গেল এবং সম্পূর্ণ পানি বের করে ফেলতে হবে বা ইঁদুর পায়খানার টাংগিতে হাবুডুবু খেয়ে এসে কূপে পতিত হলো, তখন সম্পূর্ণ পানি বের করে ফেলতে হবে। কেননা কূপে মুরগী বা ইঁদুর পড়ার জন্য নয়, বরং নাপাকী পড়ার জন্যই নাপাক হয়ে গেল।

মাসআলাঃ কূপে ওধরণের পশু পড়লো, যেটার এটো পাক যেমন ছাগল ইত্যাদি অথবা যেটার এঁটো মকরূহ যেমন মুরগী, ইঁদুর ইত্যাদি এবং কোন পানি বের করে ফেলা হলো না এবং ওযু করে নিল, তখন ওযু হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার, কাজী খাঁ ইত্যাদি।)

মাসআলাঃ জুতা বা বল কূপে পড়লো এবং সেটায় অপবিত্র বস্তু যুক্ত হওয়াটা নিশ্চিত, তাহলে সম্পূর্ণ পানি বের করতে হবে। অন্যথায় বিশ বালতি বের

করতে হবে। নাপাকীযুক্ত হওয়ার ধারণা ধর্তব্য নয়। (বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ মুরগীর তাজা ডিম যেটার উপর এখনও আদ্রতা বাকী আছে, পানিতে পতিত হলে, পানি নাপাক হবে না, যদি মুরগীর পেটের আদ্রতা ভিন্ন অন্য কোন নাপাকী না লাগে। অনুরূপ ছাগল ছানা জন্ম হওয়ার সাথে সাথে যদি পানিতে পতিত হয় এবং মারা না যায়, তখনও পানি নাপাক হবে না।

মাসআলাঃ উড়ন্ত হালাল প্রাণী যেমন কবুতর বা পাখির মল বা শিকারী পাখী যেমন চিল, বাজ পাখী ইত্যাদির মল কূপে পতিত হলে, কূপ নাপাক হবে না। এরকম ইঁদুর, বাদুরের মূত্রের দ্বারা নাপাক হবে না। (খানিয়া ও অন্যান্য কিতাব) প্রস্রাবের খুবই ক্ষুদ্র ছিটকা যেমন সুইঁর মাথার মত এবং নাপাক ধূলি কণা পড়লে, নাপাক হবে না। (বাহারে শরীয়ত ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ জলজ প্রাণী যেমন মাছ,ব্যাঙ ইত্যাদি যেগুলো পানিতে জন্ম হয়, যদি কূপে মারা যায় বা মৃত পতিত হয়, তাহলে পানি নাপাক হবে না, যদিওবা ফুলে ফেটেও যায়। কিন্তু যদি ফেটে এর ক্ষুদ্রাংশগুলো পানির সাথে মিশে যায়, তাহলে সেই পানি পান করা হারাম।

মাসআলাঃ স্থল ও জলজ ব্যাঙের একই হুকুম অর্থাৎ পানিতে মরে গেলে এমনকি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলেও পানি নাপাক হবে না। কিন্তু বনের বড় ব্যাঙ যেগুলোতে প্রবাহিত হওয়ার মত রক্ত থাকে, সেটার হুকুম ইঁদুরের হুকুমের মত। জলজ ব্যাঙের আঙুল সমূহের মাঝখানে পাতলা চামড়া হয়ে থাকে এবং শুকনায় বিচরণকারী গুলোর তা হয় না। (বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ যার জন্ম পানিতে নয়, কিন্তু পানিতে থাকে, যেমন হাঁস, সেটা কূপে মারা গেলে পানি নাপাক হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ ইঁদুর, ছুঁচো, পাখী, টিকটিকি, গিরগিটি বা ওগুলোর সমান বা ছোট কোন প্রাণী কূপে পড়ে মারা যায় এবং এখনও ফুলে বা ফেটে নাই, তাহলে বিশ বাল্‌তি থেকে ত্রিশ বালতি পর্যন্ত পানি বের করে ফেলতে হবে। আর যদি ফুলে বা ফেটে যায়, তাহলে সম্পূর্ণ পানি বের করে ফেলতে হবে।

মাসআলাঃ কবুতর বা বিড়াল বা মুরগী পতিত হয়ে মারা গেল এবং ফেটে নাই বা ফুলে নাই, তাহলে চল্লিশ থেকে ষাট বালতি পানি বের করতে হবে এবং ফেটে বা ফুলে গেলে সম্পূর্ণ পানি বের করতে হবে।

মাসআলাঃ দু'টি ইঁদুর পড়ে মারা গেল এবং এখনও ফেটে বা ফুলে নাই, তাহলে বিশ থেকে ত্রিশ বালতি পর্যন্ত পানি বের করতে হবে। আর যদি তিন বা চার বা পাঁচটি হয়, তাহলে চল্লিশ থেকে ষাট বাল্‌তি পানি বের করে ফেলতে হবে এবং ছয়টা হলে সম্পূর্ণ পানি বের করে ফেলতে হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ দুটি বিড়াল যদি পড়ে মারা যায়, তাহলে সম্পূর্ণ পানি বের করতে হবে।

মাসআলাঃ ওযু বিহীন অবস্থায় এবং যে ব্যক্তির উপর গোসল ফরয হয়েছে, এমন ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে কূপে অবতরণ করলে এবং ওর শরীরে কোন নাপাকী বস্তু লেগে না থাকলে; বিশ বালতি পানি বের করতে হবে আর যদি বালতি উঠানোর জন্য অবতরণ করে, তাহলে কিছু করতে হবে না।

মাসআলাঃ কূপে মানুষ পতিত হলো এবং জীবিত বের হয়ে আসলো এবং ওর শরীরে কোন নাপাকীও ছিল না, তাহলে কূপের পানি নাপাক হবে না। তবুও বিশ বালতি পানি বের করে ফেলা উচিত।

মাসআলাঃ যেসব প্রাণীর চলমান রক্ত থাকে না (যেমন মশা, মাছি ইত্যাদি, এগুলো মারা যাওয়ার ফলে পানি নাপাক হবে না।

ফায়দাঃ মাছি যদি রান্না করা তরকারীতে পড়ে, তাহলে সেটাকে তরকারীতে ডুবায়ে ফেলে দিয়ে তরকারীটা খাওয়া যাবে। (বাহারে শরীয়ত) মৃত প্রাণীর হাড় যেটায় মাংস বা চর্বি লেগে থাকে, পানিতে পড়লে সেই পানি নাপাক হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ পানি বের করে ফেলতে হবে। আর যদি মাংস কিংবা চর্বি লেগে না থাকে, তাহলে পানি নাপাক হবে না। কিন্তু শূকরের হাড় পতিত হলে যে কোন অবস্থায় নাপাক হয়ে যাবে, মাংস বা চর্বি লেগে থাকুক বা না থাকুক। (বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ শিশু বা কাফির পানিতে হাত দিল এবং হাতে নাপাক বস্তু রয়েছে বলে জানা যায়, তাহলে পানি নাপাক হয়ে গেল। অন্যথায় নাপাক হবে না। তবে অন্য পানি দ্বারা ওযু করাটা উত্তম।

মাসআলাঃ গোবর, লীদ ইত্যাদি যদিওবা নাপাক কিন্তু যৎসামান্য হলে মাফ এবং পানি নাপাক হয়ে যাবার হুকুম দেয়া যাবে না।

(খানিয়া ও অন্যান্য কিতাবাদি)

মাসআলাঃ পূর্ণ পানি বের করে ফেলার অর্থ হচ্ছে এতটুকু পানি বের করে ফেলা যে এরপর বালতি ফেললে যেন আধা ও পূর্ণ হয় না। এর মাটি বের করার প্রয়োজন নেই এবং দেয়ালও ধোয়ার দরকার নেই। অতটুকু পানি বের করলে পাক হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ ইতোপূর্বে বিভিন্ন মাসআলায় যে বলা হয়েছে, এতটুকু এতটুকু পানি বের করতে হবে, এর অর্থ হচ্ছে প্রথমে পতিত প্রাণী বা নাপাকী বস্তু বের করবে। এরপর নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি বের করবে। যদি সেই জিনিষটা তথায় পড়ে

থাকে, তাহলে যত পানিই উঠানো হোক না কেন, অর্থহীন।

মাসআলাঃ যে কূপের সাথে বালতি লটকানো থাকে, সেটা বড় হোক বা ছোট হোক) গণনা মতে পানি বের করতে হবে আর যদি সেই কূপের কোন নির্দিষ্ট বালতি না থাকে, তাহলে এতবড় বালতি হলে চলবে, যেটায় এক সাআ (অর্থাৎ প্রায় চার কেজি) পরিমাণ পানি ধারণ করে।

মাসআলাঃ বালতি ভর্তি পানি বের করার প্রয়োজন নেই। যদি কিছু পানি সিটকে পড়ে যায় বা উপচে পড়ে কিন্তু অর্ধেক থেকে অধিক রয়ে যায়, তাহলে পূর্ণ বালতি হিসেবে গণ্য করা হবে।

মাসআলাঃ যদি বড় ছোট বিভিন্ন বালতি দ্বারা পানি বের করা হয়, তাহলে এক সা (অর্থাৎ চার কেজি) পরিমাণ পানিকে এক বালতি হিসেব করে বা নির্দিষ্ট বালতির সমপরিমাণ পানি বের করতে হবে।

মাসআলাঃ যে কূপের পানি নাপাক হয়েছে, সেটা থেকে শরীয়তের হুকুম মুতাবিক নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি বের করে ফেলা হলে, সেই রশি, বালতি, যেটা দিয়ে বের করা হলো, সব পাক হয়ে গেছে, ধোয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

মাসআলাঃ যে কূপ এরকম যে ওটার পানি কমে না, যত পানি বের করা হোক না কেন, যদি সেটাতে এমন নাপাকী বস্তু পড়লো বা এমন প্রাণী মারা গেল যার জন্য সম্পূর্ণ পানি বের করে ফেলার হুকুম, তাহলে এরকম অবস্থায় শরীয়তের হুকুম হচ্ছে প্রথমে সেটায় কি পরিমাণ পানি আছে তা জেনে নেবে অতঃপর সেই পরিমাণ পানি বের করে ফেলবে। বের করার সময় যে পানিটা বৃদ্ধি পাবে, সেটা ধরা হবে না। যেমন স্থির করে নিলেন যে হাজার বালতি পানি হবে, তাহলে এক হাজার বালতি পানি বের করে ফেললে পাক হয়ে যাবে। সেই সময় কতটুকু পানি আছে, তাজানার নিয়ম হচ্ছে দু'জন পরহিজগার মুসলমান যাদের এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে, তাদের থেকে জেনে নেয়া এবং ওদের কথামত পানি বের করে ফেললে, কূপ পাক হয়ে যাবে। আর একটি নিয়ম হচ্ছে পানির গভীরতা রশি বা বাঁশ দিয়ে মেপে নিতে হবে, এরপর কয়েক জন লোক খুব তাড়াতাড়ি একশ বালতি পানি বের করে ফেলবে; এরপর পুণরায় মেপে দেখবে এবং যত টুকু কমবে সে হিসেবে পানি বের করে ফেলবে। যেমন মনে করুন, প্রথমবার মাপার সময় দশ হাত পানি ছিল। একশ বালতি বের করে ফেলার পর (দেখা গেল যে) নয় হাত পানি অবশিষ্ট রইলো, তাহলে বুঝা গেল যে এক হাজার বালতি পানি বের করলে, পূর্ণ পানি বের হয়ে যাবে এবং কূপ পাক হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ কূপ থেকে মৃত জন্তু বের করা হলো এবং এর পতিত হওয়ার সময়টা যদি জানা যায়, তাহলে সেই সময় থেকে পানি নাপাক বলে গণ্য হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওই সময়ের পর যদি কেউ সেই পানি দ্বারা ওযু বা গোসল করলো, তাহলে ওযুও হলো না এবং গোসলও হলো না। সেই ওযু বা গোসল দ্বারা যত নামায পড়া হয়েছে, সবই বাতিল সাব্যস্ত হবে। ওগুলো পুণরায় পড়তে হবে। অনুরূপ সেই পানি দ্বারা যদি কাপড় ধোয়া হয় বা অন্য কোন ভাবে সেই পানি শরীরে বা কাপড়ে লাগে, তাহলে কাপড় এবং শরীরকে পুণরায় পাক করা প্রয়োজন এবং সেই কাপড় পরে যে নামায সমূহ পড়া হয়েছে, তা পুণরায় পড়া ফরয। যদি সেই জন্তুটি কখন পতিত হয়েছে, জানা না যায়, তাহলে যে সময় থেকে দেখা গেছে, তখন থেকে নাপাক বলে ধরে নিতে হবে, যদিওবা সেটা ফুলে ফেটে যায়। দেখা যাবার আগে পানি নাপাক হবে না এবং এর আগে যে ওযু গোসল করা হয়েছে বা কাপড় ধোয়া হয়েছে,তাতে কোন ক্ষতি হবে না। এটার উপরই ফতওয়া।

নাজাসত (নাপাকী) সমূহের বর্ণনাঃ

নাজাসত (নাপাকী) দু'প্রকার–গলীজা ও খফীফা। নাজাসতে গলীজা যদি কাপড়ে বা শরীরে এক দেরহাম (চান্দির টাকা) এর অধিক জায়গায় লেগে যায়, তাহলে ওটা পাক করা ফরয, অন্যথায় নামায হবে না। আর যদি দেরহামের বরাবর হয়, তাহলে পাক না করে নামায পড়া মকরূহে তাহরীমী এবং এ রকম নামায পুণরায় আদায় করা ওয়াজিব। এবং যদি এক দিরহাম থেকে কম হয়, তাহলে পাক করা সুন্নাত। পাক না করলে নামায হয়ে যাবে তবে সুন্নাতের বিপরীত হবে। তাই পাক করে ফেলাটাই উত্তম।

মাসআলাঃ যদি নাপাকী গাঢ় হয় যেমন মল, গোবর ইত্যাদি, তাহলে দেরহামের বরাবর বা কমবেশী হওয়ার অর্থ হচ্ছে ওজনে সেই পরিমাণ হওয়া আর যদি নাপাকী বস্তু তরল হয়, যেমন প্রস্রাব, মদ ইত্যাদি তাহলে দেরহাম বলতে এর দৈর্ঘ্য প্রস্থ বুঝাবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে দেরহামের ওজন এক্ষেত্রে $\frac{২}{৫}$ রত্তি এবং যাকাতের ক্ষেত্রে $\frac{১}{৫}$ রত্তি এবং দেরহামের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বলতে এখানে হাতের তালুর গভীর অংশ বরাবর জায়গা বুঝায়, যেটা চান্দির এক টাকার পরিমাণ জায়গার সমতুল্য হয়ে থাকে. (দুরুল মুখতার ও বাহারে শরীয়ত)

নাজাসতে খফীফা কাপড়ের যে অংশে (যেমন আস্তিন, কলার, দামন ইত্যাদি) বা যে অংগে (যেমন হাত, পা, মাথা ইত্যাদি) লাগে এবং সেটা যদি সেই অংশ বা অংগের এক চতুর্থাংশের কম হয়, তাহলে মাফ অর্থাৎ নামায হয়ে যাবে এবং যদি পূর্ণ এক চতুর্থাংশ হয়ে থাকে, তাহলে ধোয়া ব্যতীত নামায হবে না।

(আলমগীরী ও অন্যান্য কিতাব)।

মাসআলাঃ নাজাসতে গলীজা ও খফীফার এ পার্থক্য শরীর বা কাপড়ে লাগার ক্ষেত্রে। কিন্তু যদি কোন তরল জিনিষ যেমন পানি, সিরকা, দুধে এক ফোঁটাও পড়ে এবং সেটা গলীজা হোক বা খফীফা, সম্পূর্ণ জিনিষটা নাপাক করে দিবে, যদি সেই জিনিষ বড় হাউজ পরিমাণ না হয়। (হিন্দিয়া ও অন্যান্য কিতাব)

নাজাসতে গলীজাঃ মানুষের শরীর থেকে যে জিনিষটি বের হলে ওযু বা গোসল ভঙ্গ হয়ে যায়, সেটা নাজাসতে গলীজা। যেমন মলমূত্র, প্রবাহিত রক্ত, পূঁজ, মুখভর্তি বমি, হায়েজ, নেফাস, ইস্তেহাজার রক্ত, মনি, মযি, অদি, ক্ষত চোখের পানি, নাভি বা স্তনের পানি, যেটা ব্যথা হয়ে বের হয়। স্থলের প্রত্যেক জন্তুর, হালাল হোক বা হারাম, প্রবাহিত রক্ত এমনকি গিরগিটি ও টিকটিকির রক্তও এবং মৃত জন্তুর চর্বি ও মাংস এবং হারাম চতুস্পদ জন্তু যেমন কুকুর, বিড়াল, বাঘ, চিতাবাঘ, শৃগাল, নেকড়েবাঘ, গাধা, খচ্চর, শূকর ইত্যাদির মলমূত্র এবং ঘোড়া ও অন্যান্য সকল হালাল চতুস্পদ জন্তুর মল, যেমন গরু, মহিষ, উট, নীল গরু ইত্যাদির গোবর এবং যে সব পাখী উপরে উড়তে পারে না যেমন মুরগী, হাস ইত্যাদির বিষ্ঠা এবং সকল প্রকারের মদ, নেশাদায়ক তাড়ি, সাপের মলমূত্র এবং সেই পাহাড়ী সাপ ও ব্যাঙের মাংস যেটায় প্রবাহিত হওয়ার মত রক্ত থাকে যদিওবা জবেহকৃত হয়। অনুরূপ ওসবের চামড়া যদিওবা বিশুদ্ধ করা হয় এবং শূকরের মাংস, হাড়, চামড়া, পশম যদিওবা জবেহকৃত হয়, এ সব নাজাসতে গলীজা (আলমগীরী ইত্যাদি)

মাসআলাঃ দুগ্ধ পোষ্য শিশুর প্রস্রাব নাজাসাতে গলীজা। সাধারণ লোকদের কাছে দুগ্ধ পোষ্য শিশুর প্রস্রাব পাক বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, সেটা সম্পূর্ণ ভুল (কাজী খাঁ ও রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ দুগ্ধ পোষ্য শিশুর মুখ ভর্তি দুধবমিও নাজাসতে গলীজা।

মাসআলাঃ টিকটিকি ও গিরগিটির রক্ত নাজাসতে গলীজা।

মাসআলাঃ হাতীর শুঁড়ের লালা, বাঘ, কুকুর, চিতা বাঘ ও অন্যান্য হিংস্র চতুস্পদ জন্তুর লালা নাজাসতে গলীজা। (কাজী খাঁ)

মাসআলাঃ নাজাসতে গলীজা নাজাসাতে খফীফার সাথে মিশ্রিত হলে সম্পূর্ণ গলীজায় পরিণত হয়।

মাসআলাঃ কোন কাপড়ে বা শরীরের কয়েক জায়গায় নাজাসতে গলীজা লেগেছে কিন্তু কোন জায়গায় দেরহামের বরাবর নয় তবে সবগুলো মিলে এক দেরহামের বরাবর হয়, তাহলে দেরহামের বরাবর মনে করা হবে এবং একদেরহাম থেকে অতিরিক্ত হলে অতিরিক্ত মনে করা হবে নাজাসাতে খফীফার ব্যাপারেও সমষ্টির উপর হুকুম দেয়া হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নাজাসতে খফীফাঃ যে সব পশুর মাংস হালাল যেমন গরু, মহিষ, ভেড়া ছাগল, উট, নীলগরু ইত্যাদির মূত্র, ঘোড়ার মূত্র এবং যে সব পাখীর মাংস হারাম (সেটা শিকারী হোক বা না হোক) যেমন কাক, চিল, বাজ ইত্যাদির মল নাজাসতে খফীফা (হিন্দিয়া ও অন্যান্য গ্রন্থ)

মাসআলাঃ হারাম জন্তুর দুধ নাপাক। অবশ্য ঘোড়ার দুধ পাক, কিন্তু পান করা জায়েয নেই (বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ যে সব হালাল পাখী আকাশে উড়ে যেমন কবুতর, ময়না, কুক্কুট, উড়ন্ত হাঁস ইত্যাদির বিষ্ঠা পাক।

মাসআলাঃ বাদুরের মল মূত্র উভয়টা পাক (রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ মাছ, পানির অন্যান্য প্রাণী, ছারপোকা ও মশার রক্ত পাক (হিন্দিয়া ইত্যাদি)

মাসআলাঃ সুইয়ের মাথার পরিমাণ প্রস্রাবের খুবই ক্ষুদ্র ছিটকা শরীর বা কাপড়ে পড়লে কাপড় বা শরীর পাক থাকবে (কাজী খাঁ)

মাসআলাঃ যে কাপড়ে প্রস্রাবের এ রকম ক্ষুদ্র ছিটকা পড়েছে, সেই কাপড় যদি পানিতে পড়ে যায়, পানি নাপাক হবে না। (বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ যে রক্ত আঘাতের স্থান থেকে প্রবাহিত হয়নি, সেটা পাক। (বযাযিয়া কাজী খাঁ)

মাসআলাঃ মাংস, তিলি ও কলিজায় যে রক্ত রয়ে যায়, সেটা পাক আর যদি এ সব রক্তে প্রবাহিত রক্ত লেগে থাকে, তাহলে নাপাক, ধোয়া ব্যতীত পাক হবে না। (হিন্দিয়া, বযাযিয়া, মুনিয়া)

মাসআলাঃ পকেট ইত্যাদিতে প্রস্রাব বা রক্ত বা মদভর্তি শিশি রেখে নামায পড়লে, নামায হবে না। (মুনিয়া ইত্যাদি)

মাসআলাঃ পকেটে ডিম থাকলে এবং সেটাতে রক্তের সৃষ্টি হলেও নামায হয়ে যাবে। (মুনিয়া ইত্যাদি)

মাসআলাঃ পায়খানা প্রস্রাবের পর ঢিলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করলো। অতঃপর ওই জায়গা থেকে ঘাম বের হয়ে শরীর বা কাপড়ে লাগলো, তাহলে শরীর বা কাপড় নাপাক হবে না। (বাহারে শরীয়ত)

মাস্আলাঃ নাপাক জিনিষের ধোঁয়া শরীরে বা কাপড়ে লাগলে, শরীর বা কাপড় নাপাক হবে না। (বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ রাস্তার কাদা পাক, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটাতে নাপাকী বস্তু হওয়াটা জানা না যায় এবং যদি পায়ে বা কাপড়ে লাগে এবং না ধুয়ে নামায পড়ে নেয়া

হয়,তাহলে নামায হয়ে যাবে। কিন্তু ধুয়ে ফেলা উত্তম। (বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ রাস্তায় পানি ছিটানো হচ্ছিল। তখন মাটি থেকে ছিটকা উঠে কাপড়ে পড়লে কাপড় না পাক হবে না। তবে ধুয়ে ফেলাটা উত্তম।

(বাহারে শরীয়ত)

এঁটো এবং ঘামের বর্ণনা

মাসআলাঃ মানুষ (অপবিত্র হোক বা হায়েজ, নিফাসওয়ালী মহিলা হোক) এর এঁটো পাক। (খানিয়া ও হিন্দিয়া)

মাসআলাঃ কাফিরের এঁটোও পাক। তবে এর থেকে দুরে থাকা উচিত। যেমন থুথু, নাকটি, কফ পাক, কিন্তু মানুষ এগুলোকে ঘৃণা করে। কাফিরের এঁটোকে এগুলো থেকে নিকৃষ্ট মনে করা চাই। (হিন্দিয়া অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ যে সব প্রাণীর মাংস খাওয়া হয় চতুস্পদ জন্তু হোক বা পাখী, ওগুলোর এঁটো পাক। যেমন গরু, মহিষ, ছাগল, কবুতর, তিতির ইত্যাদি।

মাসআলাঃ যে মুরগী খোলা বিচরণ করে এবং ময়লা আবর্জনায় মুখ দেয়, ওটার এঁটো মকরূহ। আর যদি বাঁধা থাকে, তাহলে পাক।

মাসআলাঃ ঘোড়ার এঁটো পাক। (হিন্দিয়া ও অন্যান্য গ্রন্থ)

মাসআলাঃ শূকর, কুকুর, বাঘ, চিতাবাঘ, নেকড়ে বাঘ, হাতী, শৃগাল এবং অন্যান্য হিংস্র জন্তুর এঁটো নাপাক। (হিন্দিয়া খানিয়া ইত্যাদি)

মাসআলাঃ ঘরে অবস্থানকারী প্রাণী যেমন বিড়াল, ইঁদুর, সাপ, টিকটিকি ইত্যাদির এঁটো মকরূহ। (খানিয়া, আলমগীরী)

মাসআলাঃ জলজ প্রাণীর এঁটো পাক। ওসবের জন্য পানিতে হোক বা না হোক।

মাসআলাঃ উড়ন্ত শিকারী প্রাণী যেমন চিল, বাজ ইত্যাদি) এর এঁটো মকরূহ।

মাসআলাঃ কাকের এঁটো মকরূহ (বাহার)

মাসআলাঃ বাজ, চিল ইত্যাদিকে যদি পালন করে শিকারের কাজে নিয়োজিত করে এবং ঠোঁটে নাপাকী না লাগে তাহলে ওগুলোর এঁটো পাক।

মাসআলাঃ গাধা, খচ্চরের এঁটো সন্দেহযুক্ত। ওগুলোর এঁটো-পানি দ্বারা ওযু হতে পারে না।

মাসআলাঃ যে এঁটো-পানি পাক, সেটা দিয়ে ওযু ও গোসল জায়েয। তবে কোন নাপাক ব্যক্তি যদি কুলি করা ব্যতীত পানি পান করে, তাহলে ওর এঁটো পানি দ্বারা ওযু নাজায়েয। কারণ সেটা ব্যবহৃত পানিতে পরিণত হয়ে গেল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ ভাল পানি মওজুদ থাকা অবস্থায় মকরূহ পানি দ্বারা ওযূ-গোসল মকরূহ। তবে যদি ভাল পানি মওজুদ না থাকে, তাহলে কোন ক্ষতি নেই।

মাসআলাঃ মকরূহ প্রমাণিত এঁটো পানাহার করা ধনীদের জন্য মকরূহ কিন্তু গরীব ও অভাবীদের জন্য বিনা মকরূহে জায়েয।

মাসআলাঃ ভাল পানি মওজুদ থাকা অবস্থায় সন্দেহযুক্ত পানি দ্বারা ওযু গোসল নাজায়েয এবং যদি ভাল পানি পাওয়া না যায়, তাহলে সন্দেহযুক্ত পানি দ্বারা ওযু গোসল করবে এবং সাথে সাথে তায়াম্মুমও করবে। এ অবস্থায় ওযু ও গোসলের নিয়ত প্রয়োজন হবে এবং কেবল তায়াম্মুম বা কেবল ওযু ও গোসল যথেষ্ট হবে না বরং উভয়টা করতে হবে।

মাসআলাঃ সন্দেহযুক্ত এঁটো পানাহার না করা চাই।

মাসআলাঃ সন্দেহযুক্ত ও ভাল পানি যদি মিশে যায় এবং ভাল পানি যদি অধিক হয়, তাহলে সেটা দ্বারা ওযু হতে পারে। অন্যথায় হবে না।

মাসআলাঃ যেটার এঁটো নাপাক, সেটার ঘাম ও লালাও নাপাক এবং যেটার এঁটো পাক, সেটার ঘাম ও লালাও পাক, এবং যেটার এঁটো মকরূহ, সেটার লালা ও ঘামও মকরূহ।

মাসআলাঃ গাধা ও খচ্চরের ঘাম যদি কাপড়ে লেগে যায় এবং যত বেশী লাগুক না কেন, পাক।

তায়াম্মুমের বর্ণনা

যার ওযু নেই বা গোসলের প্রয়োজন এবং পানি ব্যবহার করতেও অক্ষম, তখন ওযু ও গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা যায়। পানির প্রতি অক্ষম হওয়ার কয়েকটি ক্ষেত্র রয়েছে।

প্রথম ক্ষেত্রঃ এমন রোগাক্রান্ত যে ওযু বা গোসল করলে রোগবৃদ্ধি বা আরোগ্য বিলম্বিত হওয়ার যথার্থ সন্দেহ হয়। এ ব্যাপারে হয়তো সে নিজে পরীক্ষা করে দেখেছে যে ওযু-গোসল করলে রোগ বৃদ্ধি পায় বা কোন পরহিজগার মুসলমান ডাক্তার বলেছেন যে পানি লাগলে ক্ষতি হবে। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয।

মাসআলাঃ যদি কেবল ধারণাই করে থাকে যে রোগবৃদ্ধি পেতে পারে, তাহলে তায়াম্মুম জায়েয নেই। আর কাফির ফাসিক বা নগণ্য ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণযোগ্য নয়।

মাসআলাঃ রোগাক্রান্ত অবস্থায় যদি ঠাণ্ডা পানি ক্ষতি করে এবং গরম পানি কোন ক্ষতি করে না, তাহলে গরম পানি দ্বারা ওযু-গোসল করবে। তখন

তায়াম্মুম জায়েয নয়। হ্যাঁ যদি গরম পানি পাওয়া না যায়, তাহলে তায়াম্মুম করা যাবে। এ রকম যদি ঠাণ্ডার সময় ওযু বা গোসল ক্ষতি করে আর গরমের সময় ক্ষতি করে না, তাহলে ঠাণ্ডার সময় তায়াম্মুম করবে। এরপর যখন গরমের সময় আসে, তখন পরবর্তীর জন্য ওযু করে নেয়া চাই। যে নামায তায়াম্মুম করে পড়ে নেয়া হয়েছে, সেটা পুণরায় পড়ার প্রয়োজন নেই।

মাসআলাঃ যদি মাথায় পানি দেয়াটা ক্ষতিকর হয়, তাহলে গলা পর্যন্ত ধৌত করবে এবং সম্পূর্ণ মাথা মুসহে করবে।

মাসআলাঃ যদি কোন বিশেষ অংগে পানি ক্ষতি করে এবং অবশিষ্ট অংগে করে না, তাহলে যেটায় ক্ষতি করে, সেটা মুসেহ করবে এবং অন্যগুলো ধৌত করবে।

মাসআলাঃ ক্ষতস্থানের আশে পাশে যতদূর পর্যন্ত পানি ক্ষতি না করে ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি খুলে ধোয়া ফরয। তবে ব্যাণ্ডেজ খুললে ক্ষতি হলে, ব্যাণ্ডেজের উপরই মুসেহ করবে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রঃ যেখানে চারিদিকে মাইল ব্যাপী পানির কোন হদিস নেই, সেখানে তায়াম্মুম জায়েয।

মাস্আলাঃ যদি এটা দৃঢ় ধারণা হয় যে, এক মাইলের মধ্যে পানি পাওয়া যাবে, তাহলে খুঁজে বের করা প্রয়োজন। তালাশ না করে তায়াম্মুম জায়েয নয়। পানি অনুসন্ধান না করে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিল। পরে অনুসন্ধান করার পর পানি পাওয়া গেল, তখন ওযু করে নামায পুণরায় পড়া অপরিহার্য। আর যদি পানি পাওয়া না যায়,তাহলে হয়ে গেল।

মাসআলাঃ নামায পড়ার সময় কারো কাছে পানি দেখলো এবং দৃঢ় ধারণা হলো যে পানি চাইলে দিবে, তখন নামায ভেঙ্গে পানি চেয়ে নিবে।

তৃতীয় ক্ষেত্রঃ যদি এ রকম ঠাণ্ডা পড়ে যে গোসল করলে মারা যাওয়া বা অসুস্থ হওয়ার দৃঢ় সন্দেহ হয় এবং গোসল করার পর ঠাণ্ডার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবার মত কোন সামগ্রীও না থাকে, তাহলে তায়াম্মুম জায়েয।

চতুর্থ ক্ষেত্রঃ যদি শত্রুর ভয় থাকে যে, দেখলে মেরে ফেলবে বা জিনিষ পত্র কেড়ে নেবে বা অক্ষম গরীবের কর্জদাতার ভয় হয় যে দেখলে ধরে হাজতে দিবে, বা সাপে কাটবে বা বাঘে খেয়ে ফেলবে বা কোন দুষ্টলোক অপমানিত করবে, তখন তায়াম্মুম জায়েয।

পঞ্চম ক্ষেত্রঃ জংগলে কুপ থেকে পানি উঠানোর জন্য রশি–বালতি নেই, তখন তায়াম্মুম জায়েয।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ষষ্ঠ ক্ষেত্রঃ যদি তৃষ্ণার ভয় হয়। অর্থাৎ পানি আছে কিন্তু সেই পানি দিয়ে ওযু বা গোসল করে ফেললে নিজে বা অন্য মুসলমান বা নিজের বা অন্য মুসলমানের পালিত পশু, সেটা কুকুর হোক না কেন, যেটা পালন করা জায়েয, পিপাসাকাতর হয়ে যাবে, সামনে কিছু দুর গেলে পিপাসা অনুভব হবে এবং পথটা এমন যে অনেকদুর পর্যন্ত পানি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, তখন তায়াম্মুম জায়েয।

মাসআলাঃ পানি মওজুদ আছে কিন্তু আটা মাখার জন্য বা ভাত পাক করার জন্য প্রয়োজন, তখনও তায়াম্মুম জায়েয। তবে তরকারীর ঝোলের প্রয়োজনীয়তার জন্য পানি রেখে দিয়ে তায়াম্মুম জায়েয নেই।

মাসআলাঃ শরীর বা কাপড়ে এতটুকু নাপাকী রয়েছে, যতটুকু হওয়ার দ্বারা নামায জায়েয নয় এবং পানিও কেবল এতটুকু রয়েছে যে, হয়তো ওযু করা যাবে অথবা নাপাকী দূরীভূত করা যাবে, তাহলে পানি দ্বারা নাপাকী ধৌত করবে এবং ধোয়ার পর তায়াম্মুম করবে। পাক করার আগে তায়াম্মুম হবে না। যদি আগে করে নেয়, তাহলে যেন পুণরায় করে।

সপ্তম ক্ষেত্রঃ পানির মূল্য বেশী হলে অর্থাৎ স্বাভাবিক মূল্য থেকে দ্বিগুণ হলে তায়াম্মুম জায়েয এবং মূল্য যদি দ্বিগুণের কম হয়, তাহলে তায়াম্মুম জায়েয নেই।

মাসআলাঃ পানির মূল্য বেশী নয় কিন্তু ওর কাছে প্রয়োজনীয় খরচের অতিরিক্ত পয়সা নেই, তখনও তায়াম্মুম জায়েয।

অষ্টম ক্ষেত্রঃ পানির অনুসন্ধান করতে গেলে কাফেলা দৃষ্টির বাইরে চলে যাবে বা রেল ছেড়ে দিবে, তখন তায়াম্মুম জায়েয।

নবম ক্ষেত্রঃ এটা যদি দৃঢ় ধারণা হয় যে, ওযু বা গোসল করতে গেলে ঈদের নামায বাদ পড়বে, তখন তায়াম্মুম জায়েয। এ বাদ পড়াটা হয়তো ইমাম নামায পড়ে ফেলার কারণে হতে পারে বা সময় চলে যাওয়ার কারণেও হতে পারে, উভয় অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয।

মাসআলাঃ যদি এটা মনে করে যে ওযু করার দ্বারা যোহর বা মগরিব বা ইশা অথবা জুমার পববর্তী সুন্নাতসমূহ বা চাশতের নামাযের সময় চলে যাবে, তখন তায়াম্মুম করে পড়ে নিবে।

দশম ক্ষেত্রঃ যদি এমন ব্যক্তি যে মৃত ব্যক্তির ওলী (জানাযার নামায পড়ানোর হকদার) নয় এবং সন্দেহ হয় যে ওযু করতে গেলে জানাযার নামায পাবে না, তখন তায়াম্মুম জায়েয।

মাসআলাঃ মসজিদে শুইলো এবং গোসলের প্রয়োজন হলো, তাহলে চোখ খোলার সাথে সাথে যেখানে ছিল, ওখানেই সঙ্গে সঙ্গে তায়াম্মুম করে বের হয়ে আসবে, দেরী করা হারাম।

মাসআলাঃ কুরআন মজীদ স্পর্শ করার জন্য বা তিলাওয়াতে সিজদা বা সিজদায়ে শোকরের জন্য তায়াম্মুম জায়েয নেই, যদি পানির সামর্থ থাকে।

মাসআলাঃ সময় এত সংকীর্ণ হয়ে গেল যে ওযু বা গোসল করতে গেলে, নামায কাযা হয়ে যাবে। তখন ইচ্ছে করলে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিবে। কিন্তু ওযু বা গোসল করে পুণরায় পড়া আবশ্যক।

মাসআলাঃ মহিলা হায়েজ বা নেফাস থেকে পাক হলো এবং পানির সামর্থ না রাখলে, তায়াম্মুম করবে।

মাসআলাঃ এতটুকু পানি পাওয়া গেছে যদ্বারা ওযু করা যাবে কিন্তু গোসল আবশ্যক, তখন সেই পানি দ্বারা ওযু করে নেয়া চাই এবং গোসলের জন্য তায়াম্মুম করবে।

তায়াম্মুমের নিয়ম

তায়াম্মুমের নিয়তে বিসমিল্লাহ বলে মাটি জাতীয় পবিত্র জিনিষের উপর উভয় হাত মেরে উঠাবে। যদি অধিক ধুলি বালি লাগে, হাত ঝেড়ে নিয়ে সমস্ত মুখ মুসেহ করবে। পুণরায় দ্বিতীয় বার অনুরূপ হাত মারবে এবং নখ থেকে শুরু করে কনুই সহ উভয় হাত মুসেহ করবে। এতে তায়াম্মুম হয়ে যাবে। তায়াম্মুমে মাথা বা পায়ে মুসেহ করা হয় না। তায়াম্মুমে মাত্র তিনটি ফরয, বাকী সব সুন্নাত।

প্রথম ফরযঃ (১) নিয়ত করা অর্থাৎ গোসল বা ওযু বা উভয়টা তায়াম্মুম করে পবিত্রতা অর্জন করার নিয়ত করা। যদি হাত মারার পর তায়াম্মুমের নিয়ত করে, তাহলে তায়াম্মুম হবে না। মনে মনে তায়াম্মুমের নিয়ত করা ফরয এবং সাথে সাথে মুখে বলাটাও উত্তম। যেমন এ রকম বলা যে বে-গোসল ও বে-ওযুর নাপাকী দূর হওয়া এবং নামায জায়েয হওয়ার জন্য তায়াম্মুম করছি। অতঃপর বিসমিল্লাহ বলে মাটিতে হাত মারবে।

দ্বিতীয় ফরযঃ সমস্ত মুখ মণ্ডলে হাত বুলানো যেন চুল পরিমাণ জায়গাও অবশিষ্ট না থাকে। অন্যথায় তায়াম্মুম হবে না।

তৃতীয় ফরযঃ উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত কনুই সহ মুসেহ করা। যদি কণা পরিমাণ জায়গাও বাদ পড়ে, তাহলে তায়াম্মুম হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ তায়াম্মুমের সময় দাড়ি, গোঁফ এবং ভ্রুর উপর হাত বুলানো আবশ্যক।

মাসআলাঃ তায়াম্মুমের ব্যাপারে মুখমণ্ডলের সেই সীমা, যা ওযুর জন্য নির্ধারিত। তবে মুখের অভ্যন্তরে তায়াম্মুম করা যায় না। অবশ্য মুখ বন্ধ করার পর ঠোঁটের যে অংশটুকু খোলা থাকে, সেটার উপর মুসেহ করা আবশ্যক।

মাসআলাঃ হাত ঝাড়ার সময় যেন তালি না পড়ে বরং এর নিয়ম হচ্ছে, আঙ্গুলে আঙ্গুলে মারবে, তখন অতিরিক্ত ধূলিবালি ঝরে যাবে।

মাসআলাঃ যদি আঙ্গুলসমূহে ধূলি না পৌঁছে তাহলে খিলাল করা ফরয, অন্যথায় সুন্নাত। অনুরূপ দাড়ির ব্যাপারেও।

মাসআলাঃ যদি একই তায়াম্মুমে ওযু গোসল উভয়টার নিয়ত করে, তখন উভয়টা হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ গোসল ও ওযু উভয়ের তায়াম্মুম একই রকম।

কোন্ জিনিষ দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয এবং কোন্ জিনিষ দ্বারা জায়েয নয়

তায়াম্মুম ওরকম জিনিস দ্বারা হতে পারে, যা মাটি জাতীয়। আর যে জিনিষ মাটি জাতীয় নয়, সেটা দ্বারা তায়াম্মুম হতে পারে না।

মাসআলাঃ যে জিনিষটা আগুনে পুড়ে ছাই হয় না বা গলে যায় না অথবা নরম হয়না, সেটাই হচ্ছে মাটি জাতীয় জিনিষ। এ সবের দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয। সুতরাং মাটি, ধূলা, বালি, চুনা, সুরমা, হরিতাল, গন্ধক, মৃত পাথর, পোকরাজ, আকীক, ফিরোজা, যমরদ ইত্যাদি পাথর দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয, যদিওবা ওগুলোর উপর ধূলি না থাকে।

মাসআলাঃ যে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা হয়, সেটা পবিত্র হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ ওটার উপর কোন নাপাকী বস্তুর লক্ষণ না থাকা চাই বা কেবল শুকিয়ে যাওয়ার কারণে নাপাকী বস্তুর লক্ষণ চলে গেছে এরকমও না হওয়া চাই।

মাসআলাঃ যে জিনিষের উপর নাপাকী পড়েছে এবং শুকিয়ে গেছে, সেটার দ্বারাও তায়াম্মুম হবে না। যদি নাপাকীর লক্ষণ বাকী না থাকে, ওটার উপর নামায পড়া যেতে পারে।

মাসআলাঃ এটা যদি ধারণা হয় যে কোন সময় সেখানে নাপাকী বস্তু ছিল, সেটা অর্থহীন। এর কোন গুরুত্ব নেই।

মাসআলাঃ ছাই দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয নেই।

মাসআলাঃ যদি মাটির সাথে ছাই মিশে যায় এবং মাটির পরিমাণ বেশী হয়, তাহলে জায়েয, অন্যথায় জায়েয নেই।

মাসআলাঃ ভিজা মাটি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয, যদি মাটির পরিমাণ বেশী হয়।

মাসআলাঃ যদি কোন লাকড়ী বা কাপড় ইত্যাদিতে এতটুকু ধূলিবালি জমেছে যে হাত মারলে আঙ্গুলের ছাপ বসে যায়, তাহলে ওটার উপর তায়াম্মুম জায়েয।

মাসআলাঃ চুনের প্রলেপ দেয়া দেয়ালে তায়াম্মুম জায়েয (বাহারে শরীয়ত ও অন্যান্য গ্রন্থ)

মাসআলাঃ পাকা ইটের দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয (বাহারে শরীয়ত ও অন্যান্য গ্রন্থ)

মাসআলাঃ মাটি বা পাথর জ্বলে কালো হয়ে গেলেও সেটার দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয। এমনকি পুড়ে চাই হয়ে গেলেও জায়েয।

তায়াম্মুম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

যে সব বিষয়সমূহ দ্বার ওযু ভেঙ্গে যায় বা গোসল ওয়াজিব হয়, ওসব দ্বারা তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়ে যায়। তা ছাড়া পানির উপর সামর্থবান হওয়ার সাথে সাথেও তায়াম্মুম ভেঙ্গে যায়।

মাসআলাঃ এমন কোন জায়গায় পৌঁছলো, যার এক মাইলের ভিতর পানি রয়েছে, তাহলে তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে, পানি পর্যন্ত পৌঁছার প্রয়োজন নেই। অবশ্য ঘুমন্তাবস্থায় পানির এলাকা অতিক্রম করার দ্বারা তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে না।

মাসআলাঃ রোগী গোসলের তায়াম্মুম করেছিল। কিন্তু এখন সুস্থ হয়ে গেছে এবং গোসল করলে কোন ক্ষতি হবে না, তাহলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ এতটুকু পানি পাওয়া গেল, যদ্বারা ওযুর অঙ্গসমূহ কেবল একবার করে ধৌত করতে পারবে, তখন তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপ গোসলের তায়াম্মুমকারীর এতটুকু পানি মিললো যে গোসলের ফরযসমূহ আদায় করার জন্য যথেষ্ট নয়, তাহলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হলো না, অন্যথায় ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ কেউ গোসল ও ওযু উভয়ের জন্য একটিই তায়াম্মুম করে ছিল। অতঃপর ওযু ভঙ্গকারী কোন বিষয় পাওয়া গেল বা এতটুকু পানি পেল যদ্বারা কেবল ওযু করা যেতে পারে বা অসুস্থ ছিল এবং এখন সুস্থ হয়ে গেছে, তবে গোসল ক্ষতি করবে কিন্তু ওযুর দ্বারা কোন ক্ষতি হবে না, তখন কেবল ওযুর ব্যাপারে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং গোসলের ব্যাপারে বলবৎ থাকবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মোজার উপর মুসেহের বর্ণনা

যে ব্যক্তি মোজা পরিহিত আছে,তারজন্য ওযুর সময় পা ধোয়ার পরিবর্তে মোজায় মুসেহ করাটা জায়েয আছে।

মাসআলাঃ যার উপর গোসল ফরয, তার জন্য মোজার উপর মুসেহ জায়েয নেই।

মাসআলাঃ মোজার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। (১) মোজা এমন হওয়া চাই, যেন পায়ের গিরা ঢেকে যায়। এর থেকে লম্বা হওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং দু'এক আঙ্গুল কম হলেও মুসেহ করা শুদ্ধ হবে। তবে গোড়ালী যেন খোলা না থাকে। (২) মোজা যেন পায়ের সাথে লেপটে থাকে। যাতে সেটা পরে সহজভাবে ভালমতে চলাফেরা করতে পারে। (৩) মোজা চামড়ার হতে হবে বা কেবল তলাটা চামড়ার হবে এবং বাকী অংশটা অন্য কোন শক্ত জিনিষের হবে।

মাসআলাঃ ভারতবর্ষে সাধারণতঃ সূতা বা উলের যে মোজা পরা হয়, সেটার উপর মুসেহ জায়েয নেই। ওটা খুলে পা ধোয়া ফরয (৪) ওযু সহকারে মোজা পরিহিত হতে হবে অর্থাৎ যদি ওযু বিহীন অবস্থায় মোজা পরা হয়, তাহলে মুসেহ করা যাবে না।

মাসআলাঃ তায়াম্মুম করে মোজা পরা হলে মুসেহ নাজায়েয। (৫) অপবিত্র অবস্থায় যেন মোজা পরিহিত না হয় বা মোজা পরার পর অপবিত্র না হওয়া চাই। (৬) সময়সীমার ভিতরে হওয়া চাই। অর্থাৎ মুকীমের জন্য হচ্ছে একদিন একরাত এবং মুসাফিরের জন্য হচ্ছে তিনদিন তিনরাত।

মাসআলাঃ মোজা পরার পর প্রথমবার ওযু ভঙ্গের পর সময় গণনা হবে। যেমন ফজরে ওযু করে মোজা পরলো, যোহরের সময় প্রথমবার ওযু ভঙ্গ হলো, তাহলে মুকীম দ্বিতীয় দিন যোহর পর্যন্ত মুসেহ করতে পারবে এবং মুসাফির চতুর্থ দিনের যোহর পর্যন্ত মুসেহ করতে পারবে।

(৭) কোন মোজা পায়ের কণিষ্ঠাঙ্গুলের তিনটির বরাবর ছেঁড়া না হওয়া চাই। অর্থাৎ চলার সময় যেন তিন আঙুল বের হয়ে না যায়।

মাসআলাঃ মোজা ছিঁড়ে গেল বা সেলাই খুলে গেল এবং এমতাবস্থায় পরে থাকলে পায়ের তিন আঙুল দেখা যায় না কিন্তু চলার সময় তিন আঙুল দেখা যায়, তাহলে মুসেহ নাজায়েয। তবে ছেঁড়া মোজায় তিন আঙ্গুলের কম পা দেখা গেলে মুসেহ জায়েয। তিন আঙ্গুল বা এর থেকে বেশী অংশ খুলে গেলে মুসেহ নাজায়েয।

মাসআলাঃ গিরার উপরে মোজা ছেঁড়া হলে কোন ক্ষতি নেই। মুসেহ করা

যাবে। গিরার নীচের অংশে ছেঁড়াটাই বিবেচ্য।

মুসেহ করার নিয়মঃ

মুসেহের নিয়ম হচ্ছে হাত ভিজায়ে ডান হাতের তিন আঙ্গুলি ডান পায়ের মোজার পিঠের অগ্রভাগে রেখে পায়ের গোছার দিকে টেনে আনবে। কমপক্ষে তিন আঙ্গুল টানবে। তবে পায়ের গোছা পর্যন্ত টানা সুন্নাত। বাম হাতের দ্বারা বাম পায়েও অনুরূপ করবে।

মাসআলাঃ মুসেহের ব্যাপারে ফরয দুটি (১) প্রতি মোজার মুসেহ হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলের তিনটার বরাবর হওয়া এবং (২) মোজার পিঠের উপরই মুসেহ করা।

মাসআলাঃ মুসেহের ব্যাপারে সুন্নাত হচ্ছে তিনটি (১) হাতের পূর্ণ তিন আঙ্গুলীর পেট দ্বারা মুসেহ করা (২) আঙ্গুলসমূহ টেনে পায়ের গোছা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া (৩) মুসেহ করার সময় আঙ্গুলসমূহ খুলে রাখা।

মাসআলাঃ ইংলিশ বুটজুতার উপর মুসেহ জায়েয, যদি এর দ্বারা পায়ের গিরা ঢেকে থাকে।(বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ পাগড়ী, বোরকা, পর্দা এবং হাত মোজার উপর মুসেহ জায়েয নেই।

যে সব কারণে মুসেহ বিনষ্ট হয়ে যায়ঃ

(১) যে সব কারণে ওযু ভঙ্গ হয়ে যায়, ওসব কারণে মুসেহও ভঙ্গ হয়ে যায়; (২) মুসেহের সময়সীমা পূর্ণ হয়ে গেলে মুসেহ ভঙ্গ হয়ে যায়। এ অবস্থায় কেবল পা ধুয়ে নিলে চলে, পুণরায় ওযু করার প্রয়োজন নেই। তবে পুরা ওযু করে নেয়াটাই উত্তম। (৩) মোজা খুললেই মুসেহ ভঙ্গ হয়ে যায়। একটি খুললেও ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ ওযুর অংগসমূহে যদি ক্ষত বা ফোঁড়া হয় বা অন্য কোন রোগ হয় এবং পানি দিলে ক্ষতি করে বা খুবই কষ্ট হয়, তাহলে ভিজা হাত বুলায়ে নিলেই যথেষ্ট এবং যদি এটাও ক্ষতি করে,তাহলে ওটার উপর কাপড় রেখে মুসেহ করবে এবং যদি এতেও কষ্ট হয়,তাহলে মাফ। যদি ওটার উপর কোন ওষুধ লাগানো হয়,তা পরিষ্কার করে ফেলার কোন প্রয়োজন নেই। ওটার উপরেই পানি দিলে চলে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হায়েযের বর্ণনা

মাসআলাঃ প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলার সামনের রাস্তা দিয়ে নিয়ম মাফিক যে রক্ত বের হয় এবং যেটা কোন রোগ বা শিশুর জন্ম হওয়ার কারণে নয়, সেটাকে হায়েয বলা হয়। রোগের কারণে যে রক্ত বের হয়, সেটাকে ইস্তেহাযা এবং প্রসবের পর যে রক্ত বের হয়, সেটাকে নেফাস বলে।

মাসআলাঃ হায়েযের সময়সীমা কমপক্ষে তিন দিন তিন রাত অর্থাৎ পূর্ণ বাহাত্তর ঘন্টার যদি এক মিনিটও কম হয়, সেটা হায়েয (ঋতুস্রাব) নয় এবং বেশী হলে দশ দিন দশ রাত।

মাসআলাঃ বাহাত্তর ঘন্টার একটু আগেও বন্ধ হয়ে গেলে সেটা হায়েয নয় বরং ইস্তেহাযা। তবে যদি সকালে সূর্য উদিত হওয়ার সাথে সাথে শুরু হয় এবং তিন দিন তিন রাত পর পূর্ণ হওয়ার পর সূর্য উদিত হওয়া মাত্রই বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে হায়েয হিসেবে গণ্য হবে এবং এ অবস্থায় বাহাত্তর ঘন্টা পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন নেই। অবশ্য অন্য কোন সময় শুরু হলে ঘন্টা হিসেবে গণ্য করা হবে এবং চব্বিশ ঘন্টায় একদিন একরাত ধরা হবে। (বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ দশ দিন দশ রাত থেকে কিছু বেশী সময় রক্ত বের হলো এবং এ হায়েয বা ঋতুস্রাবটা যদি প্রথম বার হয়ে থাকে, তাহলে দশ দিন পর্যন্ত হায়েয ধরা হবে এবং পরেরটা ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি এর আগেও হায়েয হয়ে থাকে এবং নিয়ম দশদিন থেকে কম ছিল, তাহলে নিয়ম থেকে যতদিন অতিরিক্ত হলো, সেটা ইস্তেহাযা হিসেবে বিবেচ্য। একে এভাবে বুঝে নিন, যেমন আগে পাঁচ দিনের নিয়ম ছিল এবার দশদিন হল, তাহলে সম্পূর্ণ কালটাই হায়েয হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু যদি বার দিন হয়, তাহলে পাঁচদিন হায়েয এবং বাদ বাকী সাত দিন ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি একই অবস্থা বলবৎ না থাকে বরং কোন সময় চার দিন কোন সময় পাঁচ দিন হয়, তাহলে এর আগের বার যতদিন হায়েয হয়েছিল, ততদিনের হায়েয মনে করে বাদবাকী দিনগুলোকে ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য করতে হবে।

মাস্আলাঃ এটা প্রয়োজন নয় যে হায়েযের অবস্থায় অনবরত রক্ত বের হতে হবে। বরং মাঝে মধ্যে বের হলেও হায়েয হিসেবে গণ্য হবে।

মাস্আলাঃ কমপক্ষে নয় বছর বয়সে হায়েয শুরু হয় এবং পঞ্চান্ন বছর বয়স হচ্ছে হায়েয হওয়ার শেষ সময়। এ বয়সের মহিলাকে বলা হয় আয়েসা (গর্ভধারণে সক্ষম) এবং এ বয়সকালকে বলা হয় সন্নে ইয়াস। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ নয় বছর বয়সের আগে এবং পঞ্চান্ন বছর বয়সের পর যে রক্ত বের হয়, সেটা ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য। অবশ্য পঞ্চান্ন বছর বয়সের পর যদি হায়েযের মত রক্ত বের হয় এবং রংটা যদি আগের মতই হয়ে থাকে, তাহলে সেটা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ গর্ভবতী মহিলার যে রক্ত বের হয়, সেটা ইস্তেহাযা। অনুরূপ শিশু জন্মাবার সময় যদি রক্ত বের হলো এবং শিশু এখনও অর্ধেক থেকে বেশী বের হয়নি, তাহলে সেটাও ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য।

মাসআলাঃ দু হায়েযের মাঝখানে কমপক্ষে পনের দিনের বিরতি প্রয়োজন। অনুরূপ নেফাস ও হায়েযের মাঝখানেও পনের দিনের ব্যবধান প্রয়োজন। যদি নেফাস বন্ধ হওয়ার পর পনের দিন পূর্ণ হবার আগে রক্ত বের হয়, সেটা ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য।

মাসআলাঃ হায়েয ওই সময় থেকে গণ্য করা হবে, যখন রক্ত অঙ্গ থেকে বের হয়ে আসে। যদি কোন কাপড় লাগিয়ে রাখলো যার কারণে রক্ত অঙ্গ থেকে বের হতে পারলো না ভিতরেই আটকে রইল, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত কাপড় বের করা হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত হায়েযওয়ালী হিসেবে গণ্য হবে না বরং নামায পড়বে, রোযা রাখবে।

মাসআলাঃ হায়েযের ছয়টি রং যথা কালো, লাল, সবুজ, খয়েরী, কাদা ও মেটে রং। সাদা রং এর যে লালা বের হয়, সেটা হায়েয নয়।

মাসআলাঃ লালা বের হওয়া কালীন দশ দিনের মধ্যে যদি সামান্য মলিনতা দেখা যায়, তাহলে সেটা হায়েয হিসেবে গণ্য এবং যদি দশদিন পরও লালার মলিনতা বাকী থাকে, তাহলে নিয়মিত হায়েয ওয়ালীর জন্য নিয়মিত হায়েযের দিনগুলো হায়েয এবং নিয়মের অতিরিক্ত দিনগুলোকে ইস্তেহাযা মনে করতে হবে আর যদি হায়েয অনিয়মিত হয় (অর্থাৎ কোন সময় তিনদিন, কোন সময় চার দিন, কোন সময় পাঁচ দিন হয়) তাহলে দশদিন পর্যন্ত হায়েয ধরে নিতে হবে এবং বাদবাকী দিন গুলো ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য হবে।

মাসআলাঃ যে মহিলার সারাজীবন রক্ত বের হয়নি বা বের হয়েছে কিন্তু তিনদিন থেকে কম, তাহলে সে সারাজীবন পবিত্রই রইল এবং যদি মাত্র একবার তিন দিন তিন রাত রক্ত বের হলো, এরপর আর কখনো বের হয়নি, তাহলে সে মাত্র তিনদিন তিন রাতের জন্য হায়েযওয়ালী হিসেবে গণ্য হবে, বাকী সব সময়ের জন্য পবিত্র।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নেফাসের বর্ণনা

নেফাস অর্থাৎ শিশু জন্মানোর পর যে রক্ত বের হয় এবং নিম্নতম মেয়াদ নির্ধারিত নয়। শিশু অর্ধাংশ থেকে বেশী বের হওয়ার পর সামান্য রক্তও যদি আসে, সেটা নেফাস হিসেবে গণ্য এবং নেফাসের উর্ধতম মেয়াদ হচ্ছে চল্লিশ দিন।

মাসআলাঃ নেফাসের গণনা ওই সময় থেকে শুরু হবে যখন নবজাত শিশু অর্ধাংশ থেকে বেশী বের হয়ে আসে।

বিদ্রঃ এ বর্ণনায় 'শিশু জন্ম' শব্দ যেখানে ব্যবহৃত হবে এর ভাবার্থ অর্ধেকাংশ থেকে অধিক বের হওয়াটা বুঝতে হবে।

মাসআলাঃ কারো চল্লিশ দিন থেকে অধিক রক্ত বের হলো এবং যদি এর আগেও প্রসব করেছিল বা এটা মনে নেই যে প্রথম প্রসবের সময় কতদিন রক্ত বের হয়েছিল, তাহলে উভয় অবস্থায় চল্লিশ দিন নেফাস হিসেবে ধরে নিতে হবে এবং বাদবাকী দিনগুলো ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য হবে। আর যার প্রথম প্রসবের পর নেফাসের মেয়াদ জানা আছে, তাহলে সেই মেয়াদ পরিমাণ দিনকে নেফাস ধরা হবে এবং এর অতিরিক্ত দিনগুলো ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য হবে। যেমন আগের বারের মেয়াদ ছিল ত্রিশ দিন কিন্তু এবার রক্ত বের হলো পয়তাল্লিশ দিন, তাহলে ত্রিশ দিন নেফাস এবং বাকী পনের দিন ইস্তেহাযা বিবেচিত হবে।

মাসআলাঃ শিশু প্রসবের আগে যে রক্ত আসে, সেটা নেফাস নয় বরং ইস্তেহাযা, যদিওবা শিশু অর্ধেক বের হয়ে আসে।

মাসআলাঃ গর্ভপাত হওয়ার আগে পরে কিছু রক্ত বের হলো তাহলে আগের রক্তকে ইস্তেহাযা এবং পরের রক্তকে নেফাস ধরা হবে। তবে এটা ওই অবস্থায় যখন কোন অংগ গঠিত হয়,অন্যথায় আগেরটা হায়েয হতে পারে। তা নাহলে ইস্তেহাযা।

মাসআলাঃ চল্লিশ দিনের মধ্যে কোন সময় রক্ত বের হলো, কোন সময় বের হলো না, তবুও সবই নিফাস হিসেবে ধরা হবে, যদিওবা পনের দিনের ব্যবধান হয়েযায়।

মাসআলাঃ নেফাসের রক্তের রং এর ব্যাপারে সেই একই হুকুম, যেটা হায়েযের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে।

হায়েয ও নিফাসের আহকাম

মাসআলাঃ হায়েয ও নিফাসের অবস্থায় নামায পড়া, রোযা রাখা হারাম।

মাস্আলাঃ ওই দু'অবস্থায় নামায মাফ। কোন কাযারও প্রয়োজন নেই। অবশ্য রোযার কাযা অন্য সময় আদায় করা ফরয।

মাস্আলাঃ নামাযের সময় ওযু করে যেন এতটুকু সময় পর্যন্ত আল্লাহর যিকির, দরূদ শরীফ ও অন্যান্য ওযীফায় নিয়োজিত থাকে, যতটুকু সময় নামাযে ব্যয় করতো,যাতে অভ্যাসটা বজায় থাকে।

মাসআলাঃ হায়েয ও নিফাসওয়ালীর কুরআন মজীদ পড়া, তা দেখেই হোক বা মুখস্থ এবং ওটা স্পর্শ করা যদিওবা জিলদ মলাট বা টীকায় আঙ্গুলের নখও লাগে বা শরীরের কোন অংগ লাগে, সবই হারাম। (হিন্দিয়া ইত্যাদি)

মাসআলাঃ কাগজের টুকরায় কোন আয়াত লিখা আছে, সেটা স্পর্শ করাও হারাম।

মাসআলাঃ কুরআন শরীফ যদি জুলদানে থাকে, তাহলে সেই জুলদান স্পর্শ করলে কোন ক্ষতি নেই। (হিন্দিয়া)

মাসআলাঃ এ অবস্থায় কুরআন মজীদ ও ধর্মীয় কিতাবসমূহ স্পর্শ করার হুকুম ওটাই,যেটা বেগোছল লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার বর্ণনা গোছলের অধ্যায়ে করা হয়েছে।

মাসআলাঃ শিক্ষিকার হায়েয বা নিফাস হলো, তখন এক এক শব্দ নিশ্বাস ফেলে ফেলে পড়াবে এবং বানান বললে কোন ক্ষতি নেই।

মাসআলাঃ সে সময় দুআ কুনুত পড়া মকরূহ।

মাসআলাঃ সে সময় কুরআন মজীদ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত যিকির, কলেমা শরীফ, দরূদ শরীফ ইত্যাদি পড়া মকরূহহীনভাবে জায়েয বরং মুস্তাহাব। ওযু বা কুলি করে পড়া উত্তম এবং এমনি পড়লেও কোন ক্ষতি নেই এবং ওগুলোকে স্পর্শ করলেও কোন দোষ নেই।

মাসআলাঃ ওই সময় সহবাস হারাম, অবশ্য একসাথে বসা, শোয়া, পানাহার করা ও চুমু দেয়ার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই।

ইস্তেহাযার বর্ণনাঃ

হায়েয ও নিফাস ব্যতীত মহিলার সামনের রাস্তা দিয়ে যে রক্ত বের হয়, সেটাকে ইস্তেহাযা বলা হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ ইস্তেহাযার সময় নামায রোযা কোনটাই মাফ নয় এবং এ রকম মহিলার সাথে সহবাসও হারাম নয়।।

মাসআলাঃ ইস্তেহাযা যদি এ রকম পর্যায়ে পৌঁছে যে এতটুকু অবকাশ পাওয়া যায় না যে ওযু করে ফরয নামায আদায় করতে পারে, তাহলে নামাযের পূর্ণ একটি ওয়াক্ত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এরকম অবস্থায় অতিবাহিত হলে, তাকে মাযুর বা অপারগ বলা হবে। সে সময় এক ওযুতে যত নামায ইচ্ছে পড়তে পারবে। রক্ত আসার দ্বারা এ পূর্ণ এক ওয়াক্তের মধ্যে ওযু ভঙ্গ হবে না।

মাসআলাঃ যদি কাপড় ইত্যাদি দিয়ে ওযু করে নামায পড়ে নেয়া পর্যন্ত রক্ত প্রতিরোধ করা যায়, তাহলে মাযুর বা অপারগ বলা যাবে না।

মাযুর বা অপারগের বর্ণনাঃ

প্রত্যেক এমন ব্যক্তি, যার এমন রোগ থাকে যে নামাযের পূর্ণ একটি ওয়াক্ত এভাবে অতিবাহিত হলো যে ওযু করে ফরয নামায আদায় করতে পারলো না, সে মাযুর। অর্থাৎ পূর্ণ ওয়াক্তে এতটুকু সময়ও রোগমুক্ত রইলো না যে ওযু সহকারে ফরয নামায আদায় করে। মাযুরের বেলায় হুকুম হচ্ছে ওয়াক্তের মধ্যে ওযু করে নিবে এবং শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত যত নামায ইচ্ছে সেই ওযুতে পড়ে নিবে। সেই রোগের দ্বারা ওযু ভঙ্গ হবে না। যেমন ফোঁটা ফোঁটা পায়খানা করা, বাতাস বের হওয়া বা আঘাত প্রাপ্ত চোখ থেকে পানি পড়া, ফোঁড়া বা ক্ষত থেকে অনবরত লালা বের হওয়া বা কান, নাভী বা স্তন থেকে পানি বের হওয়া-এ সব রোগ অযু ভঙ্গকারী। এসব রোগে যদি পূর্ণ ওয়াক্তটা এমনভাবে অতিবাহিত হয় যে কয়েকবার চেষ্টা করেও পবিত্রতা সহকারে নামায পড়া গেল না, তাহলে অজুহাত প্রমাণিত হয়ে গেল। তখন যতদিন পর্যন্ত প্রতি নামাযের ওয়াক্তে একবারও যদি সেই অজুহাতটা পাওয়া যায়, তাহলে মাযুর হিসাবে গণ্য হবে। যেমন কোন মহিলার নামাযের একটি ওয়াক্ত এমনভাবে অতিবাহিত হলো যে ইস্তেহাযার কারণে তার এতটুকু সময়ের অবকাশ মিলল না যে পবিত্রতা অর্জন করে ফরয নামায পড়ে নেয় এবং পরবর্তী ওয়াক্তে ওযু করে নামায পড়ে নেয়ার মত অবকাশ পেল। কিন্তু এ পরবর্তী নামাযের সময়ও এক আধবার রক্ত দেখা গেল, তাহলে তখন সে মাযুর হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ অজুহাত প্রমাণিত হওয়ার পর এটা জরুরী নয় যে পরবর্তী সব সময়ে অতিরিক্ত হারে বার বার ওযুভঙ্গকারী বিষয় পাওয়া যেতে হবে। অজুহাত প্রমাণিত হওয়ার জন্য অধিক ও বার বার প্রয়োজন। কিন্তু এ অধিকতার কারণে একটি ফরয ওযু সহকারে আদায় করতে না পারলেই অজুহাত প্রমাণিত হয়ে গেল। পরবর্তী নামাযের সময়ে অতটুকু অধিকতার প্রয়োজন নেই, বরং একবার হলেও যথেষ্ট।

মাসআলাঃ ফরয নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মাযুরের ওযু ভঙ্গ হয়ে যায়। যেমন কোন মাযুর আসরের সময় ওযু করে ছিল সূর্য ডুবার সাথে সাথে ওর ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ সূর্য উঠার পর ওযু করলো, তাহলে যোহরের ওয়াক্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওর ওযু ভঙ্গ হবে না কেননা তখন পর্যন্ত কোন ফরয নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়নি।

মাসআলাঃ ওই বিষয় দ্বারা মাযুরের ওযু ভঙ্গ হয় না, যে বিষয়ের কারণে মাযুর সাব্যস্ত হয়েছে। তবে অন্য কোন ওযু ভঙ্গকারী বিষয় পাওয়া গেলে ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন যার অনবরত ফোঁটা ফোঁটা পায়খানা হওয়ার রোগ আছে, ওর বায়ু বের হলে ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং যার বায়ু বের হওয়ার রোগ আছে, ওর ফোঁটা ফোঁটা পায়খানা বের হলে ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ যদি কোন অঙ্গভঙ্গির কারণে ওযর চলে যায় বা লাঘব হয়,তাহলে সেই অঙ্গভঙ্গি করা ফরয। যেমন দাঁড়িয়ে নামায পড়লে রক্ত প্রবাহিত হয় কিন্তু বসে পড়লে হয় না, তাহলে বসে পড়া ফরয।

মাসআলাঃ মাযুরের এ রকম ওযর রয়েছে যে এর ফলে কাপড় নাপাক হয়ে যায়, তাহলে যদি এক দিরহামের অধিক কাপড় নাপাক হয়ে যায় এবং যদি এতটুকু সুযোগ থাকে যে সেই কাপড় ধৌত করে পবিত্র কাপড় দ্বারা নামায পড়া যায়, তাহলে ধৌত করে নামায পড়া ফরয। আর যদি মনে করে যে নামায পড়া কালে পুণরায় অতটুকু নাপাক হয়ে যাবে, তাহলে ধৌত করার প্রয়োজন নেই। সেই কাপড়েই নামায পড়ে নিবে, যদি ওবা এর দ্বারা জায়নামাযও বিনষ্ট হয়ে যায়,কোন ক্ষতি নেই। আর যদি এক দিরহাম বরাবর হয় এবং ধৌত করে পড়ার সুযোগ থাকে এবং নামায পড়াকালীন পুণরায় সেই পরিমাণ নাপাক হয়ে যায়, তাহলে ধৌত করা ওয়াজিব। এবং যদি এক দিরহাম থেকে কম হয় এবং ধৌত করার সুযোগ থাকে, তাহলে ধোয়াটা সুন্নাত। আর যদি সুযোগ না থাকে, তাহলে প্রত্যেক অবস্থায় মাফ।

মাসআলাঃ যদি কোন ক্ষতস্থান থেকে এরকম লালা বের হয়, যা গড়িয়ে পড়ে না, তাহলে এর দ্বারা ওযু ভঙ্গ হবে না, মাযুর হিসেবেও গণ্য হবে না এবং সেই লালাও নাপাক নয়।

নাপাক জিনিষ পাক করার নিয়ম

নাপাক দু'প্রকার। প্রথম প্রকার হলো এমন জিনিষসমূহ, যেগুলো স্বয়ং নাপাক; যাকে নাজাসত বলা হয়। যেমনঃ মদ, মল, গোবর ইত্যাদি। এগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় আসলরূপ থেকে পরিবর্তন হয়ে অন্য কিছু হয়ে না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র হবে না। মদ যতক্ষণ পর্যন্ত মদ হিসেবে থাকবে, ততক্ষণ নাপাকই

pdf By Syed Mostafa Sakib

থাকবে। তবে যদি সিরকা হয়ে যায়, তাহলে পাক। অনুরূপ ঘুটা যতক্ষন পর্যন্ত ছাই হয়ে যাবে না, নাপাক থাকবে। ছাই হয়ে গেলে পাক। (মুনিয়া ও অন্যান্য গ্রন্থ) দ্বিতীয় প্রকারঃ এমন জিনিষসমূহ, যেগুলো স্বয়ং নাপাক নয় তবে নাজাসত লাগার দরুন নাপাক হয়ে যায়। যেমনঃ কাপড়ে মদ লাগলে কাপড় নাপাক হয়ে যায়। এ ধরণের জিনিষসমূহ পাক করার কয়েকটি নিয়ম আছে। কতেক জিনিষ ধোয়ার দ্বারা, কতেক শুকানোর দ্বারা, কতেক ঘষা মোছার দ্বারা, কতেক জ্বালানোর দ্বারা এবং কতেক চামড়া উঠায়ে ফেলা বা জবেহের দ্বারা পাক হয়।

মাসআলাঃ বিশুদ্ধ পানি এবং অন্যান্য বিশুদ্ধ তরল বহমান বস্তুসমূহ যেগুলো দ্বারা নাপাকী দুরীভূত করা যায়, যেমনঃ গোলাপজল, চা, কলাগাছের পানি ইত্যাদি দ্বারা নাপাক জিনিষসমূহ পাক করা যায়।

মাসআলাঃ ব্যবহৃত পানি অর্থাৎ ওযু গোসলে ব্যবহৃত পবিত্র পানি দ্বারাও ধৌত করে পাক করা যায়।

মাসআলাঃ থুথুর দ্বারা যদি নাজাসত দুরীভূত হয়, তাহলে ওটার দ্বারাও জিনিষ পাক হয়ে যায়। যেমন, শিশু দুধপান করে স্তনে বমি করলো, পুণরায় কয়েকবার দুধ পান করার দ্বারা বমির কোন নাম নিশানা রইলো না, তাহলে স্তন পাক হয়ে গেল। (কাজী খাঁ ইত্যাদি)

মাসআলাঃ সুরুয়া, দুধ ও তৈল দ্বারা ধৌত করলে পাক হবে না। কারণ এগুলোর দ্বারা নাজাসত বিদুরীত হয় না।

মাসআলাঃ নাজাসত যদি লক্ষণ যুক্ত হয়, যেমনঃ পায়খানা, গোবর, রক্ত ইত্যাদি, তাহলে ধোয়ার ব্যাপারে কোন সংখ্যার শর্ত নেই। বরং ওগুলোকে দূর করাটাই প্রয়োজন। যদি একবারে ধোয়ার দ্বারা পরিস্কার হয়ে যায়, তাহলে একবার ধুইলে পাক হয়ে যাবে এবং যদি চার পাঁচ বার ধোয়ার দ্বারা দূরীভূত হয়, তাহলে চার পাঁচবার ধুইতে হবে। অবশ্য যদি তিনবারের কমে নাজাসত দুরীভূত হয়, তাহলে তিনবার ধোয়া মুস্তাহাব।

মাসআলাঃ যদি নাজাসত দুর হয়ে যায় কিন্তু এর চিহ্ন বা রং বা গন্ধ অবশিষ্ট থাকে, তাহলে ওটাকেও বিদুরীত করা প্রয়োজন। তবে এর চিহ্ন দুর করাটা যদি খুবই মুশকিল হয়, তাহলে দুরীভূত করার প্রয়োজন নেই। তিনবার ধুইলে পাক হয়ে যাবে। সাবান, টকবস্তু বা গরম পানি দ্বারা ধোয়ার প্রয়োজন নেই। (আলমগীরী, মুনিয়া ইত্যাদি)

মাসআলাঃ কাপড় বা হাতে নাপাক রং লাগলো বা নাপাক মেহেদি লাগলো তাহলে ততবার ধৌত করবে, যে পর্যন্ত পরিষ্কার পানি পতিত না হয়। পরিষ্কার

পানি পতিত হলেই পাক হয়ে যাবে, যদিওবা কাপড়ে বা হাতে রং বাকী থাকে। (আলমগীরী, মুনিয়া ও অন্যান্য গ্রন্থ)

মাসআলাঃ জাফরান বা অন্য কোন রং কাপড় রঙ্গীন করার জন্য পানিতে মিশানো হলো এবং সে পানিতে কোন শিশু প্রস্রাব করে দিল বা অন্য কোন নাপাকী বস্তু পতিত হলো, তাহলে সেই পানি দিয়ে কাপড় রঙ্গানো হলে তিনবার ধুইয়ে ফেললে পাক হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ কাপড় বা শরীরে নাপাক তৈল লেগে থাকলে, তিনবার ধুইয়ে ফেললে পাক হয়ে যাবে, যদিওবা তৈলের তৈলাক্ততা বর্তমান থাকে। সাবান বা গরম পানি দ্বারা ধোয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু মৃতের চর্বি লেগে থাকলে এর তৈলাক্ততা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত পাক হবে না। (মুনীয়া, বাহার)

মাসআলাঃ যদি ছুরিতে রক্ত লাগলো বা তীরে রক্ত লাগলো, তাহলে আগুনে নিক্ষেপ করার পর রক্ত জ্বলে গেলে পাক হয়ে গেল। (মুনিয়া ও বযাযিয়া)

মাসআলাঃ নাপাকী যদি পাতলা হয়, তাহলে তিনবার ধৌত করলে এবং তিনবার ভালমতে মোচড়ালে পাক হয়ে যাবে। ভালমতে মোচড়ানোর অর্থ হলো প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় শক্তি অনুসারে এমনভাবে মোচড়াবে যেন পুণরায় মোচড়ালে কোন পানির ফোঁটা পতিত না হয়। যদি কাপড়ের কথা খেয়াল করে ভালমতে মোচড়ানো না হয়, তাহলে পাক হবে না। (আলমগীরী, কাজী খাঁ)

মাসআলাঃ যদি ধৌতকারী ভাল মতে মোচড়ালো কিন্তু এরপরও এ রকম রয়ে গেছে যে যদি অন্য কেউ, যে ওর থেকে অধিক শক্তিশালী, মোচড়ালে দু এক ফোঁটা বের হতে পারে, তাহলে প্রথম ব্যক্তির বেলায় পাক এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির বেলায় নাপাক। প্রথম ব্যক্তির বেলায় দ্বিতীয় ব্যক্তির শক্তি ধর্তব্য নয়। অবশ্য দ্বিতীয় ব্যক্তি ধৌত কালে ওরকম মোচড়ালে পাক হবে না।

মাসআলাঃ প্রথম ও দ্বিতীয়বার মোচড়ানোর পর হাত পবিত্র করে নেয়া উত্তম এবং তৃতীয়বার মোচড়ানোর দ্বারা কাপড় ও হাত উভয়টা পাক হয়ে গেল। তবে যে কাপড় এতটুকু ভিজা রয়ে গেল যে মোচড়ালে এক আধ ফোঁটা বের হয়, তাহলে কাপড় ও হাত উভয়টা নাপাক।

মাসআলাঃ প্রথম ও দ্বিতীয়বার হাত পাক করলো না এবং এর ভিজা থেকে কাপড়ের পাক অংশটা ভিজে গেল, তাহলে সেটাও নাপাক হয়ে গেল। পুণরায় যদি প্রথমবার মোচড়ানোর পর ভিজে গেল, তাহলে সেটাকে দুবার ধোয়া চাই এবং দ্বিতীয়বার মোচড়ানোর পর হাতের ভিজা থেকে ভিজে যায়, তাহলে একবার ধুইতে হবে। অনুরূপ যদি একবার মোচড়ানো কাপড়ের ভিজা দ্বারা কোন পাক কাপড় ভিজে যায়, তাহলে সেটা দুবার ধুইতে হবে এবং যদি

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয়বার মোচড়ানো নাপাক কাপড়ের ভিজা দ্বারা পাক কাপড় ভিজে যায়, তাহলে একবার ধৌত করলে পাক হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ কাপড় তিনবার ধোয়ার পর প্রত্যেকবার ভালভাবে মোচড়ানো হয়েছে এবং এরপর মোচড়ানোর দ্বারা কোন পানি পতিত হয়নি কিন্তু পরে যখন টাঙায়ে দেয়া হলো তখন পানি ফোঁটা ফোঁটা পড়লো, তাহলে সে পানি পাক আর যদি ভাল মতে মোচড়ানো না হয়, তাহলে সেই পানি নাপাক।

মাসআলাঃ দুগ্ধপোষ্য ছেলে মেয়ের একই হুকুম অর্থাৎ ওদের প্রস্রাব কাপড়ে বা শরীরে লাগলে শরীর তিনবার ধুইতে হবে এবং কাপড় তিন বার ধৌত করলে ও মোচড়ালে পাক হয়ে যাবে। (আলমগীরী ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ যে জিনিষ মোচড়ানোর উপযোগী নয়, যেমন মাদুর,, জুতা, বরতন ইত্যাদি, সেগুলোকে ধুইয়ে রেখে দিন যাতে পানি টপকানো বন্ধ হয়। এভাবে আরো দুবার ধুইবেন তৃতীয় বার যখন পানি টপকানো বন্ধ হয়ে যাবে, তখন পাক হয়ে যাবে। অনুরূপ যে কাপড় পাতলার কারণে মোচড়ানোর উপযোগী নয়, সেই কাপড়ও এভাবে পাক করা যাবে।

মাসআলাঃ যদি এমন জিনিষ হয়, যেগুলোকে নাপাকী চোষণ করতে পারে না, যেমন কাঁচের বরতন, মাটির ব্যবহৃত পুরানো বরতন বা লোহা তামা, পিতল ইত্যাদি ধাতব তৈরী জিনিষ, তাহলে সেগুলোকে তিনবার ধুইয়ে নিলেই যথেষ্ট, পানি টপকানো বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করারও কোন প্রয়োজন নেই।

মাসআলাঃ নাপাক বরতন মাটি দ্বারা মেজে নেয়া উত্তম।

মাসআলাঃ পরিশোধিত চামড়া নাপাক হয়ে গেল, তাহলে মোচড়ানো গেলে ধোয়ার পর মোচড়াবে; অন্যথায় তিনবার ধৌত করবে এবং প্রত্যেক বার এতটুকু সময় অপেক্ষা করবে যেন পানি টপকানো বন্ধ হয়ে যায়।

(আলমগীরী, কাজী খাঁ)

মাসআলাঃ লোহার জিনিষ যেমন ছুরি, চাকু, তলোয়ার ইত্যাদি যেগুলোতে কোন মরিচা থাকে না, কোন কারুকার্য থাকে না, যদি নাপাক হয়ে যায়, তাহলে ভালমতে মুছে ফেললে পাক হয়ে যায় এবং এ ক্ষেত্রে নাপাকীর গাঢ় বা পাতলার কোন প্রশ্ন নেই। অনুরূপ চান্দি, সোনা, পিতল, গিন্টি এবং সব রকমের ধাতব দ্রব্যাদির মুছে ফেলার দ্বারা পাক হয়ে যায়। তবে শর্ত হলো যে যেন কারুকার্য করা না হয়। যদি কারুকার্য করা হয় বা লোহায় মরিচা আসে, তাহলে ধোয়া প্রয়োজন; মোছার দ্বারা পাক হবে না।

মাসআলাঃ আয়না এবং গ্লাস জাতীয় সকল সামগ্রী এবং চিনির বরতন, মাটির

তৈলাক্ত বরতন বা পালিশ করা কাঠ, মোট কথা ওসব জিনিষ যে গুলোতে কোন খুঁত থাকে না, কাপড় বা পাতা দ্বারা লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে বিদুরীত হওয়ার মতো মুছে ফেললে পাক হয়ে যায়।

মাসআলাঃ নাপাক জমীন যদি শুকিয়ে যায় এবং নাপাকীর কোন লক্ষণ অর্থাৎ রং বা গন্ধ অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে পাক হয়ে গেল। কিন্তু এর দ্বারা তায়াম্মুম করা নাজায়েয, তবে এর উপর নামায পড়া যায়। (আলমগীরী ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ যে জিনিষ শুকানো বা ঘষা ইত্যাদির দ্বারা পাক হয়ে গেছে, সে জিনিষ পরবর্তীতে ভিজে গেলে নাপাক হবে না। (বযাযিয়া)

মাসআলাঃ শূকর ব্যতীত প্রত্যেক মৃত পশুর চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার দ্বারা পাক হয়ে যায়। এ প্রক্রিয়াজাত লবন জাতীয় কোন ঔষধ দ্বারা করা হোক বা কেবল সূর্যালোক, বাতাস বা বালিতে শুকায়ে হোক, চামড়ার সম্পূর্ণ আদ্রতা বিলোপ হয়ে দুর্গন্ধ চলে গেলে উভয় অবস্থায় পাক হয়ে যাবে। ওটার উপর নামায দুরস্ত। (হেদায়া, শরহে বেকায়া আলমগীরী)

মাসআলাঃ শূকর ব্যতীত প্রত্যেক পশু হালাল হোক বা হারাম, জবেহ করার উপযোগী হয়ে থাকলে বিসমিল্লাহ বলে জবেহ করা হলে, তাহলে এর মাংস ও চামড়া পাক। নামাযীর কাছে যদি সেই মাংস থাকে বা সেই চামড়ার উপর নামায পড়ে, তাহলে নামায হয়ে যাবে। কিন্তু হারাম পশু জবেহ করলে হালাল হবে না বরং হারামই থাকবে। পাক হওয়া এক কথা আর হারাম হওয়া অন্য জিনিষ। দেখুন মাটি পাক বরং পবিত্রকারী। কিন্তু ক্ষতি হওয়া পরিমাণ মাটি খাওয়া হারাম। (মুনিয়া, হেদায়া ইত্যাদি)

মাসআলাঃ রাং, সীসা গলানোর দ্বারা পাক হয়ে যায়। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ যদি মধু নাপাক হয়ে যায়, তাহলে এর পাক করার নিয়ম হচ্ছে তাতে এর অধিক পানি ঢেলে এতটুকু সিদ্ধ করবে যেন সব পানি শুকায়ে যায় এবং যে পরিমাণ মধু ছিল সে পরিমাণ রয়ে যায়, তিনবার এভাবে সিদ্ধ করলে পাক হয়ে যাবে। এভাবে নাপাক তৈলও পাক করে নেয়া যায়। তৈল পাক করার আর একটি নিয়ম হচ্ছে যতটুকু তৈল থাকে ততটুকু পানি মিশায়ে ভালমতে নাড়বে। অতঃপর উপর থেকে তৈল উঠায়ে নেবে এবং পানি ফেলে দিবে। এভাবে তিনবার করলে তৈল পাক হয়ে যাবে। (মুনিয়া, আলমগীরী) ঘি যদি নাপাক হয়ে যায়, তাহলে গলায়ে উপরের যে কোন একটি নিয়মে পাক করা যায়।

মাসআলাঃ যে কাপড় দুভাঁজ বিশিষ্ট হয়, যদি এর এক ভাঁজ নাপাক হয়ে যায়, তাহলে যদি উভয়টা একত্রিত করে সেলাইকৃত হয়, তাহলে অন্য ভাঁজের দ্বারা নামায না জায়েয আর যদি একত্রিতভাবে শিলাইকৃত না হয়, তাহলে জায়েয।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ কাঠের তক্তার এক পিঠ নাপাক হলো এবং প্রস্থে যদি এতটুকু চওড়া হয় যে এর উপর দাঁড়ানো যায়, তাহলে উল্টায়ে এর উপর নামায পড়া জায়েয। (মুনিয়া)

মাসআলাঃ যে জায়গা গোবর দ্বারা লেপন করা হয়েছে, সে জায়গা শুকিয়ে গেলেও সেটার উপর নামায নাজায়েয। অবশ্য যদি শুকিয়ে যায় এবং শুটার উপর মোটা কাপড় বিছানো হয়, তাহলে সেই কাপড়ের উপর নামায পড়া জায়েয।

মাসআলাঃ গাছ, ঘাস, দেয়াল এবং এমন ইট যেটা মাটির সাথে সংযুক্ত, এসব শুকায় গেলে পাক হয়ে যায়। আর ইট যদি মাটির সাথে সংযুক্ত না থাকে, তাহলে শুকিয়ে গেলে পাক হবে না বরং ধুইতে হবে। অনুরূপ গাছ বা ঘাস শুকানোর আগে কেটে ফেললে, পাক করার জন্য ধোয়া প্রয়োজন।

(আলমগীরী, মুনিয়া)

শৌচকার্যের বর্ণনা

মাসআলাঃ মল-মূত্র ত্যাগ করার সময় বা শৌচকার্য করার সময় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ কোনটা যেন না হয়। সেটা ঘরে হোক বা ময়দানে। যদি ভুলে কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করে বসে যায়, তাহলে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে যেন দিক পরিবর্তন করে ফেলে। এতে মাগফেরাত পাওয়ার আশা করা যায়। (ফতহুল কদীর)

মাসআলাঃ শিশুকে পায়খানা প্রস্রাব করানোর সময় শিশুর মুখ কিবলার দিকে হওয়াটা করানোকারীর জন্য মকরূহ এবং এর জন্য করানোকারী গুনাহগার হবে। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ পায়খানা প্রস্রাব করার সময় চাঁদ সূর্যের দিকে মুখ বা পিঠ কোনটা করতে নেই। এ রকম বাতাসের দিকে প্রস্রাব করা নিষেধ এবং এরকম জায়গায় প্রস্রাব করা নিষেধ, যেখান থেকে ছিটকা উড়ে আসে।

মাসআলাঃ খালি মাথায় প্রস্রাবখানা বা পায়খানায় যাওয়া নিষেধ এবং যে সব জিনিষে কোন দুআ, আল্লাহ, রসুল বা কোন বুযুর্গের নাম লিখা থাকে, সে সব জিনিষ নিয়ে যাওয়া নিষেধ। (আলমগীরী ও অন্যান্য কিতাব)

যখন মলমূত্র ত্যাগ করতে যাওয়া হয়, তখন পায়খানার বাইরে এ দুআটা পড়ে নেয়া মুস্তাহাবঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ۔

অতঃপর প্রথমে বাম পা ভিতরে রাখবে। যখন বসতে যাবে তখন শরীর থেকে কাপড় সরাবে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত শরীর থেকে কাপড় খুলবে না। এরপর

পা ছড়ায়ে বাম পায়ের উপর জোর দিয়ে বসবে এবং নিশ্চুপ হয়ে মাথা নত রেখে কাজ সমাধা করবে। যখন কাজ হয়ে যাবে, তখন পুরুষ বাম হাতে স্বীয় লিঙ্গের গোড়ার দিক হতে মাথার দিকে মালিশ করবে যেন কোন ফোঁটা রয়ে গেলে বের হয়ে আসে। অতঃপর ঢিলার সাহায্যে পরিস্কার করে দাঁড়িয়ে যাবে এবং সোজা দাঁড়ানোর আগে শরীর ঢেকে বের হয়ে আসবে। বের হবার সময় ডান পা প্রথমে বের করবে এবং বের হয়ে এ দুআটি পড়বেঃ

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّیْ مَا یُؤْذِیْنِیْ وَاَمْسَكَ عَلَیَّ مَا یَنْفَعُنِیْ ۔

পুণরায় শৌচাগারে এ দুআ পড়ে প্রবেশ করবে–

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ وَبِحَمْدِهٖ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی دِیْنِ الْاِسْلَامِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنَ التَّوَّابِیْنَ وَاجْعَلْنِیْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِیْنَ الَّذِیْنَ لَاخَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَاهُمْ یَحْزَنُوْنَ

প্রথমে তিন বার হাত ধুইবে। অতঃপর বসে ডান হাতে পানি ঢালবে এবং বাম হাতে ধুইবে। আর পানির বদনা (লোটা) একটু উপরে রাখবে যেন ছিটকা না পড়ে। প্রথমে প্রস্রাবের জায়গা, এরপর পায়খানার জায়গা ধৌত করবে। ধোয়ার সময় নিশ্বাসের জোর নিচের দিকে দিয়ে পায়খানার জায়গা খোলা রাখবে, যেন ভাল মতে ধোয়া যায় এবং ধোয়ার পর হাতের মধ্যে যেন কোন গন্ধ রয়ে না যায়। অতঃপর কোন পাক কাপড় দ্বারা মুছে ফেলবে এবং যদি কাপড় না থাকে, তাহলে কয়েকবার হাত দ্বারা মুছে ফেলবে,যেন নামমাত্র আদ্রতা রয়ে যায়। যদি সন্দেহের আধিক্য হয়, তাহলে কাপড়ের উপর পানি ছিটকা দিবে। এরপর সেই জায়গা থেকে বের হয়ে এসে এ দুআটি পাঠ করবেঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوْرًا وَالْاِسْلَامَ نُوْرًا وَقَاعِدًا وَدَلِیْلًا اِلَی اللّٰهِ تَعَالٰی وَاِلٰی جَنَّاتِ النَّعِیْمِ اَللّٰهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِیْ وَطَهِّرْ قَلْبِیْ وَمَحِّصْ ذُنُوْبِیْ ۔

মাসআলাঃ আগে পিছের রাস্তা দিয়ে নাপাকী বের হলে ঢিলা দ্বারা শৌচকার্য করা সুন্নাত এবং যদি কেবল পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে, তাও জায়েয। কিন্তু মুস্তাহাব হচ্ছে ঢিলা নেয়ার পর পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা।

মাসআলাঃ ঢিলা দ্বারা পবিত্রতা তখন যথেষ্ট হবে যদি নাপাকী বের হবার স্থানের আশে পাশে এক দিরহাম থেকে অধিক জায়গা পরিবেষ্টিত না করে। যদি

pdf By Syed Mostafa Sakib

এক দিরহাম থেকে অধিক জায়গায় লেগে যায়, তাহলে ধোয়া ফরয। কিন্তু তখনও প্রথমে ঢিলা নেয়াটা সুন্নাত হিসেবে বলবৎ থাকবে।

মাসআলাঃ পায়খানার পর পুরুষের ঢিলা ব্যবহারের মুস্তাহাব নিয়ম হচ্ছে গরম কালে প্রথম ঢিলাটা সামনের থেকে পিছনে নিয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ঢিলাটা পিছন থেকে সামনের দিকে নিয়ে আসবে এবং তৃতীয় ঢিলাটা পুণরায় সামনের থেকে পিছনের দিকে নিয়ে যাবে। আর শীতকালে প্রথম ঢিলাটা পিছন থেকে সামনের দিকে আনবে, দ্বিতীয় ঢিলাটা সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে নিয়ে যাবে এবং তৃতীয় ঢিলাটা পিছনের দিক থেকে সামনের দিকে নিয়ে আসবে।

মাসআলাঃ মহিলা সব ঋতুতে প্রথম ঢিলা সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে নিয়ে যাবে। দ্বিতীয় ঢিলাটা পিছন থেকে সামনের দিকে নিয়ে আসবে এবং তৃতীয়টা পুণরায় সামনের থেকে পিছনে নিয়ে যাবে। (কাজী খান, আলমগীরী)

মাসআলাঃ যদি তিন ঢিলা দ্বারা পূর্ণভাবে পরিস্কার না হয়, তাহলে এভাবে পাঁচ, সাত, নয় যতবার লাগে বেজোড় সংখ্যক ঢিলা নিবে।

মাসআলাঃ প্রস্রাবের পর যার এ ধারনা হয় যে কোন ফোঁটা অবশিষ্ট রয়ে গেছে বা পুণরায় আসবে, তার জন্য ইসতেবরা ওয়াজিব। অর্থাৎ প্রস্রাবের পর এরকম কাজ করা যেন কোন ফোঁটা আটকে থাকলে বের হয়ে আসে। হাঁটাহাঁটির দ্বারা ইসতেবরা করা বা মাটির উপর জোরে পা মারার দ্বারা ইসতেবরা করা যায় বা উঁচু জায়গা থেকে নিচে নেমে অথবা নিচে থেকে উপরে উঠার দ্বারা ইসতেবরা করা যায়। অথবা ডান পাকে বাম পায়ের উপর বা বাম পাকে ডান পায়ের উপর রেখে জোর দেয়ার মাধ্যমেও ইসতেবরা করা যায়। অথবা গলার আওয়াজ করে বা বাম কাত হয়ে ইসতেবরা করা যায়। ইসতেবরা ততক্ষণ পর্যন্ত করা চাই, যতক্ষণ নিশ্চিত হওয়া যায় যে এখন আর ফোটা বের হবে না। ইসতেবরার হুকুম পুরুষের জন্য। মহিলা কাজ সারার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে;অতঃপর পরিস্কার করে নিবে।

মাসআলাঃ মাটির টুকরা, পাথর, ছেঁড়া কাপড় এসব ঢিলার অন্তর্ভূক্ত। এগুলো দ্বারা পরিস্কার করা বিনা মকরূহে জায়েয।

মাসআলাঃ কাগজ দ্বারা শৌচকার্য করা নিষেধ। সেটার উপর কিছু লিখা থাকুক বা না থাকুক।

মাসআলাঃ পুরুষের হাত অকেজো হলে, স্ত্রী শৌচকার্য করায়ে দিবে এবং স্ত্রীর হাত অকেজো হলে স্বামী শৌচকার্য করায়ে দিবে। কিন্তু অন্য কোন আত্মীয়, ছেলে, মেয়ে, ভাইবোন কেউ শৌচকার্য করাতে পারবে না। বরং সেই রকম অপারগ অবস্থায় মাফ।

মাসআলাঃ ওযুর অবশিষ্ট পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন না করা চাই।

মাসআলাঃ পবিত্রতা অর্জনের অবশিষ্ট পানি ফেলে দেয়া অনুচিত। কারণ এটা অপব্যয়। অন্য কোন কাজে লাগানো উচিত এবং ওযুও করা যায়।

নামাযের দ্বিতীয় শর্ত সতর ঢাকার বর্ণনা

সতর হচ্ছে নামাযীর শরীরের যে অংশটুকু ঢেকে রাখা প্রয়োজন, সেটা ঢেকে রাখা।

মাসআলাঃ পুরুষের জন্য নাভীর নীচ থেকে শুরু করে হাঁটুর নীচে পর্যন্ত সতর অর্থাৎ শরীরের এটুকু অংশ ঢেকে রাখা ফরয। নাভী ঢাকা ফরয নয়, তবে হাঁটু ঢাকা ফরয।

মাসআলাঃ স্বাধীন মহিলা (বাঁদী নয়) ও হিজরাদের জন্য মুখ, হাতের তালু ও পায়ের তলা ব্যতীত সর্বাঙ্গ সতর। মাথার ঝুলন্ত চুল, গরদান ও হাতের কব্জীও সতর। এগুলোকেও ঢেকে রাখা ফরয।

মাসআলাঃ যদি মহিলা এতটুকু পাতলা ওড়না মাথায় দিয়ে নামায পড়ে, যার ফলে চুলের কালিমা প্রকাশ পায়, তাহলে নামায হবে না।

মাসআলাঃ বাঁদীর জন্য সমস্ত পেট ও পিঠ এবং উভয় বাহু এবং নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত সতর।

মাসআলাঃ যেসব অংগ ঢেকে রাখা ফরয, সেসবের কোন অংগ যদি একচতুর্থাংশের কম খুলে যায়, তাহলে নামায হয়ে যাবে এবং যদি এক চতুর্থাংশ খুলে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঢেকে নেয় তখনও নামায হয়ে যাবে। আর যদি এক রোকন আদায় অর্থাৎ তিন বার সুবহানাল্লাহ বলার সময় বরাবর খোলা থাকে বা ইচ্ছাকৃতভাবে খুলে সঙ্গে সঙ্গে ঢেকে ফেললে, নামায হবে না।

মাসআলাঃ পুরুষের জন্য ঢেকে রাখার অংগ হচ্ছে নয়টি–(১) পুরুষাঙ্গ (২) অন্ডকোষদ্বয় (৩) গুহ্যদ্বার (৩) ডান পাছা (৫) বাম পাছা (৬) ডান উরু (৭) বাম উরু (৮) নাভীর নীচ থেকে শুরু করে পুরষাঙ্গের গোড়া পর্যন্ত এবং সেই বরাবর পিঠ ও উভয় পার্শ্ব। (৯) গুহ্যদ্বার ও অন্ডকোষদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান। এ নয়টি অংগ সতর হিসেবে গণ্য। এগুলোর প্রত্যেকটি এক একটি অংগ এবং এ সবের যে কোন একটির এক চতুর্থাংশের কম খুলে গেলে নামায হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ যদি কয়েকটি অংগের কিছু কিছু অংশ খোলা রইলো কিন্তু প্রত্যেকটি খোলা অংগ আলাদাভাবে এক চতুর্থাংশ থেকে কম কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে খোলা অংগসমূহের সবচে ছোট অংগের এক চতুর্থাংশের বরাবর হয়

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহলে নামায হবে না। যেমন কোন মহিলার কানের এক নবমাংশ এবং পায়ের গোছার নবমাংশ খোলা রইলো কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে উভয়টা কানের এক চতুর্থাংশের বরাবর নিশ্চয় হবে। সুতরাং এ অবস্থায় নামায হবে না। (আলমগীরী ও রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ নামায শুরু করার সময় যদি কোন অংগের এক চতুর্থাংশ খোলা থাকে অর্থাৎ ওই অবস্থায় আল্লাহ আকবর বলা হয়, তাহলে নামায শুরু হলো না (রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ স্বাধীন মহিলার জন্য উপরে উল্লেখিত পাঁচ অংগ ব্যতীত সারা শরীর সতর। মহিলার জন্য ত্রিশটি অংগ সতর। ওগুলো থেকে যে কোন অংগের যদি এক চতুর্থাংশ খুলে যায়, তাহলে সেই হুকুমই বর্তাবে যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। এ ত্রিশ অংগ হচ্ছে–(১) মাথা অর্থাৎ মাথার উপর থেকে গরদানের শুরু পর্যন্ত, (২) ঝুলন্ত চুল, (৩) ডান কান (৪) বাম কান, (৫) গরদান, (৬) ডান কাঁধ, (৭) বাম কাঁধ, (৮) কনুইসহ ডান হাত ও (৯) বাম হাত, (১০) ডান হাত ও (১১) বাম হাতের কব্জি অর্থাৎ কনুই এর পর থেকে কব্জির নীচ পর্যন্ত, (১২) বুক (গলার গোড়া থেকে উভয় স্তনের নীচে পর্যন্ত) (১৩) ডান হাত ও (১৪) বাম হাতের পিঠ, (১৫) ডান ও (১৬) বাম স্তন, (১৭) পেট (বুকের যে সীমা উল্লেখিত হয়েছে এর পর থেকে নাভী পর্যন্ত (নাভী সহ) পেটের অন্তর্ভূক্ত, (১৮) পিঠ অর্থাৎ পিছনের দিক বুক বরাবর থেকে কোমর পর্যন্ত, (১৯) উভয় কাঁধের মাঝখানে যে জায়গা আছে, বগলের নীচে বুকের নিম্ন সীমার বরাবর (২০) ডান পাছা, (২১) বাম পাছা, (২২) লজ্জাস্থান, (২৩) গুহ্যদ্বার, (২৪) ডান ও (২৫) বাম উরু অর্থাৎ উভয় উরুর গোড়া থেকে হাঁটু পর্যন্ত (হাঁটুসহ), (২৬) নাভীর নীচে তলপেট এবং এর সংলগ্নস্থান এবং এরই সোজা পিঠের দিক সব মিলে একটি সতর, (২৭) ডান ও (২৮) বাম পায়ের গোছা (গীরাসহ), (২৯) ডান হাত ও (৩০) বাম হাতের তালু। অনেক উলামায়ে কিরাম হাতের তালু ও পিঠ সতরের অন্তর্ভূক্ত করেননি।

মাসআলাঃ মহিলার চেহারা যদিওবা সতর নয় কিন্তু গায়ের মুহরেম (যাদের সাথে বিবাহ বৈধ) এর সামনে চেহারা খোলা রাখা নিষেধ। অনুরূপ গায়ের মুহরেমের পক্ষেও তাকে দেখা না জায়েয।

মাসআলাঃ যদি কোন পুরুষের কাছে সতর ঢাকার মত কোন জায়েয কাপড় নাই কিন্তু রেশমী কাপড় আছে, তাহলে সেটা দ্বারা সতর ঢাকা ফরয এবং সেটা পরিধান করে যেন নামায পড়ে। তবে অন্য কাপড় বর্তমান থাকা অবস্থায় পুরুষের জন্য রেশমী কাপড় পরা হারাম এবং রেশমী কাপড় পরে নামায পড়া মকরূহ তাহরীমী–

মাসআলাঃ যদি উলঙ্গ ব্যক্তি চাটাই বা বিছানা জাতীয় কিছু পায়, তাহলে সেটা দিয়ে সতর ঢাকবে, উলঙ্গাবস্থায় পড়বে না। অনুরূপ ঘাস বা পাতা দ্বারা সতর ঢাকা গেলে, তাই করবে। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ কারো কাছে যদি একেবারে কোন কাপড় না থাকে, তাহলে বসে নামায পড়বে এবং রুকূ সিজদা ইশারায় আদায় করবে। তা দিনে হোক বা রাতে, ঘরে হোক বা মাঠে, একই হুকুম। (হেদায়া দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ যদি অন্য জনের কাছে কাপড় থাকে এবং এটা দৃঢ় ধারনা হয় যে চাওয়া মাত্র দিয়ে দিবে, তাহলে চাওয়া ওয়াজিব। (রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ যদি নাপাক কাপড় ছাড়া অন্য কোন কাপড় না থাকে এবং পাক করার কোন উপায়ও নেই, তাহলে সেই নাপাক কাপড় দ্বারাই সতর ঢাকবে এবং উলঙ্গ নামায পড়বে না। (হেদায়া)

মাসআলাঃ যদি পূর্ণ সতর ঢাকার জন্য কাপড় না থাকে এবং এতটুকু কাপড় আছে, যদ্বারা কিছু অংগের সতর ঢাকা যাবে, তাহলে ততটুকু ঢাকা ওয়াজিব এবং সেই কাপড় দ্বারা প্রধান সতর অর্থাৎ সামনে পিছে ঢাকবে। আর যদি এতটুকু হয় যে কেবল একটা ঢাকা যাবে, তাহলে একটাই ঢাকবে।

মাসআলাঃ যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়ার দ্বারা এক চতুর্থাংশ সতর খুলে যায়, তাহলে বসে পড়বে। (রদ্দুল মুহতার, দুর্রুল মুখতার)

নামাযের তৃতীয় শর্ত–ওয়াক্তের বর্ণনা

ফজরের ওয়াক্তঃ ফজরের ওয়াক্ত হচ্ছে সুবহে সাদেক থেকে শুরু করে সূর্য্যের আলোক রশ্মি চমকানো পর্যন্ত। সুবেহ সাদেক হচ্ছে এমন এক প্রকার আলো, যা সূর্য উদিত হওয়ার আগে সূর্যের উপরে আসমানের পূর্ব কিনারায় প্রকাশ পায় এবং ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সমস্ত আসমানে ছড়িয়ে পড়ে এবং চারিদিক উজ্জ্বল হয়ে যায়। এ আলো প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে সেহরীর সময় শেষ হয়ে যায় এবং ফজর নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। এ আলোর আগে আসমানের মাঝখানে একটি লম্বা সাদা রেখা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে বিকশিত হতে দেখা যায়। যার নীচে সমগ্র পৃথিবী অন্ধকারময় থাকে। সুবেহ সাদেক এর নীচে থেকে প্রকাশিত হয়ে উত্তর দক্ষিণ উভয় দিক ব্যাপিয়া উপরের দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন সেই লম্বা রেখা সুবহে সাদেকের

pdf By Syed Mostafa Sakib

আলোতে অদৃশ্য হয়ে যায়। এ লম্বা সাদা রেখাকে সুবহে কাযেব বলা হয়। তখন ফজরের ওয়াক্ত হয় না। (কাজী খাঁ, বাহার)

মাসআলাঃ ফযরের নামাযের সময় সুবহে সাদেকের আলো চমকায়ে সামান্য বিকশিত হওয়ার পর থেকে গণ্য করা হয় এবং ইশার নামায পড়া ও সেহরী খাওয়ার বেলায় সুবহে সাদেক উদিত হওয়াটাকে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ ফজর ওই সময় পড়বে, যখন ভালমতে আলোকিত হয়ে যায়' এবং ইশা ও সেহরীর সময় ওই মূহুর্তেই শেষ মনে করবে, যখন সুবহে সাদেকের আলো সবেমাত্র বিকেশিত হয়। (আলমগীরী ও অন্যান্য কিতাব)

যোহরের ওয়াক্তঃ যোহরের ওয়াক্ত যওয়াল অর্থাৎ সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে প্রত্যেক জিনিষের ছায়া মূল ছায়া ব্যতীত দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত। উদাহরণ স্বরূপ, ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় কোন জিনিষের ছায়া চার আঙুল ছিল কিন্তু সেই জিনিষটা হলো আট আঙুল পরিমাণ। তাহলে সেই জিনিষটার ছায়া যখন সর্বমোট বিশ আঙুল পরিমাণ হয়ে যাবে, তখন যোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে।

বিঃ দ্রঃ মূল ছায়া হচ্ছে সেটাই, যেটা ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় থাকে। যখন সূর্য ঠিক মধ্য আসমানে পৌঁছে অর্থাৎ এর পূর্ব পশ্চিমের দূরত্ব ঠিক বরাবর হয়, তখনই ঠিক দ্বিপ্রহর বলা হয়। এ স্থান থেকে সামান্য পশ্চিম দিকে ঝুঁকে পড়লেই যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয়।

বিঃ দ্রঃ সূর্য ঢলে পড়ার লক্ষণ হচ্ছে সমতল ভূমিতে একটি সোজা লাঠি এমন সোজা ভাবে স্থাপন করবে যেন পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ঝুঁকে না থাকে। অতঃপর দেখা যাবে যে সূর্য যতই উপরে উঠবে, সেই লাঠির ছায়া হ্রাস পেতে থাকবে। যখন হ্রাস পাওয়াটা স্থির হয়ে যাবে, তখন সেটা হবে ঠিক দ্বিপ্রহর এবং সেই ছায়াটা হচ্ছে মূল ছায়া। এরপর ছায়া বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং এটা তারই প্রমাণ যে সূর্য অর্ধ দিবসের রেখা অতিক্রম করেছে এবং যোহরের ওয়াক্ত শুরু হলো জুমার ওয়াক্তটাও যোহরের ওয়াক্তের অনুরূপ।

আসরের ওয়াক্তঃ যোহরের ওয়াক্ত শেষ হবার সাথে সাথে আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায় এবং সূর্য ডুবা পর্যন্ত বাকী থাকে।

ফায়দাঃ আসরের সময় কমপক্ষে দেড়ঘন্টা এবং বেশী হলে দুঘন্টা পর্যন্ত হয়ে থাকে। শীত কালে অর্থাৎ নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় পৌনে চার মাস দেড় ঘন্টার মত থাকে এবং এটা আসরের জন্য সবচে কম সময় এবং এপ্রিল মে মাসে প্রায় পৌণে দু'ঘন্টা, মে মাসের শেষের দিকে এবং জুন মাসে প্রায় দু'ঘন্টা আবার আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাসে পৌণে দু'ঘন্টা এবং

অক্টোবরের শেষের দিকে দেড় ঘন্টার কাছাকাছি এসে যায়।

বিঃ দ্রঃ এ যে সময়ের কথা উল্লেখিত হলো, সেটা বিভিন্ন মাস ও তারিখে দু–চার মিনিট এদিক সেদিক হবে। এখানে শুধু একটা মোটামুটি ধারনা লাভ করার জন্য উপরোক্ত সময়ের তারতম্যটা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যারা প্রত্যেক জায়গার ও প্রত্যেক তারিখের সঠিক সময় জানতে ইচ্ছুক, তারা আমার কিতাব 'আল আওকাত' দেখুন।

মগরিবের ওয়াক্তঃ মগরিবের ওয়াক্ত হচ্ছে সূর্য ডুবার পর থেকে সাদা আভা চলে যাওয়া পর্যন্ত। সাদা আভাটা লালিমা বিলুপ্ত হওয়ার পর পশ্চিমে সুবহে সাদেকের সাদা আভার মত উত্তর দক্ষিণে বিস্তার লাভ করে। (হেদায়া, আলমগীরী, খানিয়া)

ফায়দাঃ প্রতিদিন যতক্ষণ সময় ফজরের হয়ে থাকে, ততক্ষণ মগরিবেরও হয়ে থাকে।

ইশার ওয়াক্তঃ আসমানের সাদা আভা অদৃশ্য হওয়ার পর থেকে সুবহে সাদেক শুরু হওয়া পর্যন্ত ইশার ওয়াক্ত বলবৎ থাকে। সাদা আভা অদৃশ্য হয়ে যাবার পর পূর্ব পশ্চিম ব্যাপিয়া একটি লম্বা সাদা রেখাও হয়ে থাকে। সেটার কোন গুরুত্ব নেই। সেটা সুবহে কাযেবের মত। এর আগেই মগরিবের সময় শেষ হয়ে যায় এবং ওটা থাকাকালীন সময়েই ইশার ওয়াক্ত হয়ে যায়।

বিতরের ওয়াক্তঃ ইশার ওয়াক্ত যেটা, সেটাই বিতরের ওয়াক্ত। অবশ্য ইশার নামাযের আগে বিতর পড়া যায় না, কারণ ওটার মধ্যে তরতীব ফরয। যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে ইশার নামায পড়ার আগে বিতর পড়ে নেয়া হয়, তাহলে বিতর হবে না। ইশার পরে পুণরায় পড়তে হবে। হ্যাঁ, যদি ভুল করে বিতর পড়ে নেয় বা পরে জানতে পারলো যে ইশার নামায ওযুছাড়া পড়েছিল এবং বিতর ওযু সহকারে পড়েছিল, তাহলে বিতর আদায় হয়ে যাবে। (দুর্রুল মুখতার, আলমগীরী)

মাসআলাঃ পৃথিবীর যে অংশে যে সময়ে ইশার ওয়াক্ত আসেই না, সেখানে সে সময় ইশা ও বিতর যেন কাযা পড়া হয়। (বাহারে শরীয়ত)

মুস্তাহাব ওয়াক্তসমূহ

ফজরে বিলম্ব করা মুস্তাহাব। অর্থাৎ যখন খুবই উজ্জ্বল হয়ে যায়, তখন যেন শুরু করে। কিন্তু এরকম সময় থাকা চাই যে চল্লিশ থেকে ষাট আয়াত যথানিয়মে পড়তে পারে এবং সালাম ফিরানোর পর এতটুকু সময় যেন বাকী থাকে যে যদি

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোন কারণে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়; তাহলে পবিত্রতা অর্জন করে পুণরায় যথানিয়মে চল্লিশ থেকে ষাট আয়াত দ্বিতীয় বার পড়তে পারে এবং এতটুকু বিলম্ব করা মকরূহ যদি সূর্য বের হয়ে যাওয়ার সন্দেহ হয়। (কাজী খাঁ ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ মহিলাদের জন্য সব সময় ফজর নামায ওয়াক্তের শুরুতে পড়া মুস্তাহাব এবং অন্যান্য নামায সমূহের বেলায় পুরুষদের জমাত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম। অর্থাৎ জমাত হয়ে গেলেই যেন নামায পড়ে।

মাসআলাঃ শীতকালে যোহর তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব এবং গ্রীষ্ম কালে দেরীতে পড়া মুস্তাহাব। তা একাকী হোক বা জমাতসহকারে হোক। অবশ্য গ্রীষ্মকালে যদি যোহর নামাযের জমাত প্রথম ওয়াক্তে পড়া হয়, তাহলে মুস্তাহাব ওয়াক্তের জন্য জমাত ত্যাগ করা নাজায়েয। বসন্ত কাল শীত কালের এবং শরত কাল গ্রীষ্ম কালের হুকুমাধীন। (রদ্দুল মুহতার, আলমগীরী)

মাসআলাঃ জুমার মুস্তাহাব ওয়াক্ত ওটাই, যেটা যোহরের জন্য মুস্তাহাব। (বাহার)

মাসআলাঃ আসরের নামায সব সময় বিলম্বে পড়া মুস্তাহাব। তবে এতটুকু দেরী করতে নেই যে সূর্যের গোলকে পাণ্ডুবর্ণ এসে যায় এবং সহজে সেটার দিকে তাকানো যায়। অবশ্য আলোকরশ্মির পাণ্ডুবর্ণ ধর্তব্য নয়। (আলমগীরী, রদ্দুল মুহতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ উত্তম হচ্ছে কোন বস্তুর ছায়া আসলী ব্যতীত একগুণ হওয়ার পর যোহরের নামায এবং দ্বিগুণ হওয়ার পর আসরের নামায পড়া। (গুনিয়া)

মাসআলাঃ বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, সূর্যের গোলকের মধ্যে পাণ্ডুবর্ণ তখনই আসে যখন ডুবার বিশ মিনিট বাকী থাকে। তাই সেই সময় পর্যন্ত বিলম্ব করা মকরূহ। অনুরূপ সূর্য উদিত হওয়ার বিশ মিনিট পর নামাযের বৈধ সময় শুরু হয়ে যায়। (ফতওয়ায়ে রেজভিয়া, বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ মেঘলা দিন ব্যতীত সব সময় মগরীবের নামায অনতিবিলম্বে পড়ে নেয়া মুস্তাহাব এবং দু'রাকাত নামায পড়ার মত সময় থেকে অধিক দেরী করা মকরূহ তনযীহ এবং সফর, অসুখ ইত্যাদির অযুহাত ব্যতীত তাঁরা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়া পর্যন্ত দেরী করা মকরূহ তাহরীমী। (দুর্রুল মুখতার, আলমগীরী, ফতওয়ায়ে রেজভিয়া)

মাসআলাঃ ইশার নামাযে এক তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত বিলম্ব করা মুস্তাহাব এবং অর্ধ রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করা মুবাহ অর্থাৎ অর্ধরাত হওয়ার আগেই ফরয পড়ে

নেয়া মুবাহ এবং অর্ধরাত থেকে অধিক বিলম্বিত করা মকরূহ, কারণ জমাত ছোট হয়ে যায়। (বাহার, দুর্রুল মুখতার, খানিয়া)

মাসআলাঃ ইশার নামায পড়ার অগে শোয়া মকরূহ।

মাসআলাঃ ইশার নামাযের পর দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা, গল্পগুজব করা বা শুনা মকরূহ। অবশ্য জরুরী কথাবার্তা, কুরআন তিলওয়াত, জিকির, দ্বীনি মসায়েল বর্ণনা ও বুযুর্গানে কিরামের কাহিনী বর্ণনা ও মেহমানদের সাথে কথাবার্তা বলার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই। অনুরূপ সুবহে সাদেক থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত জিকরে ইলাহী ব্যতীত যাবতীয় কথাবার্তা মকরূহ।

(দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি নিজের জাগার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস রাখে, ওর জন্য শেষ রাত্রে বিতর পড়া মুস্তাহাব, অন্যথায় শোয়ার আগে পড়ে নেয়া চাই। এরপর যদি শেষ রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়, তাহলে তাহাজ্জুদ পড়ে নিবে। বিতর দ্বিতীয়বার পড়া জায়েয নেই। (কাযী খান)

মাসআলাঃ মেঘলা দিনে আসর ও ইশার নামাযে বিলম্ব না করা মুস্তাহাব এবং বাকী নামাযসমূহের বেলায় বিলম্বিত করা মুস্তাহাব।

মকরূহ ওয়াক্তসমূহ

সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দ্বিপ্রহর এ তিন সময়ে ফরয, ওয়াজিব, নফল, কাযা, তিলাওয়াতে সিজদা, সিজদায়ে সহ কোনটাই জায়েয নেই। অবশ্য সেই দিনের আসরের নামায যদি না পড়ে থাকে, তাহলে সূর্যাস্তের সময় পড়ে নিবে। কিন্তু এতটুকু দেরী করা হারাম।

মাসআলাঃ সূর্যোদয় বলতে সূর্যের কোণা দেখা যাওয়ার থেকে শুরু করে পূর্ণ বের হয়ে আসার পর ওই সময় পর্যন্ত, যখন ওটার উপর চোখ ঝলসে যায়। এ সময়টা মোট বিশ মিনিট।

মাসআলাঃ দ্বিপ্রহর বলতে শরয়ী অর্ধ দিবস থেকে শুরু করে হাকীকী অর্ধ দিবস অর্থাৎ সূর্য ঝুঁকে পড়ার আগ পর্যন্ত সময়টাকে বুঝায়।

মাসআলাঃ শরয়ী অর্ধ দিবস জানার নিয়ম হচ্ছে এই যে সময় থেকে সুবহে সাদেক শুরু হলো, সেই সময় থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যত ঘন্টা হয়, তা সমান দুভাগ করে প্রথম ভাগ শেষ হওয়ার পর শরয়ী অর্ধ দিবস শুরু হয়ে যায় এবং সূর্য ঝুঁকে পড়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। মনে করুন, আজ ২০শে মার্চ সন্ধ্যা ছয়টায় সূর্য ডুবলো এবং প্রায় সকাল ছয়টার সময় উদিত হয়েছিল, সে

pdf By Syed Mostafa Sakib

হিসাবে দিনের ঠিক বারটার সময় দ্বিপ্রহর হলো এবং ভোর সাড়ে চারটায় সুবহে সাদেক হলে সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সাড়ে তের ঘন্টা হয়, যার অর্ধেক হলো পৌণে সাত ঘন্টা। এবার সুবহে সাদেক অর্থাৎ সাড়ে চারটা থেকে শুরু করে পৌণে সাত ঘন্টা সময় অতিবাহিত হলে সোয়া এগারটা হবে। অতঃপর সোয়া এগারটা থেকে শরয়ী অর্ধদিবস শুরু হলো। ঠিক বারোটায় যখন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়বে, শরয়ী দ্বিপ্রহর শেষ হয়ে গেল। এর থেকে বুঝা গেল যে আজ পৌণে এক ঘন্টা-সোয়া এগারটা থেকে বারটা পর্যন্ত শরয়ী দ্বিপ্রহর রইল। এ পৌণে এক ঘন্টা না জায়েয সময়।

বিঃ দ্রঃ বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন কালে নিশ্চয় সময়ের তারতম্য হবে। প্রত্যেক জায়গায় প্রত্যেক দিন উপরোক্ত নিয়মে শরয়ী দ্বিপ্রহর বের করা যাবে।

মাসআলাঃ জানাযা যদি নিষিদ্ধ সময়ে আনা হয়, তাহলে সে সময় জানাযার নামায পড়ে নেয়া মকরূহ নয়। তবে জানাযা যদি আগে থেকেই মওজুদ ছিল এবং দেরী করার কারণে মকরূহ সময় হয়ে গেল, সে অবস্থায় জানাযার নামায মকরূহ। (আলমগীরী, রাদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ ওই তিন সময় তিলাওয়াতে কুরআন মজীদ ভাল নয়। জিক্বির ও দরুদ শরীফ পাঠে নিয়োজিত থাকাটাই উত্তম। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ বারটি নির্দিষ্ট সময়ে নফল পড়া নিষেধ। (১) সুবহে সাদেক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজরের দুরাকাত সুন্নাত ব্যতীত কোন নফল নামায জায়েয নেই (২) নিজের মযহাবের জমাতের জন্য ইকামত হলো, তাহলে ইকামত থেকে জমাত শেষ হওয়া পর্যন্ত নফল ও সুন্নাত পড়া মকরূহ তাহরীমী। অবশ্য যদি ফজরের জমাত শুরু হলো এবং এটা জানা আছে যে, সুন্নাত পড়ার পরও জমাত পাওয়া যাবে, যদিওবা শেষ বৈঠকে হোকনা কেন, তাহলে শরীয়তের নির্দেশ হচ্ছে, জমাত থেকে দুরে পৃথক জায়গায় সুন্নাত পড়ে যেন জমাতে শরীক হয়। আর যদি এটা জানা থাকে যে সুন্নাত পড়তে গেলে জামাত মিলবে না, তাহলে সুন্নাতের খেয়ালে জমাত ছেড়ে দেয়া নাজায়েয ও গুনাহ। ফজর ব্যতীত অন্য নামাযসমূহে জমাত পাওয়াটা দৃঢ় ধারণা থাকলেও ইকামত হয়ে যাবার পর সুন্নাত পড়া না জায়েয (৩) আসরের নামায পড়ার পর সূর্য পাণ্ডুবর্ণ হওয়া পর্যন্ত নফল নামায পড়া নিষেধ। (৪) সূর্য ডুবার পর থেকে মাগরিবের ফরয পড়া পর্যন্ত নফল জায়েয নেই। (আলমগীরী, দুর্রুল মুখতার) (৫) যে সময় ইমাম জুমার খুতবা দেয়ার জন্য দাঁড়ান, সে সময় থেকে শুরু করে জুমার ফরয শেষ হওয়া পর্যন্ত নফল নিষেধ। (৬) ঠিক খুতবা দেয়ার সময় সেটা প্রথম খোতবা বা দ্বিতীয় খুতবা হোক বা ঈদের খুতবা হোক অথবা সূর্য গ্রহণ, ইসতিসকা (বৃষ্টি কামনা)

হজ্ব বা বিবাহের খুতবা হোক, কোন নামায এমনকি কাযাও নাজায়েয। কিন্তু সাহেবে তরতীব অর্থাৎ নিয়মিত নামায আদায়কারীর জন্য খুতবার সময় কাযা নামায পড়ার অনুমতি রয়েছে। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ কেউ জুমার সুন্নাত শুরু করার পর ইমাম খুতবা দেয়ার জন্য স্বীয় জায়গা থেকে উঠলেন, তাহলে সে যেন চার রাকাত পূর্ণ করে। (আলমগীরী) (৭) উভয় ঈদের আগে নফল নামায মকরূহ, ঘরে হোক বা ঈদগাহে বা মসজিদে। (আলমগীরী, দুর্রুল মুখতার) (৮) ঈদের নামাযের পরও নফল মকরূহ, ঈদগাহে হোক বা মসজিদে। তবে ঘরে পড়লে মকরূহ নয়। (আলমগীরী, দুর্রুল মুখতার) (৯) আরাফাতের ময়দানে যোহর ও আসর একসাথে পড়তে হয়। তখন এর মাঝখানে বা পরে নফল ও সুন্নাত মকরূহ (১০) মুযদালাফাতেও যে মগরীব ও ইশা একসাথে পড়া হয়, এর মাঝখানে নফল ও সুন্নাত পড়া মকরূহ। কিন্তু পরে পড়লে মকরূহ নয়। (আলমগীরী, দুর্রুল মুখতার) (১১) যে জিনিষটা মনের মধ্যে অস্বস্থিবোধ সৃষ্টি করে এবং সেটা লাঘব করা সম্ভব হওয়া সত্বেও লাঘব না করে যে কোন নামায পড়া মকরূহ। যেমন প্রস্রাব, পায়খানা বা বায়ুর হাজত হওয়া অবস্থায় নামায মকরূহ। অবশ্য যদি সময় না থাকে, পড়ে নিবে এবং পরে দ্বিতীয় বার পড়বে। অনুরূপ খাবার সামনে আনা হলো এবং সেটা খাওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হলো বা অন্য কোন এমন বিষয়ের সম্মুখীন হলো, যেটা সমাধা না হলে স্বস্থিবোধ আসে না এবং নামাযের মধ্যে একাগ্রতা সৃষ্টি হয় না, এমতাবস্থায় নামায পড়া মকরূহ। (দুর্রুল মুখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ ফজর ও যোহরের পূর্ণ ওয়াক্ত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মকরূহ হীন সময় অর্থাৎ এ নামায সমূহ স্বীয় ওয়াক্তের যে কোন সময়ে পড়লে মোটেই মকরূহ নয়। (বাহারুর রায়েক, বাহারে শরীয়ত)

আযানের বর্ণনা

আযানের ছওয়াব সম্পর্কে হাদীছসমূহে অনেক কিছু বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীছে বর্ণিত আছে–হুযুর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান, যদি লোকেরা জানতে পারতো যে, আযান দেয়ার মধ্যে কত ছওয়াব, তাহলে সেটার জন্য পরস্পরের মধ্যে তলোয়ার চলতো। (আহমদ)

মাসআলাঃ আযান ইসলামের অন্যতম নিদর্শন। যদি কোন শহর বা গ্রাম বা মহল্লার লোকেরা আযান দেয়া ছেড়ে দেয়, তাহলে ইসলামী শাসক যেন ওদের প্রতি চাপ সৃষ্টি করে এবং না মানলে কতল করে। (কাজী খান)

pdf By Syed Mostafa Sakib

আযানের নিয়ম এবং শব্দসমূহঃ

মসজিদের বাইরে উঁচু জায়গায় কিবলামুখী দাঁড়িয়ে উভয় কানের ছিদ্রদ্বয়ে আঙ্গুল রেখে বা কানের উপর হাত রেখে اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর) বলবে। এ দু'শব্দ মিলে একটি বাক্য হলো। পুণরায় সামান্য বিরতি দিয়ে اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর) বলবে। এ দু'শব্দ মিলে আর একটি বাক্য হলো। এরপর দু'বার اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আশহাদু আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহ) বলবে। তারপর দু'বার اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ (আশহাদু আন্না মুহাম্মদার রসূলুল্লাহ) বলবে। তারপর ডান দিকে মুখ ফিরায়ে দু'বার حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ (হায়য়া আলাস সালাত) বলবে এবং বাম দিকে মুখ ফিরায়ে দু'বার حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (হায়য়া আলাল ফালাহ) বলবে। এরপর কিবলার দিকে মুখ করে নিয়ে اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর) বলবে। এটাও একটি বাক্য হলো এরপর একবার لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বলে আযান শেষ করবে। এবার প্রথমে দরূদ শরীফ. অতঃপর এ দ্আটি পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِىْ وَعَدْتَهُ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

(আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ দাওয়াতিত্তাম্মাতে ওয়াসসালাতিল কায়েমাতে আতে সায়্যেদুনা ওয়া মওলানা মুহাম্মদানিল ওয়াছীলাতা ওয়াল ফাদীলাতা ওয়াদ দারজাতার রাফীয়াতা ওয়াবআছহু মাকামাম মাহমুদানিল্লাযী ওয়াআদতাহু ওয়ারযুকনা শাফাআতাহু ইয়াওমুল কিয়ামাতে। ইন্নাকা লা তুখলিফুল মীয়াদ)

মাসআলাঃ ফজরের আযানে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (হায়য়া আলাল ফালাহ) বলার পর দু'বার اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ (আস্সালাতু খায়রুম মিনান নাউম) বলবে। এটা বলা মুস্তাহাব, না বললেও আযান হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ জুমাসহ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায যখন জমাত সহকারে মসজিদে আদায় করা হয়, তখন সেসবের জন্য আযান সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং হুকুম ওয়াজিবের মত অর্থাৎ যদি আযান দেয়া না হয়, তাহলে ওখানকার সমস্ত লোক গুনাহগার হবে। (খানিয়া), হিন্দিয়া, দুর্রুল মুখতাব ও রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ যদি কেউ ঘরে নামায পড়ে এবং আযান না দেয়, তাহলে মকরূহ নয়। কারণ ওর জন্য ওখানকার মসজিদের আযানই যথেষ্ট, কিন্তু দেয়াটা মুস্তাহাব। **মাসআলাঃ** আযানের ওয়াক্ত ওটাই, যা নামাযের ওয়াক্ত।

মাসআলাঃ ওয়াক্ত হওয়ার পর যেন আযান দেয়া হয়। যদি ওয়াক্ত হওয়ার আগে দেয়া হয়, তাহলে ওয়াক্ত হওয়ার পর পুণরায় দিতে হবে। (কাজী খান, শরহে বেকায়া, আলমগীরী, হেদায়া, নেহায়া)

মাসআলাঃ আযানের মুস্তাহাব ওয়াক্ত ওটাই, যা নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত।

মাসআলাঃ যদি প্রথম ওয়াক্ত আযান হয় এবং শেষ ওয়াক্তে নামায হয়, তখন আযানের সুন্নাত আদায় হবে। (দুর্রুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ ফরয নামাযসমূহ ব্যতীত অন্য কোন নামাযের জন্য আযান নেই। বিতর, জানাযা, দুই ঈদ, নযর, সুন্নত, তারাবীহ, ইসতিসকাহ, চাশত, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ ও নফল নামাযসমূহের জন্য আযান নেই। (আলমগীরী ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ মহিলাদের আযান-ইকামত বলা মকরূহ তাহরীমী। যদি আযান দেয়, গুনাহগার হবে এবং ওদের দেয়া আযান পুণরায় দিতে হবে।

মাসআলাঃ মহিলাদের ওয়াক্তিয়া নামায বা কাযা নামাযের জন্য আযান ও ইকামত মকরূহ, যদিওবা জমাত সহকারে আদায় করে বরং ওদের জমাতটাই মকরূহ (দুর্রুল মুখতার ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ বোধশক্তি সম্পন্ন শিশু, অন্ধ ও ওযুবিহীন ব্যক্তির আযান শুদ্ধ। (দুর্রুল মুখতার) তবে ওযুবিহীন আযান দেয়া মকরূহ (মরাকিল ফলাহ)

মাসআলাঃ জুমার দিন শহরে যোহরের জন্য আযান দেয়া নাজায়েয, যদিওবা যোহর আদায়কারীগণ ওজর বিশিষ্ট হয় এবং যাদের উপর জুমা ফরয নয়।

(দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ আযান সেই দিবে, যে নামাযের ওয়াক্তসমূহ সনাক্ত করতে পারে। এবং যে ওয়াক্ত সনাক্ত করতে পারে না, সে মুয়াযযিনের ছওয়াব পাবার উপযোগী নয়। (বাযাযিয়া, আলমগীরী, গুনিয়া, কাজীখান)

মাসআলাঃ যদি মুয়াযযিনই ইমাম হয়ে থাকে, তাহলে উত্তম। (আলমগীরী)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ আযানের মাঝখানে কথাবার্তা বলা নিষেধ। যদি কোন কথা বলে থাকে, তাহলে পূণরায় শুরু থেকে আযান দিবে। (সগীরী)

মাসআলাঃ আযানে সুর হারাম অর্থাৎ গানের মত আযান দেয়া বা اللّٰه আল্লাহর প্রথম অক্ষরকে টেনে আয়াল্লাহ বলা বা اكبر আকবরের প্রথম অক্ষর আলিফকে টেনে আয়াকবর বলা বা اكبر আকবরের 'বাকে' টেনে আকবাআর বলা হারাম। অবশ্য ভাল ও উচ্চ শব্দে আযান দেয়া উত্তম। (হিন্দিয়া, দুরুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ যদি আযান নিম্নস্বরে হয়ে থাকে, তাহলে পূণরায় আযান দিবে এবং এ ক্ষেত্রে প্রথম জমাত উৎকৃষ্ট জমাত নয়। (কাজী খান)

মাসআলাঃ আযান মিনারে বা মসজিদের বাইরে দেয়া হবে। মসজিদের অভ্যন্তরে যেন আযান দেয়া না হয়। (খুলাসা আলমগীরী ও কাজী খাঁ)

আযানের জবাব

আযান শুনলে এর জবাব দেয়া চাই। অর্থাৎ মুয়াযযিন যে বাক্য বলবে সেটা শুনার পর শ্রোতাও সেই বাক্য বলবে। তবে و حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (হায়য়া আলাস সালাত ও হায়য়া আলাল ফালাহ) এর জবাবে لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ (লা হাওলা ওলা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ) বলবে। কিন্তু উভয়টা বলা উত্তম বরং পারলে এটাও বলবে مَاشَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَالَمْ يَشَاءْ لَمْ يَكُنْ (মাশা আল্লাহ কানা ওমা লম এশা লম ইয়াকুন) (রদ্দুল মুহতার, আলমগীরী)

মাসআলাঃ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (আসসালাতু খায়রুম মিনান নাউম) এর জবাবে صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ وَبِالْحَقِّ نَطَقْتَ (সাদাকতা ওয়া বরিরতা ওয়া বিল হক্কে নাতাকতা) বলবে।

(দুরুল মুখতাব, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ অপবিত্র অবস্থায়ও আযানের জবাব দেয়া যাবে। হায়েয ও নেফাসওয়ালী মহিলা, খুতবা শ্রবনকারী, জানাযার নামায আদায়কারী এবং যে সহবাসে রত বা শৌচাগারে আছে,এমন লোকদের জবাব দিতে নেই।

মাসআলাঃ যখন আযান হয়, তখন সেই সময়ের জন্য সালাম, কালাম, সালামের জবাব ও অন্যান্য যাবতীয় কার্যাদি বন্ধ করে দিবে। এমনকি কুরআন

মজীদ তেলাওয়াত করার সময় আযানের আওয়াজ পৌছলে তেলাওয়াত বন্ধ করে দিবে এবং মনোযোগ সহকারে আযান শুনবে ও জবাব দিবে। ইকামতেও অনুরূপ করবে। (দুরুল মুখতার, আলমগীরী) যে আযানের সময় কথাবার্তায় মশগুল থাকে, তার জন্য মাযাল্লা মন্দ পরিসমাপ্তি হওয়ার ভয় আছে।

(ফত্ওয়ায়ে রজভীয়া)

মাসআলাঃ রাস্তা দিয়ে যাবার সময় আযানের আওয়াজ আসলো, আযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে এবং আযান শুনবে ও এর জবাব দিবে।

(আলমগীরী, বাযাযিয়া)

ইকামতের মাসআলাঃ ইকামত আযানের মত অর্থাৎ যে আহকাম আযানের জন্য বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো সব ইকামতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অবশ্য কিছ কিছু বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। যেমনঃ ইকামতে হায়য়া আলাল ফালাহ বলার পর দু'বার قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ (কদকামতিস সালাত) বলতে হয়। একামতে আযানের মত তত উচ্চস্বর করা হয় না বরং উপস্থিত সকলে শুনার মত বললে চলে। ইকামতের বাক্যগুলো তাড়াতাড়ি বলতে হয়, মাঝখানে কোন বিরতি নেই এবং কানে হাত বা আঙ্গুল দিতে হয় না। ফজরের ইকামতে اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (আসসালাতু খায়রুম মিনান নউম) বলতে হয় না।আর ইকামত মসজিদের অভ্যন্তরেই দেয়া হয়।

মাসআলাঃ যদি ইমাম ইকামত বলে, তাহলে কদকামাতিস সালাত বলার সময় অগ্রসর হয়ে ইমামের জায়নামাযে চলে যাবে।

(দুরুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার, গুনীয়া, আলমগীরী ইত্যাদি)

মাসআলাঃ ইকামতের সময়ও হায়য়া আলাস সালাত ও হায়য়া আলাল ফালাহ বলার সময় ডান দিকে বামদিকে মুখ ফিরাবে। (দুরুল মুখতার)

মাসআলাঃ ইকামতের সময় কোন ব্যক্তি আসলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা মকরূহ বরং বসে যাবে। যখন 'হায়য়া আলাল ফালাহ' বলবে তখন দাড়িয়ে যাবে। অনুরূপ যে সব লোক আগে থেকে মসজিদে মওজুদ থাকে, তাঁরাও বসে থাকবেন। যখন মুকাব্বির 'হায়য়া আলাল ফালাহ' বলবে, তখন দাঁড়াবে। ইমামের জন্যও একই হুকুম। (আলমগীরী) আজকাল এটা প্রায় জায়গায় রেওয়াজ হয়ে গেছে যে ইকামতের সময় সবলোক দাঁড়িয়ে থাকে বরং অনেক জায়গায় ইমাম জায়নামাযের উপর না দাঁড়ালে ইকামত দেয়া হয়না। এটা সুন্নাতের বিপরীত।

মাসআলাঃ আযান বা ইকামতের মাঝখানে কথা বলা নাজায়েয। যদি মুয়াযযিন বা মুকাব্বিরকে কেউ সালাম করে, তাহলে এর জবাব দিবে না এবং শেষ

pdf By Syed Mostafa Sakib

হবার পরও জবাব দেয়া ওয়াজিব নয় (আলমগীরী)

মাসআলাঃ ইকামতের জবাব মুস্তাহাব। এর জবাবও আযানের জবাবের মত। শুধু এতটুকু পার্থক্য রয়েছে যে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ (কদকামতিস সালাত) এর জবাবে اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ বলবে (আলমগীরী) অথবা اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا وَجَعَلَنَا مِنْ صَالِحِىْ اَهْلِهَا اَحْيَاءً وَّاَمْوَاتًا বলবে (বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ যদি আযান দেয়ার সময় জবাব দেয়া না হয়, তাহলে বেশী দেরী না হলে পরক্ষণ দিয়ে নিবে। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ মুখ দিয়ে খুতবার আযানের জবাব দেয়া মুক্তাদীদের জন্য জায়েয নেই। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ আযান ও ইকামতের মাঝখানে বিরতি সুন্নাত। আযান দেয়ার সাথে সাথে ইকামত দেয়া মকরূহ । মাগরিবের সময় বিরতিটা তিনটি ছোট আয়াত বা একটি বড় আয়াত পড়ার বরাবর যেন হয়। এবং অন্যান্য নামাযে আযান ও ইকামতের মাঝখানে ততক্ষণ পর্যন্ত যেন অপেক্ষা করে, যাতে জমাতের পাবন্দ লোকেরা এসে যায়। কিন্তু মকরূহ সময় এসে যাওয়া পর্যন্ত দেরী করা যাবে না।

নামাযের চতুর্থ শর্তের বর্ণনা

নামাযের চতুর্থ শর্ত হচ্ছে ইসতিকবালে কিবলা অর্থাৎ কাবা শরীফের দিকে মুখ করা।

মাসআলাঃ নামায যেন আল্লাহর জন্যই পড়া হয় এবং সিজদা যেন তাঁকেই করা হয়। কিন্তু কাবাকে নয়। খোদা না করুক, যদি কেউ কাবাকে উদ্দেশ্য করে সিজদা করে, সে হারাম ও গুনাহে কবীরা করলো। আর যদি কাবার ইবাদতের নিয়তে করে, তাহলে নিঃসন্দেহে কাফির। কারণ, খোদা ভিন্ন অন্য কারো ইবাদত কুফর। (দুর্রে মুখতার), ফতওয়ারে রেজভীয়া)

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি কেবলার দিকে মুখ করতে অপারগ, সে যেদিক হয়ে পারে, সেদিক হয়ে নামায পড়ে নিবে। এবং পরে নামায পুণরায় পড়ার প্রয়োজন নেই। (মুনীয়া)

মাসআলাঃ অসুখের কারণে কাবার দিকে মুখ করার শক্তি নেই এবং সেখানে এমন কেউ নেই যে ওর মুখ কাবার দিকে করে দিবে, তখন যেদিক হয়ে পড়ুক না কেন, নামায হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ কারো কাছে নিজের বা আমানতের জিনিষ রয়েছে এবং সে জানে যে কিবলার দিকে হলেই চুরি হয়ে যাবে। তখন সে যে দিকে ইচ্ছে পড়ে নিবে।

মাসআলাঃ এমন দুষ্ট প্রকৃতির পশুর উপর আরোহন করা হয়েছে যে অবতরণ করতে দেয় না বা অবতরণ করা সম্ভব হলেও সাহায্যকারী ব্যতীত আরোহন করা সম্ভব নয় বা এমন বৃদ্ধ যে নিজে পুণরায় আরোহন করতে অক্ষম এবং আরোহন করানোর মতও কেউ নেই, তখন যেদিক হয়েই নামায পড়ুক না কেন, নামায হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ যদি বাহন থামানো যায়, তাহলে থামিয়ে নামায পড়বে এবং সম্ভব হলে কিবলার দিকে মুখ করবে। অন্যথায় যেভাবে সম্ভব সেভাবে পড়বে। যদি বাহন থামানোর ফলে কাফেলা দৃষ্টির আগোচরে চলে যাবে বলে মনে হয়, তাহলে বাহন থামানোরও কোন প্রয়োজন নেই, চলমান অবস্থায় পড়বে। (রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ চলমান নৌকায় নামায পড়তে হলে, তকবীর তাহরীমা বলার সময় কিবলার দিকে মুখ করবে এবং নৌকা যখন যেদিকে ঘুরবে, নিজেও কিবলার দিকে মুখ ফিরায়ে নিবে। সেটা ফরয নামায হোক বা নফল। (গুনীয়া)

মাসআলাঃ যদি কিবলা জানা না থাকে এবং বলার মতও কেউ না থাকে, তাহলে চিন্তা করবে এবং মনের মধ্যে যে দিকের ধারণাটা দৃঢ় হবে, সেদিকেই নামায পড়বে। ওর জন্য সেটাই কিবলা। (মুনীয়া)

চিন্তাভাবনা করে নামায পড়ার পর জানতে পারলো যে কিবলার দিক হয়ে নামায পড়া হয়নি, তখন নামায পুণরায় পড়ার প্রয়োজন নেই; নামায হয়ে যাবে।

(মুনীয়া)

মাসআলাঃ চিন্তা ভাবনা করে নামায পড়তেছিল এবং নামাযরত অবস্থায় এমন কি সিজদায়ে সহুর সময়ও যদি মত পরিবর্তন হয়ে গেল বা ভুল বুঝতে পারলো, তখন সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যাওয়া ফরয এবং এর আগে যা পড়া হয়েছে সেটার কোন ক্ষতি হবে না। এভাবে চারদিক হয়ে চার রাকাত পড়া হলেও জায়েয। আর যদি সঙ্গে সঙ্গে ফিরে না যায় বা তিন বার সুবহানাল্লাহ পড়ার বরাবর দেরী করে, তাহলে নামায হবে না। (দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ নামাযী বিনা কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে কিবলার দিক থেকে মুখ ফিরালো এবং সঙ্গে সঙ্গেই কিবলার দিকে হয়ে গেলেও নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে ফিরে গেল এবং তিন তসবীহ পরিমাণ বিলম্ব হয় নি, তাহলে নামায হয়ে যাবে (মুনীয়া, বাহার)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ যদি শুধু মুখটা কিবলার দিক থেকে ফিরানো হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে কিবলার দিকে করে নেয়া ওয়াজিব। নামায ভঙ্গ হবে না, তবে বিনা কারণে মুখ ফিরানো মকরূহ (মুনীয়া)

পঞ্চম শর্ত-নিয়তের বর্ণনা

নিয়ত বলতে মনের দৃঢ় ইচ্ছাকে বুঝানো হয়। কেবল ধ্যান ধারণা যথেষ্ট নয় ইচ্ছাই প্রধান।

মাসআলাঃ যদি নিয়ত মুখেও বলা হয়, তাহলে ভাল। যেমন আমি আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে কিবলার দিকে মুখ করে দু'রাকাআত ফজরের ফরয নামায পড়ার নিয়ত করলাম, আল্লাহ আকবর।

মাসআলাঃ মুক্তাদীর জন্য ইকতেদার নিয়তও প্রয়োজন।

মাসআলাঃ ইমাম যদি ইমাম হওয়ার নিয়ত না করে তবুও তাঁর পিছনে মুক্তাদীগণের নামায বিশুদ্ধ হবে, কিন্তু জমাতের ছওয়াব পাবে না।

মাসআলাঃ জানাযার নামাযের নিয়ত হচ্ছেঃ আমি আল্লাহর জন্য নামায ও মৃতের জন্য দুআর নিয়ত করলাম, আল্লাহ আকবর।

নামাযের ষষ্ঠ শর্তের বর্ণনা

নামাযের ষষ্ঠ শর্ত হচ্ছে তকবীর তাহরীমা অর্থাৎ নিয়তের সময় যে আল্লাহ আকবর বলা হয়, সেটাকে তকবীর তাহরীমা বলে। এ তকবীর বলার সাথে সাথে নামায শুরু হয়ে যায় এবং এটা ফরয। এটা ব্যতীত নামায শুরু হয় না।

মাসআলাঃ মুক্তাদী যদি ইমামের আগে তকবীর তাহরীমা বলে ফেলে, তাহলে জমাতের অন্তর্ভুক্ত হলো না।

নামাযের ছয়টি শর্ত অর্থাৎ পবিত্রতা, সতর, ওয়াক্ত, ইসতিকবালে কিবলা, নিয়ত ও তকবীর তাহরীমার মাসআলাসমূহ বর্ণনা করার পর এবার নামায পড়ার নিয়ম বর্ণিত হচ্ছে।

নামাযের নিয়ম

নামায পড়ার নিয়ম হচ্ছে ওযুসহকারে কিবলা মুখী হয়ে এভাবে দাঁড়াবে যেন দুই পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুলের মত ফাঁক থাকে এবং দুই হাত কান পর্যন্ত

নিয়ে গিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় কানের লতিতে লাগাবে এবং অন্যান্য আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ একেবারে মিলায়ে বা প্রসারিত করে রাখা হবে না। তখন হাতের তালু যেন কিবলার দিকে এবং দৃষ্টি সিজদার জায়গার দিকে থাকে। অতঃপর যে ওয়াক্তের নামায পড়া হয়, সেটার দৃঢ় নিয়ত করে আল্লাহু আকবর বলে হাত নীচে নামিয়ে নাভীর নীচে এমনভাবে বাঁধবে যে ডান হাতের তালু বাম হাতের কব্জির উপর স্থাপন করে মাঝখানের তিন আঙ্গুল কব্জির পিঠের উপর রেখে বৃদ্ধাঙ্গুল ও কনিষ্ঠাঙ্গুল দ্বারা কব্জিকে জড়িয়ে ধরবে। এরপর এ ছানা (দুআ) পড়বেঃ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

(সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবা রাকাসমুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা) অতঃপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ে সূরা ফাতিহা পড়বে এবং পড়া শেষ হলে নিম্নস্বরে আমীন বলবে। এরপর যে কোন সূরা বা মোট তিন আয়াত বা তিন আয়াত সমতুল্য এক আয়াত পাঠ করবে। এবার আল্লাহু আকবর বলে রুকুতে যাবে এবং হাত দ্বারা এমনভাবে হাঁটু ধরবে যেন হাতের তালু হাঁটুর উপর থাকে এবং আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে থাকে। পিঠ সোজা থাকবে এবং মাথা পিঠের বরাবর হবে। উঁচু নীচু যেন না হয় এবং দৃষ্টি পায়ের দিকে থাকবে এবং কমপক্ষে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ (সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম) পড়ার পর سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ (সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা) বলে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। এবং যে একাকী হবে, সে এরপর বলবে اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ) পুণরায় আল্লাহু আকবর বলে এমনভাবে সিজদায় যাবে যে প্রথমে হাঁটু জমীনে রাখবে, এরপর হাত, অতঃপর উভয় হাতের মাঝখানে এমনভাবে মাথা রাখবে যে প্রথমে নাক, পরে মাথা স্থাপন করবে। নাকের মাথা জমীনে লেগে থাকবে এবং দৃষ্টি নাকের দিকে থাকবে। বাহু পার্শ্ব থেকে, পেট রান থেকে এবং রান পায়ের গোছা থেকে পৃথক রাখবে এবং উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে থাকবে এবং আঙ্গুলসমূহের পেট জমীনে লেগে থাকবে। হাতের তালু বিছানো থাকবে এবং আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে থাকবে এবং তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى (সুবহানা রাব্বিয়াল আলা) পড়বে। অতঃপর এমনভাবে মস্তক উত্তোলন করবে যেন প্রথমে মাথা, পরে যথাক্রমে নাক, মুখ, হাত উঠাবে এবং ডান পা দাঁড় করিয়ে আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখি করে রাখবে এবং বাম পা বিছায়ে এর উপর ভালমতে সোজা হয়ে বসবে এবং হাতের তালু বিছায়ে রানের উপর হাঁটুর কাছে এমনভাবে রাখবে যেন উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে থাকে এবং আঙ্গুল সমূহের মাথা যেন হাঁটুর কাছে থাকে। পুণরায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আল্লাহু আকবর

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলে দ্বিতীয় সিজদা করবে। এ সিজদাটাও প্রথম সিজদার মত। এরপর মাথা উঠায়ে এবং হাত হাঁটুর উপর রেখে তালুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। দাঁড়ানোর সময় বিনা কারণে হাত জমীনে রাখবে না। এ ভাবে এক রাকাত পূর্ণ হয়ে গেল। এবার পুণরায় কেবল বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে আলহামদু ও অন্য একটি সূরা পড়বে এবং প্রথম রাকাতের মত রুকু ও সিজদা করবে। এবং দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উঠায়ে ডান পা দাঁড় করায়ে এবং বাম পা বিছায়ে বসে যাবে এবং এ দুআটি পড়বেঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَاالنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآاِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۔

(আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহে ওয়াস্সালাওয়াতু ওয়াত্তয়্যেবাতু আচ্ছালামু আলাইকা আইয়্যুহান নবিয়্যু ওয়া রাহমতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালেহীন। আশহাদু আললা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।) এ দুআকে তাশাহুদ বলা হয়। যখন 'লা' শব্দের নিকটবর্তী হবে, তখন ডান হাতের মাঝের আঙ্গুল ও বৃদ্ধাঙ্গুল গোলাকার করে কণিষ্ঠাঙ্গুল ও এর পাশের আঙ্গুল তালুর সাথে লাগাবে এবং 'লা' বলার সাথে সাথে শাহাদত আঙ্গুল উঠাবে কিন্তু এদিক সেদিক নাড়াচাড়া করবে না এবং 'ইল্লা' বলার সাথে সাথে নামিয়ে ফেলবে এবং অন্যান্য আঙ্গুলগুলো সোজা করে ফেলবে। এবার যদি দুরাকাত থেকে বেশী পড়তে হয়, তাহলে দাঁড়িয়ে যাবে এবং আগের মত পড়বে। কিন্তু ফরয নামাযের বেলায় পরবর্তী রাকাতসমূহে আল হামদুর সাথে অন্য সূরা পড়ার প্রয়োজন নেই। শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর এ দরুদ শরীফ পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

(আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলা আলে মুহাম্মদিন কামা ছাল্লাইতা আলা ইব্রাহীম ওয়া আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলা আলে মুহাম্মদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ)

এর পর পড়বে

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ تَوَالَدَ وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ اِنَّكَ مُجِيْبُ الدَّعْوَاتِ

বা অন্য কোন দুআয়ে মাছুরা পড়বে বা এটা পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতে না ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আখেরাতে হাসানাতাঁও ওকে না আযাবান নার) এ দুআটা আল্লাহুম্মা ছাড়া যেন পড়া না হয়। এরপর ডানদিকে মুখ করে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ (আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ) বলবে। অনুরূপ বাম দিকে মুখ ফিরায়েও বলবে। এখন নামায শেষ হয়ে গেল। এবার হাত উঠায়ে যে কোন একটি মুনাজাত করবে যেমনঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখেরাতে হাসানাতাঁও ওকেনা আযাবুন নার) এবং মুখের উপর হাত বুলায়ে নিবে। উল্লেখিত নিয়মটা হচ্ছে ইমাম বা একাকী নামায আদায়কারীর জন্য। কিন্তু নামাযী যদি মুক্তাদী হয় অর্থাৎ জমাত সহকারে ইমামের পিছনে নামায পড়ে, তখন কোন কিরাত পড়বে না অর্থাৎ আলহামদু ও অন্য সূরা না পড়া চাই। ইমাম কিরাত জোরে পড়ুক বা আস্তে পড়ুক, ইমামের পিছনে কোন নামাযে কিরাত পড়া জায়েয নেই। আর যদি নামাযী মহিলা হয়, তাহলে তকবীর তাহরীমার সময় কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে এবং বাম হাতের তালু বুকের উপর স্তনের নীচে রেখে ওটার উপর ডান হাতের তালু রাখবে। রুকুতে সামান্য ঝুঁকবে অর্থাৎ এতটুকু ঝুঁকবে যে হাঁটুর উপর হাত রাখবে, জোর দিবে না এবং হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলায়ে রাখবে এবং পিঠ ও পা একটু ঝুকিয়ে রাখবে। পুরুষদের মত বেশী সোজা করবে না এবং সিজদায় লেপটে সিজদা দিবে অর্থাৎ বাহু পাঁজরের সাথে মিলায়ে রাখবে এবং পেট রানের সাথে এবং রান পায়ের গোছার সাথে এবং পায়ের গোছা জমীনের সাথে লাগিয়ে রাখবে এবং উভয় পা পিছনে বের করে দিবে। বৈঠকের সময় উভয় পা ডান দিকে বের করে দিবে এবং বাম পাছার উপর বসবে এবং হাত রানের মাঝখানে রাখবে।

এযে নিয়ম বর্ণিত হলো, এর মধ্যে কতেক বিষয় ফরয, যেগুলো ব্যতীত নামায হবেই না। কতেক ওয়াজিব, যেগুলো ইচ্ছেকৃত তাগ করা গুনাহ এবং নামায

বিঃ দ্রঃ হযরত ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) ফরমান, যখন তাশাহুদ পড়ার জন্য বসবে, তখন যেন রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর মুবারক আকৃতিকে মনের মধ্যে জাগ্রত করে এবং হুযুরের খ্যান অন্তরে বদ্ধমুল করে পাঠ করবে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে এ সালাম হুযুরের কানে পৌছে এবং হুযুর এর থেকে বাড়িয়ে অবাব দেন। (ইহইয়াহে উলুম)

pdf By Syed Mostafa Sakib

পূণরায় পড়া ওয়াজিব এবং অনিচ্ছাকৃত ত্যাগ করলে সিজদায়ে সুহু ওয়াজিব আর কতেকগুলো সুন্নাতে মুয়াককাদা, যেগুলো নিয়মিত বাদ দেয়া গুনাহ এবং কতেকগুলো মুস্তাহাব, যেগুলো করলে ছওয়াব আর না করলে গুনাহ নেই।

নামাযের ফরযসমূহঃ নামাযের মধ্যে সাতটি ফরয রয়েছেঃ (১) তকবীরে তাহরীমা অর্থাৎ প্রথম আল্লাহ আকবর যেটা দ্বারা নামায শুরু হয়। (২) কিয়াম অর্থাৎ ফরয কিরাত আদায় করা পর্যন্ত যতক্ষণ সময় লাগে, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা। (৩) কিরাত অর্থাৎ কমপক্ষে এক আয়াত পড়া। (৪) রুকু অর্থাৎ এতটুকু ঝুঁকা যে হাত বাড়ালে যেন হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যায়। (৫) সিজদা অর্থাৎ মাথাকে জমীনে এমনভাবে লাগানো যে, কমপক্ষে পায়ের একটি আঙ্গুলের পেট যেন নামাযের জায়গার সাথে লেগে থাকে। (৬) শেষ বৈঠক অর্থাৎ নামাযের রাকাতসমূহ পূর্ণ করার পর পুরা তাশাহুদ পড়ার পরিমাণ সময় বসা। (৭) কর্ম করে নামায ভঙ্গ করা অর্থাৎ শেষ বৈঠকের পর নিজের ইচ্ছা ও কর্ম দ্বারা নামায শেষ করা। এ শেষ কর্মটা সালাম–কালামও হতে পারে বা অন্য কোন কাজ দ্বারাও হতে পারে।

নামাযের ওয়াজিবসমূহঃ তকবীর তাহরীমায় 'আল্লাহ আকবর' বলা, পুরা আলহামদু শরীফ পড়া, সূরা বা আয়াত মিলানো, ফরয নামাযে প্রথম দুরাকাতে কিরাত পড়া, আলহামদু ও এর সাথে অন্য সূরা বা আয়াত মিলানো (ফরযের দুরাকাতে এবং নফল, বিতর ও সুন্নাতের প্রত্যেক রাকাতে কিরাত ওয়াজিব আলহামদু ও সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ ও আমীন ব্যতীত অন্য কিছু না পড়া কিরাত শেষ করার সাথে সাথেই রুকু করা,প্রথম সিজদার পর দ্বিতীয় সিজদা হওয়া যেন দু সিজদার মাঝখানে অন্য কোন রোকন আসতে না পারে। তাদিলে আরকান অর্থাৎ রুকু, সিজদা, কাউমা, জলসায় কমপক্ষে একবার সুবহানাল্লাহ বলার বরাবর অপেক্ষা করা।

কাউমা অর্থাৎ রুকু থেকে সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়া। সিজদায় উভয় পায়ের তিন তিন আঙ্গুলের পেট নামাযের জায়গায় লেগে থাকা। জলসা অর্থাৎ দু সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা। প্রথম বৈঠক,যদিওবা নফল নামাযের হয়ে থাকে। ফরয, বিতর ও সুন্নাত নামাযের প্রথম বৈঠকে তাশাহুদের পর কিছু না পড়া, উভয় বৈঠকে পূর্ণ তাশাহুদ পড়া, অনুরূপ যত বৈঠক করতে হয়, প্রত্যেক বৈঠকে পূর্ণ তাশাহুদ পড়া ওয়াজিব। যদি এর একটি শব্দও বাদ পড়ে, তাহলে ওয়াজিব তরক হিসেবে গণ্য হবে। উভয় সালামে কেবল 'আস–সালাম' বলা ওয়াজিব। 'আলাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহ' বলা ওয়াজিব নয়। বিতরে দুআয়ে কুনুত

তকবীরে তাহরীমায় আল্লাহ আকবর বলা ফরয নয়। আল্লাহর ঘাস তাজীম বোধক শব্দ হওয়াটাই ফরয। যথাঃ আল্লাহ আযম, আল্লাহ কবীর, আররহমনু আকবর বললেও ফরজ আদায় হয়ে যাবে। তবে এ পরিবর্তনটা মকরুহ তাহরীম।

পড়া, কুনুতের জন্য তকবীর বলা, দুই ঈদের ছয় তকবীর, দুই ঈদে দ্বিতীয় রাকাতের রুকুর তকবীর এবং সেই তকবীরের জন্য 'আল্লাহ আকবর' বলা, উচ্চস্বরের নামাযে ইমামের উচ্চস্বরে কিরাত পড়া এবং নিম্নস্বরের নামাযে নিম্নস্বরে কিরাত পড়া। প্রত্যেক ফরয ও ওয়াজিব যথাস্থানে আদায় করা, প্রত্যেক রাকাতে রুকু একবার ও সিজদা দুবার হওয়া, দ্বিতীয় রাকাতের আগে বৈঠক না করা,আয়াতে সিজদা পড়লে তেলাওয়াতে সিজদা দেয়া, সহু হলে সিজদায়ে সহু দেয়া, দুফরয বা ওয়াজিব অথবা ওয়াজিব ও ফরযের মাঝখানে তিনবার সুবহানাল্লাহ বলার বরাবর দেরী না হওয়া, ইমাম যখন কিরাত পড়ে, উচ্চস্বরে হোক বা নিম্নস্বরে, সেই সময় মুক্তাদীর নিশ্চুপ থাকা। কিরাত ব্যতীত সমস্ত ওয়াজিবে ইমামের অনুসরণ করা, ফরয ও ওয়াজিবসমূহ ব্যতীত যেসব বিষয় নামাযের নিয়মে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সুন্নাত হোক বা মুস্তাহাব,তা যেন ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ না দেয়। তবে যদি ভুলবশতঃ বাদ পড়ে যায়, সিজদায়ে সহু বা নামায পুণরায় পড়ার প্রয়োজন নেই। যদি পুণরায় পড়া হয়, তাহলে উত্তম। সুন্নাত ও মুস্তাহাবসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে, বাহারে শরীয়ত, ফতওয়ায়ে রেজভীয়া দেখুন। সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে এবং মুখস্থ করার সুবিধার্থে এখানে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়নি।

সিজদায়ে সহুর বর্ণনা

যে সব বিষয় নামাযে ওয়াজিব, ওগুলো থেকে যদি কোন ওয়াজিব ভুলে বাদ পড়ে, তাহলে ঘাটতি পূর্ণ করার জন্য সিজদায়ে সহু ওয়াজিব। এ সিজদা দেয়ার নিয়ম হচ্ছে শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ার পর ডান দিকে সালাম ফিরায়ে দুটি সিজদা করবে এবং পুণরায় শুরু থেকে তাশাহুদ ইত্যাদি পড়ে সালাম ফিরাবে।

মাস্আলাঃ যদি কোন ওয়াজিব বাদ পড়ে এবং এর জন্য সিজদায়ে সহু না করে এবং এভাবে নামায শেষ করে ফেলে, তাহলে নামায পুণরায় পড়া ওয়াজিব।

মাস্আলাঃ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ওয়াজিব বাদ দেয়, তাহলে সিজদায়ে সহু যথার্থ নয় বরং নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব।]

মাস্আলাঃ যে সব বিষয় নামাযে ফরয, যদি ওগুলো থেকে কোন বিষয় বাদ পড়ে, তাহলে নামায হবে না এবং সিজদায়ে সহুর দ্বারা এ ঘাটতি পূর্ণ করা যাবে না, বরং পুনরায় পড়া ফরয।

মাসআলাঃ ওসব বিষয় যেগুলো নামাযে সুন্নাত বা মুস্তাহব যেমন আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আমীন, শেষ তকবীর, তসবীহ সমূহ, এগুলো বাদ পড়লেও

pdf By Syed Mostafa Sakib

সিজদায়ে সহ ওয়াজিব নয়, বরং নামায হয়ে যাবে।

(রদ্দুল মুহতার, গুনীয়া) তবে নামায পুনরায় পড়ে নেয়া ভাল।

মাসআলাঃ যদি এক নামাযে কয়েকটা ওয়াজিব বাদ পড়ে, তাহলে সবের জন্য সিজদায়ে সহ একবারই যথেষ্ট, কয়েকবার সিজদায়ে সহুর প্রয়োজন নেই। (রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ প্রথম বৈঠকে পূর্ণ তাশাহুদ পড়ার পর তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াতে যদি ততক্ষণ দেরী করে, যতক্ষণ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ (আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহাম্মদ) পড়তে লাগে, তাহলে সিজদায়ে সহ ওয়াজিব। কিছু পড়ুক বা নিশ্চুপ থাকুক, উভয় অবস্থায় সিজদায়ে সহ ওয়াজিব।

(দুরুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ কিরাত ইত্যাদি পড়ার সময় চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল এবং তিনবার 'সুবহানাল্লাহ' বলতে পারার মত দেরী হয়ে গেল, তাহলে সিজদায়ে সহ-ওয়াজিব। (রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ দুরাকাতকে চার রাকাত মনে করে সালাম ফিরানোর পর স্মরণ হলো, তাহলে নামায পূর্ণ করে যেন সিজদায়ে সহ করে। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ তাদীলে আরকান অর্থাৎ যথাযতভাবে নামায আদায় করতে ভুলে গেলে সিজদায়ে সহ ওয়াজিব। (হিন্দীয়া)

মাসআলাঃ মুক্তাদী তাশাহুদ শেষ করার আগেই ইমাম তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে গেল। এ ক্ষেত্রে মুক্তাদীর জন্য তাশাহুদ পূর্ণ করে দাঁড়ানো ওয়াজিব, যদিওবা বিলম্ব হয়।

মাসআলাঃ মুক্তাদী রুকু বা সিজদায় তিনবার তসবীহ পাঠ করার আগেই ইমাম মাথা উঠায়ে ফেলছেন, তাহলে মুক্তাদীও মাথা উঠায়ে ফেলবে এবং অবশিষ্ট তসবীহ বাদ দিবে।

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি ভুলে প্রথম বৈঠক করেনি এবং তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল, সে ব্যক্তি যদি এতটুকু দাঁড়ায় যে বৈঠকের কাছাকাছি আছে, তাহলে বসে যাবে, নামায শুদ্ধ হবে এবং সিজদায়ে সহও প্রয়োজন হবে না। আর যদি এতটুকু উঠে যায় যে দাঁড়ানোর কাছাকাছি হয়ে গেছে, তাহলে দাঁড়িয়ে যাবে এবং শেষে সিজদায়ে সহ করবে। (শরহে বেকায়া, হেদায়া ইত্যাদি)

মাসআলাঃ যদি শেষ বৈঠক করার কথা ভুলে যায় এবং দাঁড়িয়ে গেল, তাহলে সেই রাকাতের সিজদা করার আগে স্মরণ হলে সেটা বাদ দিয়ে বসে যাবে এবং নামায পূর্ণ করবে এবং সিজদায়ে সহও আদায় করবে। আর যদি সেই রাকাতের

সিজদা করে ফেলে, তাহলে ফরয নামায বাতিল হয়ে যাবে। যদি ইচ্ছে করে মাগরিব ভিন্ন অন্য নামাযে আরও এক রাকাত পড়বে এবং সবগুলো নফল হয়ে যাবে। ফরয পুনরায় পড়বে। (হেদায়া শরহে বেকায়া ইত্যাদি)

মাসআলাঃ যদি শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ে ভুলে দাঁড়িয়ে গেল, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই রাকাতের সিজদা না করে থাকে, বসে যাবে এবং বসে সালাম ফিরায়ে সিজদায়ে সহ করবে। আর যদি সেই রাকাতের সিজদা করে ফেলে তখনও ফরয আদায় হবে, তবে আর এক রাকাত পড়বে এবং সিজদায়ে সহ করবে। এ শেষের দুরাকাত নফল হয়ে যাবে। অবশ্য মাগরিবের সময় আর এক রাকাত মিলাবে না। (হেদায়া, শরহে বেকায়া ইত্যাদি)

মাসআলাঃ যদি এক রাকাতে তিন সিজদা করে বা দু'রুকু করে বা প্রথম বৈঠক ভুলে গেল, তাহলে সিজদায়ে সহ করবে।

মাসআলাঃ দাঁড়ানো, রুকু, সিজদা ও শেষ বৈঠক তরতীবের সাথে অর্থাৎ যথা নিয়মে আদায় করা ফরয। সুতরাং যদি দাঁড়ানোর আগে রুকু করে নিল, অতঃপর দাঁড়ালো, তাহলে এ রুকু হবে না। যদি দাঁড়ানোর পর পুনরায় রুকু করে,তাহলে নামায হয়ে যাবে, অন্যথায় হবে না। অনুরূপ রুকুর আগে সিজদা করা হলে পুনরায় রুকু করে যদি সিজদা করা হয়, তাহলে নামায হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ কিয়াম (দাঁড়ানো), রুকু, সিজদা এবং শেষ বৈঠক তরতীবের সাথে অর্থাৎ যথা নিয়মে আদায় করা ফরয। অর্থাৎ আগেরটা আগে ও পরেরটা পরে হওয়া চাই। যদি আগেরটা পরে ও পরেরটা আগে হয়ে যায়, তাহলে নামায হবে না। যেমন কেউ রুকুর আগে সিজদা করে নিল, তাহলে নামায হলো না। তবে যদি সিজদার পর পুনরায় রুকু করে অতঃপর সিজদা করে অর্থাৎ পুনরায় তরতীব পালন করে নিলে, নামায হয়ে যাবে, অন্যথায় হবে না। অনুরূপ যদি দাঁড়ানোর আগে রুকু করে নেয়, তাহলে নামায হবে না। অবশ্য দাঁড়ানোর পর পুনরায় রুকু করলে, আদায় হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ নফলের প্রত্যেক বৈঠক শেষ বৈঠক অর্থাৎ ফরয। যদি বৈঠক না করে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই রাকাতের সিজদা না করে থাকে, বৈঠকে ফিরে যাবে এবং সিজদায়ে সহ আদায় করবে। ওয়াজিব নামায যেমন বিতর–এর বেলায় ফরয নামাযের হুকুমই প্রযোজ্য। সুতরাং যদি বিতরের প্রথম বৈঠকের কথা ভুলে যায়, তাহলে এর জন্য সেই হুকুম প্রযোজ্য, যা ফরয নামাযে প্রথম বৈঠক ভুলে গেলে করতে হয়। (দুরুল মুখতার)

মাসআলাঃ দুআ কুনুত বা কুনুতের তকবীর ভুলে গেল, তাহলে সিজদায়ে সহ করবে। কুনুতের তকবীর বলতে সেই তকবীরকে বোঝানো হয়েছে, যেটা

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিরাতের পর দুআয়ে কুনুত পড়ার জন্য বলা হয়। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ দুই ঈদের সব তকবীর ভুলে গেল বা কতেক ভুলে গেল অথবা অতিরিক্ত বললো বা যথাস্থানে বললো না, তাহলে এসব ক্ষেত্রে সিজদায়ে সহ্ ওয়াজিব।

তিলাওয়াতে সিজদা

তিলাওয়াতে সিজদা হচ্ছে সেই সিজদা যেটা আয়াতে সিজদা পড়া বা শুনার দ্বারা ওয়াজিব হয়ে যায়। এটা আদায় করার সুন্নাত সম্মত নিয়ম হচ্ছে দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবর বলে সিজদায়ে যাওয়া এবং কমপক্ষে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى (সুবহানা রাব্বিয়াল আলা) পড়া, অতপর আল্লাহু আকবর বলে দাঁড়িয়ে যাওয়া।

মাসআলাঃ তিলাওয়াতে সিজদায় আগে পরে দুই বারই আল্লাহু আকবর বলা সুন্নাত এবং প্রথমে দাঁড়িয়ে সিজদায় যাওয়া ও সিজদার পর দাঁড়িয়ে যাওয়া এ দুনো দাঁড়ানো মুস্তাহাব। (আলমগীরী, দুরুল মুখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ যদি তিলাওয়াতে সিজদার আগে দাঁড়ালো না বা আল্লাহু আকবর বললো না অথবা 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' পড়লো না, তবুও সিজদা আদায় হয়ে যাবে, তবে তকবীর বাদ দেয়া অনুচিত। কারণ তা পূর্বসূরী মনীষীদের নিয়মের বিপরীত। (আলমগীরী, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ তিলাওয়াতে সিজদার জন্য আল্লাহু আকবর বলার সময় হাত উঠাতে হয়না এবং এতে তাশাহুদ, সালাম কোনটাই নেই। (তনবীর ও বাহার)

মাসআলাঃ সম্পূর্ণ কুরআনে চৌদ্দটি আয়াতে তিলাওয়াতে সিজদা আছে। এ সবের মধ্যে থেকে যে আয়াতই পড়া হবে, পাঠকারী ও শ্রবনকারী উভয়ের উপর সিজদা ওয়াজিব হয়ে যাবে। শ্রোতাগণ শুনার ইচ্ছে করুক বা না করুক, শুনলেই সিজদা দিতে হবে।

মাসআলাঃ তিলাওয়াতে সিজদার জন্য তকবীর তাহরীমা ব্যতীত ও সমস্ত শর্ত সমূহ অপরিহার্য যা নামাযের জন্য নির্ধারিত, যেমন পবিত্রতা, কিবলা মুখী, নিয়ত, সময়, সতর। সুতরাং পানি পাওয়া গেলে তায়াম্মুম করে সিজদা জায়েয নেই। (দুরুল মুখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ যদি আয়াতে সিজদা নামাযে পড়া হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে নামাযেই তিলাওয়াতে সিজদা আদায় করা ওয়াজিব এবং দেরী করলে গুনাহগার হবে। **দেরী করা** বলতে তিন আয়াত থেকে অধিক পাঠ করার সময়কে বুঝানো হয়। তবে যদি সুরার শেষে সিজদা থাকে, তাহলে সুরা পূর্ণ করে সিজদা করলে কোন

ক্ষতি নেই। যেমন সুরা ইনশেকাকে সুরা শেষ করে সিজদা করলেও কোন ক্ষতি নেই।

মাসআলাঃ আয়াতে সিজদা নামাযে পড়া হল এবং সিজদা করার কথা ভুলে গেল, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত হুরমতে নামাযে থাকবে, সিজদা করে নিবে (যদিও বা সালাম ফিরায়ে ফেলা হয়) এবং সিজদায়ে সহুও আদায় করবে। (হুরমতে নামায বলতে এ রকম কোন কাজ না করাকে বুঝায়, যা নামাযের বিপরীত। যেমন ওযু ভঙ্গ করা, পানাহার করা বা কথা বলা। যদি ওযু ভঙ্গ না করে, কোন কিছু পানাহার না করে, কোন কথা না বলে তাহলে সালাম ফিরানোর পরও হুরমতে নামাযের অন্তর্ভুক্ত থাকে।)

মাসআলাঃ নামাযে আয়াতে সিজদা তিলাওয়াত করলে, এর সিজদা নামাযেই আদায় করা ওয়াজিব, নামাযের বাহিরে আদায় করা যায় না। যদি ইচ্ছাকৃত না করে থাকে, তাহলে গুনাহগার হবে এবং যদি আয়াতের সিজদার পর সাথে সাথেই সিজদা করা না হয়, তাহলে তওবা অপরিহার্য।

মাসআলাঃ তিলওয়াতে সিজদার নিয়তে 'অমুক' আয়াতের সিজদা এ রকম নিয়ম করার কোন শর্ত নেই বরং সাধারণভাবে সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়তই যথেষ্ট।

মাসআলাঃ যেসব বিষয় নামায ভঙ্গ করে, সে সব বিষয় দ্বারা তিলাওয়াতে সিজদাও বাতিল হয়ে যায়, যেমন ওযু নষ্ট হওয়া, কথা বলা বা অট্টহাসি দেয়া।

(দুরুল মুখতার, ইত্যাদি)

মাসআলাঃ আয়াতে সিজদা লিখলে বা সেদিকে তাকালে সিজদা ওয়াজিব নয় (কাজী খাঁ, আলমগীরী, গুনীয়া)।

মাসআলাঃ সিজদা ওয়াজিব হওয়ার জন্য পূর্ণ আয়াত পড়ার প্রয়োজন নেই, বরং সেই শব্দ যেটাতে সিজদার মূলধাতু পাওয়া যায় এবং এর আগে পরের কোন শব্দ মিলায়ে পড়লেই যথেষ্ট। (রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ আয়াতে সিজদা বানান করলে বা বানান শুনলে সিজদা ওয়াজিব হবে না। (আলমগীরী, দুরুল মুখতার, কাজীখাঁ)

মাসআলাঃ আয়াতে সিজদার তরজুমা পড়া হলে, পাঠকারী ও শ্রবণকারী উভয়ের উপর সিজদা ওয়াজিব, যদিওবা শ্রবণকারী সেটা না বুঝে বা সেটা যে আয়াতে সিজদা তা না জানে। অবশ্য এটা প্রয়োজন যে শ্রবণকারী না জানলে ওকে বলে দেয়া উচিত যে এটা আয়াতে সিজদার তরজুমা। আর যদি আয়াত পড়া হয়, তাহলে শ্রবণকারীকে আয়াতে সিজদার কথা বলার প্রয়োজন নেই।

(কাজী খাঁ, আলামগীরী, বাহার)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ হায়েয নিফাসওয়ালী মহিলা আয়াতে সিজদা তিলাওয়াত করলে তার উপর সিজদা ওয়াজিব নয়, তবে শ্রবণকারীদের জন্য ওয়াজিব। (বাহার)

মাসআলাঃ আয়াতে সিজদার তিলাওয়াত শুনলেও হায়েয বা নিফাসওয়ালী মহিলার জন্য সিজদা ওয়াজিব নয়।

মাসআলাঃ নাপাকী বা ওযুহীন অবস্থায় আয়াতে সিজদা পড়লে বা শুনলে সিজদাওয়াজিব।

মাসআলাঃ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়েরা আয়াতে সিজদা তিলাওয়াত করলে তাদের উপর সিজদা ওয়াজিব নয়। কিন্তু শ্রবণকারীদের উপর ওয়াজিব (আলমগীরী ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ ইমাম আয়াতে সিজদা পড়লেন কিন্তু সিজদা দিলেন না, তাহরে মুক্তাদীও তাঁর অনুসরণে সিজদা করবে না, যদিওবা আয়াতে সিজদা শুনে থাকে। (গুণীয়া)

মাসআলাঃ যে সময় আয়াতে সিজদা পড়া হলো যাদ সেসময় কোন কারণে সিজদা করতে না পারে, তাহলে পাঠকারী ও শ্রবনকারীদের জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে এ দুআটি পড়ে নেয়া سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْر

(রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ পূর্ণ সুরা পাঠ করা এবং মাঝখান থেকে আয়াতে সিজদা বাদ দেয়া মকরূহ তাহরীমী। (কাজী খাঁ, দুরুল মুখতার)

মাসআলাঃ একই বৈঠকে একটি আয়াতে সিজদা বারবার পড়লো বা শুনলো, তাহলে একটি সিজদাই ওয়াজিব হবে, যদিওবা কয়েক ব্যক্তি থেকে শুনে থাকে। অনুরূপ যদি একটি আয়াতে সিজদা পড়লো, সেই আয়াত অন্যজন থেকে শুনলো, তখনও একটি সিজদা ওয়াজিব হবে। (দুরুল মুখতাব, রদ্দুল মুহতার)

বৈঠক পরিবর্তনের বিবরণ

মাসআলাঃ দু'এক গ্রাস খাওয়া, দু'এক ঢোক পান করা, দাঁড়িয়ে যাওয়া, দুএক কদম চলাফেরা করা, সালামের জবাব দেয়া, দু একটি কথা বলা বা ঘরের এক কোণা থেকে অন্য কোণার দিকে চলে যাওয়ার দ্বারা বৈঠক পরিবর্তন হবে না। অবশ্য ঘর যদি বড় হয়, যেমন শাহী মহল, তাহলে এ রকম ঘরের এককোণা থেকে অন্য কোণায় গেলে বৈঠক পরিবর্তন হয়ে যাবে। নৌকার মধ্যে আছেন এবং নৌকা চলছে, এতে বৈঠক পরিবর্তন হয়ে যাবে না। রেলগাড়ীরও একই হুকুম। পশুর উপর আরোহন করেছেন এবং পশু চলছে, তাহলে বৈঠক

পরিবর্তন হয়ে যাবে তবে বাহনের উপর নামায রত থাকলে পরিবর্তন হবে না। তিন গ্রাস খাওয়া, তিন ঢোক পান করা, তিন শব্দ কথা বলা, মাঠে তিন কদম চলাচল করা, বিবাহ করা, ক্রয়বিক্রয় করা এবং শুইয়ে পড়ার দ্বারা বৈঠক পরিবর্তন হয়ে যাবে। (আলমগীরী, দুরুল মুখতার, গুনীয়া ও বাহার)

মাসআলাঃ কোন মাহফিলে অনেকক্ষণ বসে থাকা, কিরাত, তসবীহ, তাহলীল, তালীম বা ওয়াজে নিয়োজিত থাকলে বৈঠক পরিবর্তন হবে না। যদি দু'বার আয়াতে সিজদা পড়ার মাঝখানে কোন দুনিয়াবী কাজ করলো যেমন কাপড় সেলাই করা ইত্যাদি, তাহলে বৈঠক পরিবর্তন হয়ে যাবে।

(রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ যদি শ্রবণকারী সিজদার জন্য প্রস্তুত থাকে এবং সিজদা ওর জন্য বোঝা না হয়, তাহলে আয়াতে সিজদা বড় করে পড়া উত্তম। অন্যথায় নিম্নস্বরে পড়বে। আর যদি শ্রবণকারীর মনোভাব জানা না থাকে যে সে সিজদার জন্য প্রস্তুত কিনা, তখনও নিম্নস্বরে পড়া উত্তম। (রদ্দুল মুহতার, বাহার)

মাসআলাঃ অসুস্থাবস্থায় ইশারা দ্বারা করলেও সিজদা আদায় হয়ে যাবে। অনুরূপ স্ফরে বাহনের উপর ইশারা দ্বারা করলে আদায় হয়ে যাবে।

(আলমগীরী ও অন্যান্য কিতাব)

শুকরিয়ার সিজদাঃ সিজদায়ে তিলাওয়াতের যে নিয়ম,শুকরিয়া সিজদারও সেই একই নিয়ম।

মাসআলাঃ সন্তান জন্ম হলে, সম্পদ অর্জন করলে বা হারানো মাল পাওয়া গেলে বা অসুখ থেকে সুস্থ হলে কিংবা সফর থেকে ফিরে আসলে বা অন্য কোন নিয়ামত লাভ করলে, সিজদায়ে শুকর আদায় করা মুস্তাহাব।

কিরাত অর্থাৎ কুরআন শরীফ পড়ার বর্ণনা

মাসআলাঃ কিরাত এতটুকু আওয়াজ করে পড়া চাই যে যদি বধির না হয় বা কোন শোরগোল না হয়, তাহলে নিজে যেন শুনতে পায়। যদি এতটুকু আওয়াজও না হয়, তাহলে নামায হবে না। এ রকম যেসব ব্যাপারে কিছু পড়তে হয়, সে সব ব্যাপারে ততটুকু আওয়াজ করা প্রয়োজন। যেমন জবেহ করার সময় 'বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর' বলার সময়, তালাক দেয়ার সময়, আয়াতে সিজদা পড়ার ফলে তিলাওয়াতে সিজদা দেয়ার সময় এতটুকু আওয়াজ জরুরী যেন নিজে শুনতে পায়। (মেরাকিল ফালাহ ইত্যাদি)

মাসআলাঃ ফজর, মাগরিব ও ইশার প্রথম দুরাকাতে, জুমা, দুই ঈদ,তারাবীহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ও রমযানের বিতরে ইমামের জন্য উচ্চস্বরে পড়া ওয়াজিব এবং মাগরিবের তৃতীয় রাকাতে, ইশার তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে এবং যোহর ও আসরের সব রাকাতে নিম্নস্বরে পড়া ওয়াজিব।

মাসআলাঃ উচ্চস্বরের অর্থ হচ্ছে এতটুকু আওয়াজ করে পড়া, যেন প্রথম কাতারের লোকেরা শুনতে পায় আর নিম্নস্বর হচ্ছে এতটুকু আওয়াজ করে পড়া, যেন নিজে শুনতে পায়।

মাসআলাঃ আশে পাশের দু'একজন শুনার মত পড়াটা উচ্চস্বর নয় বরং নিম্নস্বর। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ উচ্চস্বর বিশিষ্ট নামাযসমূহে একাকী নামায আদায়কারীর ইখতিয়ার রয়েছে যে উচ্চস্বর বা নিম্নস্বর যে কোন ভাবে পড়তে পারে তবে উচ্চস্বরে পড়া উত্তম।

মাসআলাঃ যদি একাকী কযা পড়ে, তাহলে প্রত্যেক নামায নিম্নস্বরে পড়া ওয়াজিব। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ নিম্নস্বরে নামায পড়ছিল, অন্যজন এসে শরীক হলো, এমতাবস্থায় বাকী নামায উচ্চস্বরে পড়বে এবং যা পড়া হয়ে গেছে, সেটা পুনরায় পড়ার প্রয়োজননেই।

মাসআলাঃ দ্বিতীয় সূরা পড়তে ভুলে গেল, রুকুতে গিয়ে স্মরণ হলো ,তাহলে দাঁড়িয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় সূরা পাঠ করে পুনরায় রুকু করবে এবং সিজদায়ে সহ আদায় করবে। যদি পুনরায় রুকু না করে, তাহলে নামায হবে না।

(দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ মুকীমাবস্থায় যখন সময় সংকীর্ণ না হয়, তাহলে ফজর ও যোহরে তেওয়ালে মুফাচ্ছল (লম্বা আয়াত), আসর ও ইশায় আওসাতে মুফাচ্ছল (মধ্যম গোছের আয়াত) এবং মগরিবে কেছারে মুফাচ্ছল (ছোট আয়াত) পড়া সুন্নাত। জমাত ও একাকীর একই হুকুম। (দুর্রুল মুখতার)

ফায়দাঃ সূরা হুজরাত থেকে সূরা বুরুজ পর্যন্ত সূরাসমূহকে তওয়ালে মুফাচ্ছল বলা হয়, সূরা বুরুজ থেকে সূরা লাম ইয়াকুনিল্লাজি পর্যন্ত সূরা সমূহকে আওসাতে মুফাচ্ছল এবং লম ইয়াকুন থেকে শেষ পর্যন্ত সূরা সমূহকে কেছারে মুফাচ্ছল বলা হয়।

মাসআলাঃ সফরকালে যদি নিরাপদ ও স্বস্তিবোধ থাকে, তাহলে ফজর ও যোহরে সূরা বুরুজ বা অনুরূপ সূরা পড়া, আসর ও ইশায় এর থেকে ছোট এবং মাগরিবে কেছারে মুফাচ্ছলের অন্তর্ভূক্ত ছোট ছোট সূরা পড়া মুস্তাহাব। আর যদি সময়ের অভাব হয়,তাহলে প্রত্যেক নামাযে যে সূরা ইচ্ছে, সেটা পড়বে।

(আলমগীরী)

মাসআলাঃ উৎকণ্ঠাময় অবস্থায় যেমন– যদি সময় চলে যাবার ভয় হয় বা চোর অথবা শত্রুর ভয় থাকে, তাহলে সফরে হোক বা ঘরে যে কোন সূরা পড়বে। এমনকি ওয়াজিবও যদি ঠিক মত আদায় করা না যায় এরও অনুমতি রয়েছে. যেমন ফজরের সময় এমন সংকীর্ণ হয়ে গেল যে কেবল এক একটি আয়াত পড়া যায়, তাহলে তাই করবে। (দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার) তবে সূর্য উদিত হওয়ার পর এ রকম নামায যেন পুনরায় পড়া হয়। (বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ ফজরের সুন্নাত পড়তে গিয়ে যদি জামাত চলে যাবার ভয় হয়, তাহলে যেন কেবল ওয়াজিবসমূহ পালন করে। ছনা তাউয পড়া যেন বাদ দেয় এবং রুকু সিজদায় মাত্র একবার তসবীহ পড়ে। (রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ বিতরে হুযুর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) প্রথম রাকাতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাকাতে قُلْ هُوَ এবং তৃতীয় রাকাতে قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ اللّٰهُ اَحَدٌ পড়তেন। সুতরাং মাঝে মধ্যে তবরুক হিসাবে এ সূরা সমূহ যেন পড়া হয় এবং কোন কোন সময় প্রথম রাকাতে এর পরিবর্তে যেন اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ পড়া হয়।

মাসআলাঃ কোরআন শরীফ উলটা পড়া মকরুহ তাহরীমী, যেমন প্রথম রাকাতে পড়লো قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ এবং দ্বিতীয় রাকাতে পড়লো اَلَمْ تَرَ كَيْفَ এ রকম পড়া নাজায়েয। তবে ভুলে পড়ে ফেললে কোন দোষ নেই।

মাসআলাঃ শিশুদের সহজের জন্য আমপারা নিয়মের বিপরীত উল্টাভাবে পড়ালে, ক্ষতি নেই। (রদ্দুল মুহতাব)

মাসআলাঃ যদি ভুলে দ্বিতীয় রাকাতে প্রথম রাকাতের পঠিত সূরার আগের সূরা শুরু করে দিল, তাহলে এক শব্দ পড়লেও যেন সেই সূরা পুরা পড়া হয়; অন্য সূরা পড়ার অনুমতি নেই। যেমন প্রথম রাকাতে قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ পড়লো এবং দ্বিতীয় রাকাতে ভুলে اَلَمْ تَرَ كَيْفَ শুরু করে দিল। তাহলে সেটাই যেন পড়া হয়।

মাসআলাঃ মাঝখানের একটি সূরা বাদ দিয়ে পড়া মকরূহ। কিন্তু যদি মাঝখানের সূরা প্রথম সূরা থেকে বড় হয়, তাহলে বাদ দেয়া যায়। যেমন اِنَّآ اَنْزَلْنَا পড়লে কোন দোষ নেই وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ পড়ার পর কিন্তু اِذَا جَآءَ এর পর قُلْ هُوَ اللّٰهُ পড়া অনুচিৎ (দুর্রুল মুখতার ইত্যাদি)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ ফরয নামায সমুহে প্রথম রাকাতের কিরাত দ্বিতীয় রাকাত থেকে একটু বড় হওয়া উত্তম। এবং ফজরে দুতৃতীয়াংশ প্রথম রাকাতে এবং দ্বিতীয় রাকাতে এক তৃতীয়াংশ পড়া উত্তম। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ জুমা ও দুই ঈদের প্রথম রাকাতে سَبِّحِ اسْمَ এবং দ্বিতীয় রাকাতে هَلْ اَتٰىكَ পড়া সুন্নাত (দুর্রুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ সুন্নাত ও নফলসমুহের উভয় রাকাতে যেন সমান সুরা পড়া হয়। (মুনিয়া)

মাসআলাঃ নফলসমুহের উভয় রাকাতে একই সূরা পড়া বা এক রাকাতে একই সূরা বারবার পড়া বিনা মকরূহে জায়েয। (গুনীয়া)

কিরাতে ভুল হয়ে যাওয়ার বর্ণনা

কিরাতে ভুল হয়ে যাবার সাধারণ মাপকাঠি হচ্ছে যে যদি এমন ভুল হয়, যদ্বারা অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে, অন্যথায় ভঙ্গ হবে না।

মাসআলাঃ এক হরফের জায়গায় অন্য হরফ পড়া এবং তা যদি এ কারণে হয় যে সেটা মুখ দিয়ে আদায় হয় না, তাহলে অপারগ মনে করা হবে। তবে যথাযত আদায় করার জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন। আর যদি অবহেলার কারণে হয়ে থাকে, যেমন আজকাল প্রায় হাফেজ ও আলেমগণ যথাযথ আদায় করতে সক্ষম কিন্তু অবহেলায় হরফ পরিবর্তন করে ফেলেন, এ ক্ষেত্রে অর্থ বিকৃত হয়ে গেলে নামায হবে না এবং এভাবে যত নামায পড়া হয়েছে , সবের কাযা অপরিহার্য।

মাসআলাঃ ط ت – س ص ث – ذ ز ظ – ا ء ع – ه ح – ض ظ ذ (তোয়া, তে, সীন, সোয়াদ, যাল, যে, যোয়া, আলিফ, হামযা, আইন, হে খে, দোয়াদ, যোয়া, যাল) এ হরফ সমুহের উচ্চারণ ঠিকভাবে আদায় করা চাই, অন্যথায় অর্থ বিকৃত হয়ে গেলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। অনেকে س-ش، ز-ج، ق-ک সীন–শীন, যে–জীম, কাফ–ক্বাফ) এর মধ্যেও পার্থক্য করে না (বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ যাদের দ্বারা হরফসমূহ শুদ্ধভাবে আদায় হয় না, তাদের জন্য ওয়াজিব যে শুদ্ধভাবে আদায় করার জন্য রাতদিন চেষ্টা করা এবং যদি শুদ্ধভাবে আদায়কারীর পিছনে পড়া যায়, তাহলে যতদুর সম্ভব ওদের পিছনে আদায় করা চাই বা সেসমস্ত আয়াত যেন পড়া হয়, যে গুলোর হরফ শুদ্ধভাবে আদায় করা যায়। যদি এ দু'এর কোনটা সম্ভব না হয়, তাহলে চেষ্টারত অবস্থার নামায

হয়ে যাবে এবং ওর পিছনে ওর মত অন্যদের নামাযও। (দুর্রুল মুখতার, রর্দুল মুহতার ও বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ যদি سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم এর عظيم কে عزيم অর্থাৎ ظ জোয়া)–এর পরিবর্তে ز (যে) পড়ে, তাহলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। তাই যে শুদ্ধভাবে আদায় করতে না পারে, সে যেন সুবহানা রব্বিয়াল করীম পড়ে।

নামাযের বাহিরে কুরআন শরীফ পড়ার বর্ণনা

মাসআলাঃ কুরআন শরীফ খুবই সুন্দর উচ্চারণ করে পড়া উচিত। তবে গানের সুরে নয়, কারণ এ রকম পড়া নাজায়েয। তজবীদের নিয়ম কানুনের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। (দুর্রুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ কুরআন মজীদ দেখে পড়া মুখস্থ পড়া থেকে আফজল।

(আলমগীরী)

মাসআলাঃ ওযু সহকারে কিবলামুখী হয়ে কাপড় পরিধান করে তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব। তিলাওয়াতের শুরুতে আউযুবিল্লাহ পড়া ওয়াজিব এবং সুরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত, অন্যথায় মুস্তাহাব। যদি পড়ার জন্য মনস্থকৃত আয়াতের শুরু এ রকম সর্বনাম পদ থাকে, যেটা আল্লাহ তাআলার দিকে ইঙ্গিত করে, যেমন هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তাহলে এ রকম অবস্থায় আউযু বিল্লাহের পর বিসমিল্লাহ পড়া অপরিহার্য মুস্তাহাব। তিলাওয়াতের মাঝখানে কোন দুনিয়াবীকাজ করলে তখন আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ যেন পুনরায় পড়ে নেয়া হয়। আর যদি ধর্মীয় কাজ করে, যেমন সালামের জবাব দিল বা আযানের জবাব দিল অথবা সুবহানাল্লাহ বললো বা কলেমা ইত্যাদির জিকির করলো, তাহলে আউযুবিল্লাহ পড়তে হবে না। (গুণীয়া ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ সূরা বরাত থেকে যদি তিলাওয়াত শুরু করা হয়, তাহলে যেন আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়ে নেয়া হয়। তবে সূরা বরাত যদি তিলাওয়াতের মাঝখানে আসে, তাহলে বিসমিল্লাহ পড়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের মধ্যে যে প্রসিদ্ধ আছে, যদি তিলাওয়াতের সূরা বরাত থেকে শুরু করা হয়, তাহলে বিসমিল্লাহ পড়তে নেই, এটা একেবারে ভ্রান্ত ধারণা। তেলাওয়াতের মাঝখানে এর শূরুতে আউযুবিল্লাহ পড়ার ধারণাও ভুল। (বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ তিনদিনের কমে এক খতম করা ভাল নয়। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ যখন খতম হয়, তখন তিনবার কুল হুয়াল্লাহ আহাদ পড়া মুস্তাহাব।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ শুইয়ে কুরআন পড়লে কোন দোষ নেই, যদি পা কুড়ানো এবং মুখ খোলা থাকে। অনুরূপ চলাফেরা ও কাজ করার সময়ও তিলাওয়াত জায়েয, যদি মন বিগড়ে না যায়, অন্যথায় মকরূহ। (গুনীয়া)

মাসআলাঃ গোসলখানা ও নাপাক জায়গায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত না জায়েয (গুণীয়া, বাহার)

মাসআলাঃ যখন উচ্চস্বরে কুরআন শরীফ পড়া হয়, তখন উপস্থিত সকলের জন্য শুনাটা ফরয, যদি শুনার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়ে থাকে, অন্যথায় একজন শুনলেই যথেষ্ট, যদিওবা অন্যরা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকে। (গুনীয়া, ফতুয়ায়ে রেজভীয়া, বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ সমাবেশের সবলোক একসাথে উচ্চস্বরে কুরআন শরীফ পড়া হারাম। প্রায় উরস, ফাতিহার সময় লোকেরা একসাথে উচ্চস্বরে কুরআন শরীফ পড়ে। এটা কিন্তু হারাম, যদি কয়েকজন এক সাথে কুরআন তিলাওয়াত করে, তাহলে শরীয়তের বিধান হচ্ছে নিম্নস্বরে পড়া। (দুর্রুল মুখতার, বাহার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ বাজারে ও যেখানে লোকেরা কাজ করে, সেখানে উচ্চস্বরে কুরআন শরীফ পড়া নাজায়েয, আর লোকেরা না শুনলে তেলাওয়াতকারীই গুনাহের ভাগী হবে।

মাসআলাঃ তেলাওয়াত করার সময় ধর্মীয় সম্মানিত ব্যক্তি, ইসলামী শাসক, আলেমেদ্বীন, পীর, উস্তাদ বা পিতা আসলে, তেলাওয়াতকারী তাদের সম্মানে দাঁড়াতে পারবে। (গুণীয়া, বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ কোন ব্যক্তি কুরআন ভুল পড়লে শ্রবণকারীর উপর শুধরিয়ে দেয়া ওয়াজিব। তবে শর্ত হলো যে বলার ফলে যেন কোন হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি না হয়। (গুণীয়া ও বাহার)

মাসআলাঃ কুরআন শরীফ উচ্চস্বরে পড়া উত্তম যদি কোন নামাযী, রোগী বা নিদ্রারত ব্যক্তির অসুবিধা না হয়।

মাসআলাঃ দেয়ালে বা মেহরাবে কুরআন মজীদ লিখা ভাল নয়।

মাসআলাঃ কুরআন মজীদ পড়ে ভুলে যাওয়া গুনাহ। কিয়ামতের দিন অন্ধ ও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়ে উঠবে।

মাসআলাঃ কুরআন মজীদের দিকে যেন পিঠ করা বা পা টানা না হয় এবং পা এর থেকে উঁচুও যেন করা না হয় বা এ রকমও যেন না হয় যে নিজে উঁচু জায়গায় আর কুরআন নীচে।

মাসআলাঃ কুরআন শরীফ যদি বিনষ্ট হয়ে পড়ার অনুপযুক্ত হয়ে যায়, তাহলে

কোন পাক কাপড়ে জড়িয়ে নিরাপদ স্থানে যেন দাফন করে ফেলা হয় এবং দাফন করার সময় এর জন্য কবরের মত কুটরি তৈরী করা চাই, যেন এর উপর মাটি পতিত না হয়।

মাসআলাঃ পড়ার অনুপযুক্ত পুরাতন কুরআন শরীফ জ্বালিয়ে ফেলা অনুচিত বরং দাফন করা চাই।

মাসআলাঃ যে সিন্দুকে কুরআন শরীফ রাখা হয়, সেটাতে যেন কাপড় ইত্যাদি রাখা না হয়।

মাসআলাঃ কেউ যদি কেবল খায়র ও বরকতের জন্য ঘরে কুরআন শরীফ রাখে কিন্তু তিলাওয়াত করে না, তাহলে কোন গুনাহ নেই বরং ওর এ নিয়ত ছওয়াবের সহায়ক। (কাজী খান)

জমাতের বর্ণনা

জমাতের প্রতি খুবই জোর দেয়া হয়েছে এবং এর ছওয়াবও অধিক। এমনকি জমাত বিহীন নামায থেকে জমাত সহকারে নামাযের ছওয়াব সাতাশ গুণ বেশী।

মাসআলাঃ পুরুষদের জমাত সহকারে নামায পড়া ওয়াজিব। বিনা কারণে একবারও বর্জনকারী গুনাহের ভাগী ও শাস্তির উপযোগী হবে এবং কয়েকবার বর্জনকারী ফাসিক ও সাক্ষ্যের অনুপযোগী হিসেবে বিবেচ্য এবং ওকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। যদি এ ব্যাপারে প্রতিবেশীরা নিশ্চুপ থাকে, তাহলে ওরাও গুনাহগার হবে।

মাসআলাঃ জুমা ও দুই ঈদে জমাত শর্ত অর্থাৎ জমাত ছাড়া নামায হবেই না।

মাসআলাঃ তারাবীতে জমাত সুন্নাতে কেফায়া অর্থাৎ মহল্লার কিছু লোক জমাত সহকারে পড়লে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। আর যদি সবাই জমাত ত্যাগ করে, তাহলে সবাই গুনাহের ভাগী হবে।

মাসআলাঃ রমযান শরীফের বিতরে জমাত মুস্তাহাব।

মাসআলাঃ সুন্নাত ও নফলসমূহের ব্যাপারে জমাত মকরূহ এবং রমযান ভিন্ন অন্য সময়ে বিতর নামাযও জমাত সহকারে পড়া মকরূহ।

মাসআলাঃ যদি মনে হয় যে ওযুর অংগসমূহ তিন তিনবার ধোয়ার দ্বারা রাকাত চলে যাবে, তাহলে তিন তিন বার না ধুইয়ে রাকাত চলে যেতে না দেয়া উত্তম। আর যদি মনে হয় যে তিন তিনবার ধোয়ার দ্বারা প্রথম তকবীর চলে যাবে কিন্তু রাকাত পাওয়া যাবে, তাহলে তিন তিনবার যেন ধোয়া হয়। (ছগীরী, বাহারে শরীয়ত)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ মহল্লার মসজিদের নির্ধারিত ইমাম আযান ইকামত সহকারে সুন্নাত মুতাবিক জমাত পড়ে ফেলার পর দ্বিতীয় বার আযান ইকামত সহকারে প্রথমটার মত জমাত কায়েম করা মকরূহ। তবে যদি আযান ছাড়া মেহরাব থেকে সরে দ্বিতীয় বার জমাত পড়া হয়, তাতে কোন দোষ নেই। আর যদি প্রথম জমাতে আযানবিহীন ভাবে হয় বা নিম্ন স্বরে আযান হয়ে থাকে, অথবা অন্যরা জমাত পড়ে, তাহলে পুনরায় জমাত পড়া হলে, এ জমাত দ্বিতীয় জমাত হিসেবে গণ্য হবে না। (দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ যার জমাত চলে যায়, তার উপর ওয়াজিব নয় যে অন্য মসজিদে গিয়ে জমাত তালাশ করে পড়া; অবশ্য এ রকম করা মুস্তাহাব।

যে সমস্ত অজুহাতে জমাত ত্যাগ করা যায়

এমন অসুস্থ যে মসজিদ পর্যন্ত যাবার শক্তি নেই, ভীষণ বৃষ্টি,অনেক কাদা, খুবই ঠাণ্ডা, ঘোর অন্ধকার, ঘূর্ণিবায়ু, প্রশ্রাব পায়খানা ও বায়ুর জোর, জালিমের ভয়, কাফেলা হারিয়ে যাবার ভয়, অন্ধ বা বিকলাঙ্গ হওয়া, এ রকম বৃদ্ধ যে মসজিদ পর্যন্ত যেতে অপারগ, মাল বা খাবার চুরি হয়ে যাবার ভয়, অভাবীর কর্জদাতার ভয়, রোগীর দেখাশুনা, ওকে ফেলে গেলে ওর কষ্ট হবে বা ভয় পাবে, এ সবগুলো হচ্ছে জমাত বর্জন করার অজুহাত।

মাসআলাঃ মহিলাদের যে কোন নামাযের জমাতে হাজির হওয়া জায়েয নেই। সেটা দিনের নামায হোক বা রাতের নামায, জুমার হোক বা ঈদের এবং মহিলা যুবতী হোক বা বৃদ্ধ, কোন অবস্থাতেই জায়েয নেই। এমন কি মহিলাদের ওয়াজ মাহফিলে যাওয়াও নাজায়েয। (দুর্রুল মুখতার, বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ একক মুক্তাদী যদিওবা বালক হয়, ইমামের বরাবর ডান দিকে দাঁড়াবে. বাম দিকে বা পিছনে দাঁড়ানো মকরূহ। মুক্তাদী দুঁজন হলে পিছনে দাঁড়াবে, তখন বরাবর দাঁড়ানোটা মকরূহ তনজীহী। দুই থেকে অধিক মুক্তাদীর ইমামের বরাবর দাঁড়ানো মকরূহ তাহরীমী। (দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ একজন মুক্তাদী ইমামের বরাবর দাড়িয়ে আছে। এরপর আর একজন আসলে ইমাম সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এবং নবাগত মুক্তাদী প্রথম মুক্তাদি বরাবর দাড়িয়ে যাবে। আর যদি ইমাম সামনে এগিয়ে না যায়, তাহলে প্রথম মুক্তাদী হয়তো নিজে পিছনে সরে আসবে অথবা নবাগত ব্যক্তি ওকে পিছনে টেনে নিবে। কিন্তু মুক্তাদী যখন একজন হয়, তখন ওর পিছে হটে আসা **আফযল** আর যদি দুঁজন হয়, তাহলে ইমামের এগিয়ে যাওয়া আফযল।

মাসআলাঃ কাতার সোজা হওয়া চাই এবং মুক্তাদীগণ একজনের সাথে

একজন লেগে দাঁড়ানো চাই, যেন দুঁজনের মাঝখানে কোন জায়গা খালি না থাকে এবং সবার কাঁধ বরাবর হওয়া চাই এবং ইমাম যেন ঠিক মাঝখানের সামনে থাকে।

মাসআলাঃ প্রথম কাতারে ও ইমামের সন্নিকট দাঁড়ানো আফযল কিন্তু জানাযায় একেবারে পিছনের কাতারে হওয়া আফযল (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ মুক্তাদীর তকবীরে তাহরীমা ইমামের সাথে বা পরে বলা চাই। এমন কি যদি আল্লাহ আকবর এর আল্লাহ শব্দটা ইমামের সাথে এবং আকবর শব্দটা ইমামের আগে বলে ফেলে তাহলে নামায হবে না।

মাসআলাঃ মুক্তাদীর কোন কিরাত পড়া জায়েয নেই। ফাতিহা হোক বা অন্য কোন সূরা, ইমাম উচ্চস্বরে পড়ুক বা নিম্নস্বরে, ইমামের পড়াটা মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট। (হেদায়া ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ কাতার সমুহের তরতীব এ রকম হওয়া চাই যে, সামনের কাতার সমুহে পুরুষ, এরপর শিশুগণ ও সবার পিছনে মহিলাগণ দাঁড়াবে। (হেদায়া)

মাসআলাঃ ইমাম মুসলমান পুরুষ, বিবেকবান, প্রাপ্ত বয়স্ক,নামাযের মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞাত এবং ওযর বিহীন হওয়া চাই। যদি এ ছয়টি বিষয়ের যে কোন একটি পাওয়া না যায়, তাঁর পিছনে নামায হবে না।

মাসআলাঃ মাযুর ব্যক্তি নিজের মত মাযুরের বা তার থেকে অধিক মাযুরের ইমাম হতে পারে। আর যদি ইমাম, মুক্তাদী দুজনের দু'রকম ওযর হয়, যেমন একজনের বায়ু বের হওয়ার রোগ, অন্য জনের ফোঁটা ফোঁটা পায়খানা হওয়ার রোগ, তাহলে একে অপরের ইমামতি করতে পারবে না। (আলমগীরী, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ তায়াম্মুমকারী ওযুকারীদের ইমাম হতে পারে। (হেদায়া ও অন্যান্য গ্রন্থ)

মাসআলাঃ মোজার উপর মুছেহকারী পা ধৌতকারীদের ইমামতি করতে পারে। (হেদায়া ও অন্যান্য গ্রন্থ)

মাসআলাঃ দাড়িয়ে নামায আদায়কারী বসে নামায আদায়কারীর পিছনে ইকতেদা করতে পারে (হেদায়া, শরহে বেকায়া)

মাসআলাঃ রুকু সিজদা করে নামায আদায়কারী ইশারায় নামায আদায়কারীর ইকতেদা করতে পারে না। তবে ইমাম মুক্তাদী উভয়ে যদি ইশারায় পড়ে তাহলে ইকতেদা জায়েয। (হেদায়া, শরহে বেকায়া)

মাসআলাঃ উলঙ্গ ব্যক্তি সতর ঢাকা ব্যক্তিদের ইমাম হতে পারে না। (হেদায়া, শরহে বেকায়া)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ বদ মযহাব, যার বদমযহাবী কুফরীর পর্যায় পৌঁছেনি, যেমন তফযিলিয়া ফেরকা, তাকে ইমাম বানানো গুনাহ এবং তার পিছনে নামায মকরূহ তাহরীমী এবং দোহরায়ে পড়া ওয়াজিব। (দুর্রুল মুখতাব, রদ্দুল মুহতার, আলমগীরী)

মাসআলাঃ প্রকাশ্য ফাসিক যেমন মদখোর, জুয়াড়ী, যানী, সুদখোর চোগলখোর প্রমুখ যারা প্রকাশ্যে কবীরা গুনাহ করে, তাদেরকে ইমাম বানানো গুনাহ এবং তাদের পিছনে নামায মকরূহ তাহরীমী এবং পুনরায় পড়া ওয়াজিব (দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ এমন ধরণের বদমযহাব যার বদমাযহাবী কুফরীর পর্যায় পৌছে গেছে, যেমন রাফেজী (যদিওবা কেবল আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) এর খেলাফত বা সাহাবী হওয়া অস্বীকার করে) অথবা শেখাইন (আবু বকর ও উমর (রাঃ) এর শানে অভিসম্পাত দেয়), জহমী, মুশাব্বা, কদরী এবং যারা কুরআনকে সৃষ্ট বলে, শাফায়াত বা দীদারে ইলাহী বা কবর আযাব বা কিরামান কাতেবীনকে অস্বীকার করে, তাদের পিছনে নামায জায়েয হতে পারে না। (আলমগীরী ও গুণীয়া) এর থেকে কঠোরতর হুকুম সেসব লোকদের জন্য, যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে বরং সুন্নাতের অনুসারী বলে দাবী করে, কিন্তু তা সত্বেও কতেক দ্বীনের জরুরী বিষয় মান্য করেনা, আল্লাহ ও রসুলের শানে বেআদবী করে বা বেআদবীকারীদেরকে মুসলমান মনে করে, তাদের পিছনে নামায একেবারে নাজায়েয।

মাসাআলাঃ ফাসিকের পিছনে ইকতেদা না করা চাই, কিন্তু কেবল জুমার নামাযে অপারগ হয়ে পড়তে হলে পড়া যায়। অন্যান্য নামাযের বেলায় অন্য মসজিদে চলে যাওয়া উচিত। আর যদি জুমার নামাযও শহরের কয়েক জায়গায় হয় তখন জুমার বেলায়ও ইকতেদা না করা চাই এবং যেন অন্য মসজিদে গিয়ে পড়া হয়। (গুণীয়া, রদ্দুল মুহতার, ফতহুল কদীর)

মাসআলাঃ ইমামের একাকী উঁচু জায়গায় দাঁড়ানো মকরূহ। যদি উচ্চতা সামান্য হয়, তাহলে মকরূহ তনযীহ। আর যদি উচ্চতা বেশী হয়, তাহলে মকরূহ তাহরীমী। (দুর্রুল মুখতার ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ ইমাম যদি নীচু জায়গা এবং মুক্তাদী যদি উঁচু জায়গায় হয়, সেটাও মকরূহ এবং সুন্নাতের বিপরীত। (দুর্রুল মুখতার ও অন্যান্য কিতাব)

মসবুক সম্পর্কিত মাসায়েল

মসবুক হচ্ছে যে ব্যক্তি জমাতে ওই সময় শামিল হয়, যখন ইমাম এক বা

একাধিক রাকাত পড়ে ফেলে এবং নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত ইমামের সাথে থাকে এবং বাদ পড়া রাকাতগুলো একাকী আদায় করে।

মাসআলাঃ মসবুক ইমামকে বৈঠকে পেলে এভাবে শামিল হবে যে প্রথম নিয়ত করে দাঁড়াবে এবং সোজা দাড়ানো অবস্থায় তকবীর তাহরীমা বলবে। যদি প্রথম তকবীর বলার সাথে রুকুর সীমা পর্যন্ত ঝুঁকে যায়, তাহলে নামায হবে না।

মাসআলাঃ মসবুক যদি চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযের চতুর্থ রাকাতে জমাতে শামিল হয়, তাহলে ইমামের সালাম ফিরানোর পর দাঁড়িয়ে যাবে এবং এক রাকাত আলহামদু ও অন্য একটি সূরা পড়ে বৈঠক করবে এবং পুনরায় দাড়িঁয়ে যাবে এবং সেই রাকাতেও আলহামদু ও অন্য একটি সূরা পড়বে এবং এ রাকাতে বৈঠক করবে না বরং আর এক রাকাত কেবল আলহামদু পড়ে বৈঠক করে নামায শেষ করবে। অর্থাৎ ইমামের সাথে বৈঠক ব্যতীত ওকে আরও দু'টি বৈঠক করতে হবে। প্রথম বৈঠক প্রথম রাকাতের পর এবং আরও দু'রাকাত পড়ার পর দ্বিতীয় বৈঠক।

মাস্আলাঃ মসবুক যদি মাগরিবের তৃতীয় রাকাতে শামিল হয়, তাহলে ইমামের সালাম ফিরানোর পর দাঁড়িয়ে যাবে। আলহামদু ও অন্য একটি সূরা সহকারে এক রাকাত পড়ে বৈঠক করে পুনরায় দাঁড়িয়ে যাবে এবং আলহামদু ও অন্য একটি সূরা পড়ে রাকাত পূর্ণ করবে এবং শেষ বৈঠক করে নামায শেষ করবে। অর্থাৎ নিজের দু'রাকাতেই বৈঠক করবে এবং দু'রাকাতেই আলহামদু ও অন্য সূরা পড়বে। এখানেও ইমামের সাথের বৈঠক বাদ দিয়ে আরও দু'বৈঠক হবে।

মাস্আলাঃ চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযের তৃতীয় রাকাতে শামিল হলো, তাহলে ইমামের পরে আরও দুরাকাত পড়বে এবং এ দু'রাকাতে আলহামদু ও অন্য একটি সূরা নিশ্চয় পড়বে।

মাস্আলাঃ যদি প্রথম রাকাত হয়ে যায়, তাহলে ইমামের পর আলহামদু ও অন্য একটি সূরা সহকারে এক রাকাত পড়বে।

মাসআলাঃ মসবুক যদি ভুলে ইমামের সাথে সালাম ফিরায়ে ফেলে, তাহলে নামায ভঙ্গ হবে না, বাদবাকী নামায পড়ে নিবে। যদি একেবারে ইমামের সাথে সাথে সালাম ফিরানো হয়, তাহলে সহ সিজদাও দিতে হবে না, আর যদি ইমামের একটু পরেই সালাম ফিরালো, তাহলে সিজদায়ে সহ ওয়াজিব এবং যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এ মনে করে সালাম ফিরালো যে আমাকেও ইমামের সাথে সালাম ফিরোনো উচিত, তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। পুনরায় প্রথম থেকে পড়তে হবে। (দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ কেউ চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায একাকী শুরু করলো এবং প্রথম রাকাতের সিজাদা করার আগে জমাত শুরু হয়ে গেল, এমতাবস্থায় স্বীয় নামায ভঙ্গ করে জমাতে শরীক হয়ে যাবে আর ফজর ও মগরিবে প্রথম রাকাতের সিজদাও যদি করে ফেলে তবুও নামায ভঙ্গ করে জমাতে শরীক হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযের প্রথম রাকাতের সিজদা যদি করে ফেলা হয়, তাহলে নামায ভঙ্গ করবে না। আরও এক রাকাত পড়ে বৈঠক করে সালাম ফিরায়ে জমাতে শরীক হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ যদি তিন রাকাত পড়ার পর জমাত শুরু হয়, তাহলে জমাতে শামিল হওয়া যাবে না, একাকীই চার রাকাত পূর্ণ করবে এবং পরে নফলের নিয়তে জমাতে শরীক হয়ে যাবে। কিন্তু আসরে শামিল হওয়া যাবে না, কারণ আসরের পর নফল নাজায়েয।

মাসআলাঃ চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযের তৃতীয় রাকাতের সিজদা এখনও করেনি, এমতাবস্থায় জমাত শুরু হয়ে গেলে নামায ভঙ্গ করে জমাতে শরীক হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ নামায ভঙ্গ করার জন্য বসার প্রয়োজন নেই, ভঙ্গ করার নিয়তে দাঁড়ানো অবস্থায় একদিকে সালাম ফিরালে ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ নফল বা সুন্নাত বা কাযা শুরু করলো এবং এমতাবস্থায় জামাত শুরু হলে নামায ভঙ্গ করবে না; শেষ করেই জমাতে শরীক হবে। অবশ্য নফল যদি চার রাকাতের নিয়তে শুরু করে, তাহলে দু'রাকাত পড়ে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তিন বা চার রাকাত পড়া হয়, তাহলে পূর্ণ করবে।

মাসআলাঃ জমাতে শরীক হওয়ার জন্য নামায ভঙ্গ করার হুকুম সেই সময়, যখন ওই জায়গায় জমাত কায়েম হয়, যেখানে একাকী নামায পড়া হচ্ছে। যদি মসজিদের অন্য জায়াগায় জমাত কায়েম হলো, তাহলে নামায ভঙ্গ করার হুকুম নেই। বা একাকী নামায আদায়কারী এক মসজিদে নামায পড়তেছে আর অন্য মসজিদে জমাত শুরু হলো, তখনও নামায ভঙ্গ করা যায় না। যদিওবা এখনও প্রথম রাকাতে সিজদা করেনি, তবুও নামায ভঙ্গ করা যায় না। (রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ কিয়াম, রুকু, সিজদা ও শেষ বৈঠকে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ফরয। যদি কিয়াম অর্থাৎ দাঁড়ানোর আগে রুকু করে নিল, এরপরে দাঁড়ালো, তাহলে রুকু হবে না। যদি দাঁড়ানোর পর পুনরায় রুকু করে,তাহলে নামায হয়ে যাবে, অন্যথায় হবে না। এ রকম যদি রুকুর আগে সিজদা করা হয় এবং পুনরায়

রুকুর পর সিজদা করা হয়, তাহলে নামায হয়ে যাবে, অন্যথায় হবে না (রুদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ যে সব বিষয় ফরয, সেগুলোর ব্যাপারে ইমামের অনুসরণ মুক্তাদীর জন্য ফরয। অর্থাৎ যদি ফরয বিষয়ের কোন কিছু ইমামের আগে আদায় করে এবং ইমামের সঙ্গে বা ইমাম আদায় করার পর আদায় না করে,তাহলে নামায হবে না। যেমন, কেউ ইমামের আগে সিজদা করে নিল এবং ইমাম সিজদাতে যাবার আগে সে মাথা উঠায়ে নিল, তাহলে ইমামের সাথে বা পরে পুনরায় যদি আদায় করে, তাহলে নামায হয়ে যাবে, অন্যথায় হবে না। (দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ মুক্তাদী ইমামের আগে সিজদায় গেল, কিন্তু তার মাথা উঠাবার আগে ইমামও সিজদায় চলে গেল, তাহলে সিজদা হয়ে যাবে, কিন্তু মুক্তাদীর পক্ষে এ রকম করা হারাম। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ কাতারে জায়গা খালি থাকা অবস্থায় কাতারের পিছনে মুক্তাদীর একাকী দাঁড়ানো মকরূহে তানযীহ। তবে কাতারে জায়গা খালি না থাকলে কোন দোষ নেই। তবে কাতারে কাউকে টেনে নিয়ে নিজের সাথে দাঁড় করানো গেলে ভাল। কিন্তু এটা খেয়াল রাখতে হবে যে, যাকে টানা হবে, সে যেন এ মাসআলা সম্পর্কে অবহিত থাকে। এ রকম যেন না হয় যে টানলে নামায ভঙ্গ করে ফেলে (আলমগীরী)

ইচ্ছে করলে যে কাউকে ইশারা করতে পারে, কিন্তু ইশারাকৃত ব্যক্তির পিছনে হটা অনুচিৎ, এতে ওর মকরূহ হওয়াটা দূরীভূত হয়ে যাবে। (ফতহুল কদীর, বাহারে শরীয়াত)

জামাত কায়েম করার নিয়ম

জমাত এভাবে কায়েম করতে হবে যে, যখন মুস্তাহাব ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়, তখন আযান দেয়া হবে।

এরপর সব লোকেরা অযু সহকারে মসজিদে বা যেখানে জমাত পড়ার ইচ্ছে, সেখানে একত্রিত হবে। সুন্নাত যদি ঘর থেকে পড়ে আসা না হয়, তাহলে সুন্নাত পড়ে কাতারবন্দি হয়ে বসে যাবে। ইমামও স্বীয় জায়গায় বসে যাবে। মুয়াযযিন তখন তকবীর দিবে এবং যখন. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

(হায়্যা আলাল ফালাহ) বলবে, তখন ইমাম মুক্তাদী সবাই দাড়িয়ে যাবে। ইমাম সাহেব নামায ও ইমামতির নিয়ত করে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ

pdf By Syed Mostafa Sakib

(কদকামাতিস সালাত) বলার একটু আগে আল্লাহ আকবর বলে হাত বাঁধরে এবং ছনা পাঠ শুরু করবে এবং মুক্তাদীগণও সেই নামায ও ইক্তেদার নিয়ত করে আল্লাহ আকবর বলে হাত বাঁধবে এবং ছনা পাঠ করে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকবে। যখন ইমাম সাহেব রুকুতে যাবে, মুক্তাদীও রুকুতে যাবে এবং ইমামের সাথে পুরা নামায শেষ করবে, আলহামদু ও অন্য সুরা ব্যতীত সব কিছু যা নামাযে পড়া হয়, পড়বে। যদি কোন ব্যক্তি ইমামের শুরু করার পর বা কয়েক রাকাত পড়ে ফেলার পর আসলো, তাহলে সেও সেই নামায ও ইমামের পিছনে পড়ার নিয়তে শরীক হয়ে যাবে। শেষে ইমাম যখন সালাম ফিরাবে, সবাই সালাম ফিরাবে। কিন্তু যার কিছু নামায বাদ পড়েছে, সে সালাম ফিরাবে না, বরং দাঁড়িয়ে যাবে এবং স্বীয় বাদ পড়া নামায পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে। সালামের পর ইমাম স্বীয় ডান বা বাম দিকে অথবা মুক্তাদীদের দিকে ঘুরে যাবে এবং উভয় হাত বুকের সামনে মেলে ধরে দুআ প্রার্থনা করবে এবং মুক্তাদীগণও দুআ প্রার্থনা করবে। মুনাজাতের পর স্বীয় জায়গা থেকে সরে সুন্নাত নামাযসমূহ পড়বে।

মাসআলাঃ তকবীর তাহরীমা قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ (কদকামাতিস সালাত) এর একটু আগে বলবে এবং মুক্তাদীগণ ইমামের তকবীর বলার পরই তকবীর বলবে। (আলমগীরী)

নামায ভঙ্গকারী বিষয়সমুহের বর্ণনা

মাসআলাঃ কথা নামায ভঙ্গকারী অর্থাৎ নামাযে কথা বললে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়, সেটা ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলে হোক, যৎ সামান্য কথা হোক বা বেশী।

মাসআলাঃ তেমন ধরণের কথাই নামায ভঙ্গ করে, যেটায় এতটুকু আওয়াজ হয় যে যদি কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে কমপক্ষে নিজে শুনতে পায়।

মাসআলাঃ কাউকে ভুলে সালাম করলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়, যদিওবা শুধু আস্‌সালাম বলা হয় এবং আলাইকুম বলা না হয়।

মাসআলাঃ মুখে সালামের জবাব দিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায় এবং হাত বা মাথার ইশারায় যদি সালামের জবাব দেয়, তাহলে সেটা মকরূহ। (দুর্রুল মুখতার, আলমগীরী)

মাসআলাঃ নামাযে হাঁচি আসলে আলহামদু লিল্লাহ না বলা চাই। যদি বলে ফেলা হয়, নামায ভঙ্গ হবে না। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ আনন্দদায়ক সংবাদের জবাবে আলহামদু লিল্লাহ বললো বা মন্দ সংবাদ শুনে ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন পড়লো অথবা

আশ্চর্যজনক খবর শুনে সুবহানাল্লাহ বা আল্লাহ আকবর বললো, তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে গেল। তবে সংবাদের জবাবের ইচ্ছে না করলে, ভঙ্গ হবে না।

মাসআলাঃ কোন অজুহাত ও সঠিক উদ্দেশ্য ছাড়া গলার আওয়াজ করে দু হরফ যেমন 'আহ' বের করলে, নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি কোন অজুহাতের কারণে হয়, যেমন শারীরিক কারণে বাধ্য হয়ে বা সঠিক উদ্দেশ্যে, যেমন কেরাত পড়ার সময় আওয়াজ পরিষ্কার করার জন্য বা ইমামের ভুলের ব্যাপারে সজাগ করার জন্য অথবা অন্যদেরকে নিজে নামাযরত হওয়াটা অবহিত করার জন্য গলার আওয়াজ করা হয়, তাহলে এর দ্বারা নামায ভঙ্গ হবে না।

মাসআলাঃ মুক্তাদী স্বীয় ইমাম ছাড়া অন্য কাউকে লোকমা দিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়।

মাসআলাঃ ইমাম যদি স্বীয় মুক্তাদী ছাড়া অন্য কারো লোকমা গ্রহণ করে, তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ আহ, উফ, এজাতীয় শব্দ কোন ব্যথা বা মসীবতের কারণে যদি বের হয় বা আওয়াজ করে কাঁদলে বা অন্য কোন শব্দ সৃষ্টি হলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি কান্নার আওয়াজ বা কোন শব্দ বের না হয়, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। (আলমগীরী, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ রোগীর মুখ দিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে আহ, উহ, শব্দ বের হলে নামায ভঙ্গ হবে না। অনুরূপ হাঁচি, কাশি, হাই ও ঢেকুরে অনিচ্ছাকৃত যত শব্দ বের হয়, সেটা মাফ। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ ফুঁকের মধ্যে আওয়াজ না হলে, সেটা শ্বাসপ্রশ্বাসের মত নামায ভঙ্গকারী নয়। কিন্তু ইচ্ছাকৃত করাটা মকরূহ। আর যদি ফুঁকের দ্বারা দুটি হরফ বের হয়, যেমন উফ, তুক, তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (গুনীয়া)

মাসআলাঃ নামাযের মধ্যে কুরআন মজীদ দেখে বা মেহরাব ইত্যাদির লিখা দেখে কুরআন পড়ার দ্বারা নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। তবে যদি স্মরণ থেকে পড়া হয় এবং লেখার প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। (রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ নামাযের আমল বহির্ভূত বা নামাযকে সঠিক করার উদ্দেশ্য ব্যতীত আমলে কছীর করলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। তবে আমলে কলীল করলে নামায ভঙ্গ হয় না। যে কাজটা করলে দুর থেকে দেখলে মনে হয় না যে নামাযে আছে বরং নামাযে নেই বলেই দৃঢ় ধারণা হয়, সে কাজকে আমলে কছীর বলা হয়। আর যে কাজটা করলে দুর থেকে দেখলে সন্দেহ হয় যে নামাযের মধ্যে আছে কিনা, সেটাকে আমলে কলীল বলা হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ নামাযরত অবস্থায় কোর্তা বা পায়জামা পরলে বা তোহবন্দ বাঁধলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়।

মাসআলাঃ নামাযের মধ্যে পানাহার করলে যে কোন অবস্থায় নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলে হোক, সামান্য হোক বা বেশী হোক, এমনকি তৈলবীজ না চিবায়ে গিলে ফেললে বা কোন ফোঁটা মুখে পতিত হলে গিলে ফেললে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ মৃত্যু, পাগল হয়ে যাওয়া ও বেহুঁশ হয়ে যাবার দ্বারা নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। যদি ওয়াক্তের মধ্যে সুস্থ হয়ে যায়, তাহলে পুনরায় আদায় করবে। আর যদি ওয়াক্ত চলে যাবার পরে সুস্থ হয়, তাহলে কাযা পড়বে। তবে শর্ত হলো যে পাগলামী বা বেহুঁশ অবস্থাটা যেন একদিন একরাতের অধিক না হয়, যদি ছয় ওয়াক্ত নামায পরিমাণ সময় পাগল বা বেহুঁশ থাকে, তাহলে কাযা ওয়াজিব নয়। (আলমগীরী, দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ ইচ্ছাকৃতভাবে ওযু ভঙ্গ করা হলে বা গোসলের কোন কারণ পাওয়া গেলে, নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ নামাযের কোন রোকন বাদ পড়লে এবং সেটা সেই নামাযে আদায় করা না হলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ বিনা কারণে নামাযের কোন শর্ত বাদ দিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ শেষ বৈঠকের পর নামাযের সিজদা বা তিলাওয়াতে সিজদার কথা স্মরণ হলো, তাহলে ওটা আদায় করার পর পুনরায় বৈঠক না করলে, নামায হবেনা।

মাসআলাঃ শোয়া অবস্থায় আদায়কৃত কোন রোকনকে পুনরায় আদায় করা না হলে নামায হবে না।

মাসআলাঃ সাপ, বিচ্ছু মারার দ্বারা নামায ভঙ্গ হয় না, যদি তিন কদম ও তিন আঘাতের প্রয়োজন না হয় কিন্তু মারতে যদি তিন কদম বা এর অধিক এদিক সেদিক যেতে হয় বা তিন বা এর অধিক আঘাত করতে হয়, তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ নামাযে সাপ, বিচ্ছু মারার অনুমতি আছে, যদিওবা নামায ভঙ্গ হয়ে যায়।

মাসআলাঃ নামাযরত অবস্থায় সাপ, বিচ্ছু মারা ওই সময় মুবাহ, যখন নিজের সামনের দিক দিয়ে যায় এবং কামড়াবে বলে ভয় হয়। যদি কামড়ানোর ভয় না থাকে, তাহলে মকরূহ (আলমগীরী)

মাসআলাঃ এক রোকনে তিনবার চুলকালে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। অর্থাৎ একবার চুলকায়ে হাত সরিয়ে নিল, আবার চুলকায়ে হাত সরিয়ে নিল, পুনরায় চুলকাল এবং হাত সরিয়ে নিল। যদি একবার হাত রেখে কয়েকবার চুলকানো হয়, তাহলে একবার চুলকানোই ধরা হবে এবং নামায ভঙ্গ হবে না।

(আলমগীরী, গুনীয়া)

মাসআলাঃ তকবীর তাহরীমা ব্যতীত অন্যান্য তকবীরে اللّٰه (আল্লাহ) এর الف (আলিফ) কে বা اكبر (আকবর) এর الف (আলিফ)কে টেনে বললে অর্থাৎ আয়াল্লাহ আয়াকবর বললে বা اكبر (আকবর) এর ب (বা) এর পর الف (আলিফ) বৃদ্ধি করলে অর্থাৎ اكبر (আকবার) বললে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি তকবীর তাহরীমাতে এ রকম করা হয়, তাহলে নামায শুরুই হলো না। (দুর্রুল মুখতার ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ কিরাত বা দুআসমূহে যদি এমন কোন ভুল হয় যদ্বারা অর্থ বিকৃতি হয়ে যায়, তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ নামাযীর সামনে দিয়ে মানুষ বা পশু গেলে, নামায ভঙ্গ হয় না। অবশ্য সামনে দিয়ে গমনকারী গুনাহগার হবে। নামাযীর সামনে দিয়ে গমনকারী যদি জানতো যে এতে কী যে গুনাহ, তাহলে শত বছর দাঁড়িয়ে থাকা এমনকি মাটিতে ধ্বসে যাওয়াটা ভাল মনে করতো, তবুও নামাযীর সামনে দিয়ে কখনও গমন করতো না।

মাসআলাঃ যদি মাঠে নামাযীর সামনের তিন গজ বাদ দিয়ে গমন করে, তাহলে কোন দোষ নেই। কিন্তু ঘরে বা মসজিদে এ রকম করা যায় না।

মাসআলাঃ নামাযীর সামনে যদি সুতরা হয়, তাহলে সুতরার বাহির দিয়ে গমন করলে কোন ক্ষতি নেই। সুতরা হচ্ছে এমন একটি বস্তু যদ্বারা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়। সুতরা একহাত উঁচু ও এক আঙ্গুল মোটা হলে যথেষ্ট, বেশীর পক্ষে তিন হাত পর্যন্ত উঁচু করা যায়। (দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ সুতরা সামনের ডান দিকে স্থাপন করাটা আফযল।

মাসআলাঃ গাছ, পশু, মানুষ ইত্যাদি সুতরা হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

(গুনীয়া)

মাসআলাঃ ইমামের সুতরা মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট, মুক্তাদীদের জন্য পৃথক পৃথক সুতরার প্রয়োজন নেই। সুতরা; মসজিদে মুক্তাদীর সামনে দিয়ে গমন করা হলে, কোন দোষ নেই। (রদ্দুল মুহতার)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ নামাযীর সামনে দিয়ে গমনকারীদেরকে বাধা দিতে চাইলে সুবহানাল্লাহ বলবে বা উচ্চস্বরে কিরাত পড়বে বা হাতের দ্বারা ইশারা করবে, কিন্তু বার বার এ রকম না করা চাই। কারণ আমলে কছীর হয়ে গেলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (দুরুল মুখতার, রুদ্দুল মুহতার)

নামাযের মকরূহসমুহের বর্ণনা

মাসআলাঃ নামাযে কাপড়, শরীর বা দাড়ি নিয়ে খেলা করা মকরূহ তাহরীমী। কাপড় কুড়ায়ে নেয়া, যেমন সিজদায় যাবার সময় সামনে ও পিছন থেকে উঠায়ে নেয়া যদিওবা আশপাশ থেকে রক্ষার জন্য হয়ে থাকে, মকরূহ তাহরীমী। আর যদি বিনা কারণে হয়, তাহলে আরও অধিক মকরূহ। কাপড় লটকিয়ে দেয়া, যেমন মাথা ও কাঁধে এ ভাবে রাখা যে উভয় কিনারা লটকে থাকে, তাহলে মকরূহ তাহরীমী।

মাসআলাঃ যদি কোর্তা, শার্ট ইত্যাদির হাতায় হাত না ঢুকায়ে বরং পিঠের দিকে নিক্ষেপ করে, তাহলে এটাও মকরূহ তাহরীমী। (দুরুল মুখতার)

মাসআলাঃ যদি কাঁধে এমনভাবে রুমাল রাখা হয় যে এর এক কিনারা পিঠের উপর এবং অন্য কিনারা পেটের উপর লটকে থাকে, তাহলে এটাও মকরূহ তাহরীমী।

মাসআলাঃ কম্বল, চাদর ও শালের কিনারা দুনো কাঁধে লটকিয়ে রাখা নিষেধ ও মকরূহ তাহরীমী। তবে যদি এক কিনারা অন্য কাঁধে হয় এবং অপর কিনারাটা লটকে থাকে, তাহলে কোন ক্ষতি নেই।

(দুরুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ কোন হাতা অর্ধেক থেকে অধিক উঠায়ে বা আস্তিন গুটায়ে নামায পড়া মকরূহ তাহরীমী। আগে উঠায়ে থাকুক বা নামাযে উঠায়ে থাকুক, একই হুকুম। (দুরুল মুখতার।)

মাসআলাঃ পুরুষের ঝুটা বেঁধে নামায পড়া মকরূহ তাহরীমী আর নামাযরত অবস্থায় ঝুটা বাঁধলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ কঙ্কর সরানো মকরূহ তাহরীমী, তবে সুন্নাত মুতাবিক সিজদা আদায় করা না গেলে একবার হটানো যায়। আর যদি হটানো ছাড়া ঠিকমত ওয়াজিব আদায় না হয়, তাহলে হটানো ওয়াজিব , যদিওবা কয়েকবার হটাতে হয়। (দুরুল মুখতার)

মাসআলাঃ আঙ্গুল মোচড়ানো, এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুল সমুহের ফাঁকে ঢুকানো মকরূহ তাহরীমী। (দুরুল মুখতার)

মাসআলাঃ নামাযের জন্য যাবার সময় ও-নামাযের জন্য অপেক্ষারত অবস্থায়ও উল্লেখিত কাজ দুটি মকরূহ।

মাসআলাঃ কোমরে হাত রাখা মকরূহ তাহরীমী, নামায ছাড়াও কোমরে হাত রাখা অনুচিত। (দুরুল মুখতার)

মাসআলাঃ এদিক সেদিক মুখ ফিরায়ে দেখাটা মকরূহ তাহরীমী যদিও বা সামান্য মুখ ফিরানো হয়। তবে যদি মুখ না ফিরায়ে কেবল চোখের কোণায় বিনা প্রয়োজনে এদিক সেদিক তাকায়, তাহলে মকরূহ তানজীহ। অবশ্য কদাচিৎ কোন সঙ্গত প্রয়োজনে তাকানো হলে মুলতঃ কোন ক্ষতি নেই। আসমানের দিকে দৃষ্টি দেয়াটাও মকরূহ তাহরীমী।

মাসআলাঃ তাশাহুদ বা দুসিজদার মাঝখানে কুকুরের মত বসা (অর্থাৎ হাঁটুদ্বয় বুকের সাথে লাগিয়ে হাতদ্বয় মাটিতে রেখে পাছার উপর ভার দিয়ে বসা), পুরুষের সিজদায় বাহু বিছায়ে দেয়া, কোন ব্যক্তির মুখামুখি নামায পড়া মকরূহ তাহরীমী।

মাসআলাঃ যদি এমনভাবে কাপড় জড়ানো হয় যে হাতও বাইরে থাকে না, তাহলে মকরূহ তাহরীমী। এমনিতে বিনা প্রয়োজনে এভাবে জড়ানো অনুচিত। আর বিপদ সংকুল জায়গায় তো কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। অনুরূপ নাকমুখ ঢেকে রাখাও মকরূহ তাহরীমী।

মাসআলাঃ বিনা প্রয়োজনে গলার আওয়াজ বের করা, ইচ্ছাকৃতভাবে হাই তোলা মকরূহ তাহরীমী। যদি হাইটা এমনিতে আসে, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। তবে বাধা দেয়াটা মুস্তাহাব। যদি বাধা দেয়ার পরও আসে, তাহলে দাঁত দ্বারা ঠোঁট চেপে ধরবে। যদি এরপরও প্রতিরোধ করা না যায়, তাহলে দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাত ও অন্যান্য অবস্থায় বাম হাত মুখের উপর রাখবে।

মাসআলাঃ কোর্তা, চাদর মওজুদ থাকা সত্বেও কেবল পায়জামা বা লুঙ্গি পরে নামায পড়া মকরূহ তাহরীমী। তবে না থাকলে মাফ।

মাসআলাঃ কোন আগমনকারীর জন্য নামায দীর্ঘায়িত করা মকরূহ তাহরীমী। তবে জমাত পাবার উদ্দেশ্যে দু'এক তাসবীহ বরাবর দীর্ঘায়িত করা মকরূহ নয়।

(আলমগীরী)

মাসআলাঃ মাঝখানে কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়া কবর সামনে নিয়ে নামায পড়া মকরূহ তাহরীমী। (দুরুল মুখতার, আলমগীরী)

মাসআলাঃ জবর দখল জায়গায় বা পরের ক্ষেতে যেখানে শস্য মওজুদ রয়েছে বা জীবিত ক্ষেতের উপর নামায পড়া মকরূহ তাহরীমী।

(দুরুল মুখতার, আলমগীরী)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ কবরস্থানে যে জায়গাটি নামাযের জন্য নির্দিষ্ট এবং সেই জায়গায় যদি কোন কবর না থাকে, তাহলে ওখানে নামায পড়লে কোন ক্ষতি নেই। মকরূহ সে সময়ই হয়ে থাকে, যখন কবর সামনে হয় এবং নামাযী ও কবরের মাঝখানে সুতরা পরিমাণ কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে। অন্যথায় যদি ডানে বামে বা পিছনে কবর থাকে বা সুতরা বরাবর কোন কিছু প্রতিবন্ধক হিসেবে থাকে, তাহলে কোন মকরূহ নয়। (আলমগীরী, গুনীয়া, কাজী খাঁ)

মাসআলাঃ কাফিরদের ইবাদতখানায় নামায পড়া মকরূহ তাহরীমী। কারণ সেটা শয়তানের জায়গা, বরং ওখানে যাওয়াটাও নিষেধ।

মাসআলাঃ উল্টা কাপড় পরিধান করে বা এমনি গায়ের উপর রেখে নামায পড়া মকরূহ তাহরীমী। অনুরূপ আচকান, শিরওয়ানী ইত্যাদির বোতাম না লাগিয়ে যদি নামায পড়া হয় এবং আচকান ইত্যাদির নীচে কোর্তা ইত্যাদি না থাকে ও বুক খোলা থাকে, তাহলে মকরূহ তাহরীমী। আর যদি নীচে কোর্তা ইত্যাদি থাকে, তাহলে মকরূহ তনযীহী। (বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ যে কাপড়ে কোন প্রাণীর ছবি থাকে, সে কাপড় পরে নামায পড়া মকরূহ তাহরীমী । নামায ছাড়াও এরকম কাপড় পরা না জায়েয।

মাসআলাঃ যদি ছবি নামাযীর মাথার উপর অর্থাৎ ছাদে অঙ্কিত হয় বা লটকানো থাকে, বা সিজদার জায়গায় থাকে, সেটার উপর সিজদা দেয়া হয়, তাহলে মকরূহ তাহরীমী। অনুরূপ নামাযীর সামনে, ডানে বামে ছবি থাকাটা মকরূহ তাহরীমী। পিছনে থাকাটাও মকরূহ, যদিওবা সামনে ও ডানে বামে থাকার চেয়ে কম মকরূহ।

মাসআলাঃ যদি ছবি বিছানায় থাকে এবং ওটার উপর সিজদা পতিত না হয়, তাহলে মকরূহ নয়। (হেদায়া, ফতহুল কদীর)

মাসআলাঃ ছবি যদি কোন প্রাণীর না হয়, যেমন পাহাড়, নদী, গাছ, ফুল, পাতা ইত্যাদির হয়ে থাকে, কোন ক্ষতি নেই। (ফত্হুল কদীর)

মাসআলাঃ থলি বা পকেটে ছবি অদৃশ্যভাবে থাকলে নামায মকরূহ হয় না।

(দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ ছবি সম্বলিত কাপড়ের উপর অন্য কাপড় বিছায়ে নিলে নামায মকরূহ হবে না। (রদ্দুল মুহতার)

ছবি যদি জিল্লতীময় জায়গায় থাকে, যেমন জুতা খোলার জায়গায় বা এমন জায়গায় যেখানে পা মোছা হয়, তাহলে নামাযে কোন মকরূহ নেই। তবে শর্ত হলো যে, সেটার উপর যেন সিজদা না পড়ে। এ রকম ঘরে হলেও কোন মকরূহ নেই। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ যদি ছবি এতটুকু ছোট হয় যে দাঁড়িয়ে তাকালে সেটার শরীরের অংগসমূহ পৃথক পৃথক দেখা না যায়, তাহলে এ ধরণের ছবি নামাযীর আগে পিছে ডানে বামে থাকলে নামায মকরূহ হবে না।

মাসআলাঃ যদি ছবির পূর্ণ চেহারাটা বিলীন করে দেয়া হয়, তাহলে কোন মকরূহ নেই। (হেদায়া ইত্যাদি)

মাসআলাঃ ছবির উল্লেখিত আহকাম হচ্ছে নামাযের ব্যাপারে। কিন্তু ছবি রাখা সম্পর্কে হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে, ওই ঘরে রহমতের ফিরিশতা আসে না অর্থাৎ যদি অবজ্ঞার সাথে না হয় এবং এতটুকু ছোটও না হয় যে দাঁড়ায়ে তাকালে শরীরের অংগসমূহ পৃথক পৃথক দেখা না যায়। (ফত্হুল কদীর ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ ছবি তোলা ও তোলানো উভয়টা হারাম। হাতে হোক বা ক্যামেরায় হোক, উভয়ের একই হুকুম।

মকরূহ তনযীহী

মাসআলাঃ রুকু সিজদায় বিনা প্রয়োজনে তিন তসবীহের কম বলা মকরূহ তনযীহ। তবে যদি সময় সংকীর্ণ হয় বা গাড়ী চলে যাবার ভয় হয়, তাহলে কোন দোষ নেই।

মাসআলাঃ অন্য কাপড় মওজুদ থাকা অবস্থায় কাজ কর্মের কাপড় দ্বারা নামায পড়া মকরূহ তনযীহ, অন্যথায় মকরূহ নয়।

মাসআলাঃ অলসতা করে খালি মাথায় নামায পড়া অর্থাৎ টুপি বোঝা বা গরম মনে করে খালি মাথায় নামায পড়া মকরূহ তনযীহ। আর যদি নামাযকে নগন্য মনে করে খালি মাথায় নামায পড়ে অর্থাৎ যদি এ রকম মনে করা হয় যে নামায কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, যার জন্য টুপি, পাগড়ী পরা চাই, তাহলে এটা কুফরী এবং যদি আজেযী, ইনকেসারী প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে খালি মাথায় নামায পড়া হয়, তাহলে মুস্তাহাব। (দুর্রুল মুখতার, বাহার)

মাসআলাঃ নামাযে টুপি পড়ে গেলে উঠায়ে নেয়া আফজল, যদি আমলে কছীর না হয়; অন্যথায় নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। বার বার উঠাতে হলে, বাদ দেয়া চাই। আর যদি না উঠানোর উদ্দেশ্য আজেযী ইনকেসারী হয়ে থাকে, তাহলে না উঠানোটাই আফজল। (দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ মাথা থেকে বালি বা খরকুটা পরিষ্কার করা মকরূহ, যদি এর দ্বারা নামাযে কোন অস্বস্তিবোধ না হয়। যদি অহংকারের কারণে পরিষ্কার করা হয়, তাহলে মকরূহ তাহরীমী। আর যদি অস্বস্তিকর হয় বা মন বিগড়ে যায়,

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহলে কোন দোষ নেই। নামাযের পর পরিষ্কার করার বেলায় কোন ক্ষতি নেই। বরং পরিষ্কার করে ফেলা উচিত। যেন কোন রিয়ার ধারণা না আসে।

(আলমগীরী)

মাসআলাঃ এ রকম প্রয়োজনবোধে কপাল থেকে ঘাম মুছা বরং সে ধরণের যাবতীয় আমলে কলীল (সামান্য কাজ) যা নামাযীর জন্য উপকারী, জায়েয। আর যেটা উপকারী নয়, সেটা মকরূহ। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ নামাযে নাক দিয়ে পানি বের হলে, সেটা মাটিতে পড়ার থেকে মুছে ফেলা উত্তম। আর যদি মসজিদে হয়, তাহলে মুছে ফেলাটা প্রয়োজন। যেন মসজিদে পতিত না হয়। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ নামাযে বিনা কারণে চার জানু হয়ে বসা মকরূহ। তবে কোন ওজর থাকলে ক্ষতি নেই। অবশ্য নামায ছাড়া এ রকম বসলে কোন ক্ষতি নেই।

(দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ সিজদায় যাবার সময় হাঁটুর আগে হাত রাখা এবং সিজদা থেকে উঠার সময় বিনা কারণে হাতের আগে পা উঠানো মকরূহ। (গুনীয়া)

মাসআলাঃ রুকুতে মাথা পিঠ থেকে উপরে বা নীচে রাখা মকরূহ। (গুনীয়া)

মাসআলাঃ উঠার সময় আগে পরে পা উঠানো মকরূহ।

মাসআলাঃ উকুন বা মশা যখন বিরক্ত করে, তখন মেরে ফেললে কোন ক্ষতি নেই। তবে যেন আমলে কছীর প্রকাশ না পায়। (গুণীয়া, বাহার)

মাসআলাঃ মসজিদের ছাদে নামায পড়া মকরূহ। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ কোন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বা বসে কথা বলছে। যদি তার কথার দ্বারা মন পরিবর্তন না হয়, তাহলে তার পিছনে নামায পড়া মকরূহ নয়।

(দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ নামাযীর সামনে জলন্ত আগুন হওয়া মকরূহ। বাতি বা চেরাগ রাখাটা মকরূহ নয়। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ বিনা কারণে হাত দ্বারা মাছি, মশা তাড়ানো মকরূহ। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ যে সব জিনিস মন আকর্ষণ করে, সেগুলোর সামনে নামায মকরূহ। যেমন সাজসজ্জা, খেলাধুলা ইত্যাদি।

মাসআলাঃ নামাযের জন্য দৌড়ানো মকরূহ (রদ্দুল মুহতার)

নামায ভঙ্গের অজুহাতসমূহ

(কোন্ কোন্ অবস্থায় নামায ভঙ্গ করা জায়েয)

মাসআলাঃ কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি যদি সাহায্য প্রার্থনা করে, কোন নির্দিষ্ট নামাযী বা সাধারণ ভাবে যে কোন একজনকে আহবান করে বা কেউ পানিতে ডুবে যাচ্ছে বা আগুনে পুড়ে যাচ্ছে বা কোন অন্ধ পথিক কূপে পতিত হচ্ছে, এসব অবস্থায় নামায ভঙ্গ করা ওয়াজিব, যদি সেই নামাযী তাকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে। (দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ প্রস্রাব, পায়খানা অনুভব করলে অথবা কাপড় বা শরীরে এতটুকু নাপাকী দেখলে, যদ্বারা নামায নাজায়েয হয় না বা নামাযীকে কোন অপরিচিতা মহিলা স্পর্শ করলে, এসব অবস্থায় নামায ভঙ্গ করা মুস্তাহাব, যদি জমাতের ওয়াক্ত থাকে আর যদি প্রস্রাব, পায়খানার জোর খুব বেশী হয়, তাহলে জমাত চলে গেলেও ভঙ্গ করা যাবে। তবে ওয়াক্তের কথা খেয়াল রাখতে হবে।

(রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ সাপ ইত্যাদি কামড়াবে বলে যদি যথার্থ ভয় হয়, তাহলে সাপ ইত্যাদি মারার জন্য নামায ভঙ্গ করা জায়েয।

মাসআলাঃ কোন পশু পালিয়ে গেলে ওটাকে ধরার জন্য বা ছাগলের পালে বাঘের আক্রমন হওয়ার আশংকা করলে নামায ভঙ্গ করা জায়েয।

মাসআলাঃ নিজের বা পরের এক দিরহাম (দশটাকা) বরাবর ক্ষতি হওয়ার আশংকা হলে, যেমন দুধ বিনষ্ট হওয়া বা মাংস, তরিতরকারী, ভাত,রুটি ইত্যাদি পুড়ে যাওয়ার ভয় হলে বা এক দিরহাম পরিমাণ কোন জিনিষ চুরি হয়ে যাবার ভয় হলে, এসব অবস্থায় নামায ভঙ্গ করার অনুমতি রয়েছে।

(দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ যদি নফল নামায পড়ার অবস্থায় মা বাপ, দাদা দাদি প্রমুখ উর্ধতনের পক্ষ থেকে ডাক দেয়া হয় এবং তার নামাযরত অবস্থার কথা তাদের জানা না থাকে, তাহলে নামায ভঙ্গ করবে এবং ডাকের জবাব দিবে।

(দুর্রুল মুখতার, রদ্দল মুহতার)

মসজিদের হুকুমাদির বর্ণনা

আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে ভাল জায়গা হচ্ছে মসজিদ এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গা হচ্ছে বাজার। যখন মসজিদে যাবেন, তখন দরূদ শরীফ পড়ে এ দুআটি

pdf By Syed Mostafa Sakib

পড়বেন رَبِّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ـ

এবং যখন বের হবেন তখন দরূদ শরীফ পড়ে এ দুআটি বলবেনঃ

رَبِّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ

মাসআলাঃ কাবা শরীফের দিকে পা প্রসারিত করা, শোবার সময় হোক বা জাগ্রত অবস্থায় হোক, মকরূহ। অনুরূপ ছোট শিশুদের পা কিবলার দিকে করে শোয়ানো মকরূহ এবং এর গুনাহ শোয়ানোকারীরই হবে। (রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ মসজিদকে রাস্তা বানানো অর্থাৎ এর ভিতর দিয়ে গমন করা নাজায়েয। যদি এটা নিয়মিত করে, তাহলে ফাসিক বলে গণ্য হবে। যদি কেউ এ নিয়তে মসজিদে গেল এবং মাঝখানে গিয়ে অনুতপ্ত বোধ করলো, তাহলে যে দরজা দিয়ে বের হবার ছিল, ওটা বাদ দিয়ে অন্য দরজা দিয়ে বের হবে বা ওখানে নামায পড়বে, অতঃপর বের হবে। আর যদি ওযু থাকে, তাহলে যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছে, সে দরজা দিয়ে বের হয়ে আসবে।

(দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ শিশু বা পাগল, যার মধ্যে দুর্গন্ধ আছে বলে মনে হয়, মসজিদে নিয়ে যাওয়া হারাম। আর যদি নাপাকীর ভয় না থাকে, তাহলে মকরূহ।

মাসআলাঃ মসজিদের দেয়ালে বা মেহরাবে কুরআনের আয়াত লিখা ভাল নয়। কারণ ওখান থেকে পতিত হয়ে পায়ের নীচে পড়ার আশংকা রয়েছে। এ বেহুরমতির কারণে বালিশ, বিছানা, পোষাক, দস্তরখানা, জায়নামাযেও আয়াত, হাদীছ বা নাত ইত্যাদি লিখা নিষেধ। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ মসজিদে ওযু করা বা মসজিদের দেয়ালে বা মাদুরের উপর বা নীচে নাকটি, থুথু, ময়লা ইত্যাদি ফেলা নিষেধ। যদি নাকটি বা থুথু ফেলার প্রয়োজন হয়, কাপড়ে নিয়ে নিবে। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ নাপাকী নিয়ে মসজিদে যাওয়া নিষেধ, যদিওবা সেই নাপাকী মসজিদে না লাগে। অনুরূপ যার শরীরে নাপাকী লেগে থাকে, তারও মসজিদে যাওয়া নাজায়েয। (রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ নাপাক তৈল মসজিদে জ্বালানো বা নাপাক নির্মান সামগ্রী মসজিদ তৈরীর কাজে ব্যবহার করা নিষেধ।

মাসআলাঃ মসজিদে কোন জায়গা যদি ওযু করার জন্য প্রথম থেকে মসজিদ তৈরীকারী মসজিদের সমস্ত কাজ সমাধা করার আগে তৈরী করে থাকে, যেখানে নামায পড়া হয় না, তাহলে ওখানে ওযু করা যেতে পারে। এ রকম রেকাব ইত্যাদি জাতীয় বরতনেও ওযু করা যায়, তবে শর্ত থাকে যে, যেন খুবই

সর্তকতার সাথে করা হয়, যাতে কোন ছিট্‌কা মসজিদে পতিত না হয়।

(আলমগীরী)

মাসআলাঃ ওযুর পর হাত–মুখের পানি মুছে মসজিদে ঝাড়া নাজায়েয। (বাহার)

মাসআলাঃ মসজিদের ময়লা পরিষ্কার করে এমন কোন জায়গায় যেন ফেলা না হয়, যেখানে অবমাননা হয়। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ মসজিদে গাছ লাগানোর অনুমতি নেই। তবে মসজিদের যদি এর প্রয়োজন হয় অর্থাৎ মাটিতে আদ্রতা রয়েছে, খুঁটি অটল থাকে না, তখন সেই আদ্রতাকে চুষে নেয়ার জন্য গাছ লাগানো যায়। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ মসজিদের সম্পূর্ণ কাজ সমাধা করার আগে মসজিদের আসবাব সামগ্রী রাখার জন্য মসজিদে হুজরা তৈরী করা যায়। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ মসজিদে ভিক্ষা করা হারাম এবং সেই ভিক্ষাকারীকে ভিক্ষা দেয়াটাও নিষেধ।

মাসআলাঃ মসজিদে হারানো জিনিষ তালাশ করা নিষেধ। (মুসলিম)

মাসআলাঃ কাঁচা রসুন, পিঁয়াজ খেয়ে মসজিদে গমন করা নাজায়েয, যে পর্যন্ত দুর্গন্ধ অবশিষ্ট থাকে। এ হুকুম সে রকম প্রত্যেক জিনিষের বেলায় প্রযোজ্য যেটাতে দুর্গন্ধ আছে। এ সব দুর্গন্ধ থেকে মসজিদকে মুক্ত রাখা চাই এবং দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত না হয়ে মসজিদে না যাওয়া চাই। এমনকি যে রোগী কোন দুর্গন্ধময় ঔষধ ইত্যাদি ব্যবহার করে, তার মসজিদে না যাওয়া চাই। বরং কুষ্ঠ রোগী ও অন্য দুর্গন্ধময় রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে, এমন কি সে ধরণের দুর্ব্যবহার–কারীকেও, যে লোকদেরকে মুখের দ্বারা কষ্ট দেয়, মসজিদে যাওয়া থেকে বাধা দান করা যাবে। (দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ মসজিদে মুবাহ কথা বলাবও অনুমতি নেই। উচ্চস্বরে কথা বলাও নাজায়েয। (দুর্রুল মুখতার, ছগীর)

মাসআলাঃ মসজিদকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বাদুড়, কবুতর ইত্যাদির নীড় ভেঙ্গে ফেললে কোন দোষ নেই। (দুর্রুল মুখতার, বাহার)

মাসআলাঃ মহল্লার মসজিদে নামায পড়া আফজল যদিওবা জমাত জামে মসজিদ থেকে ছোট হয়। বরং মহল্লার মসজিদে যদি জমাত না হয়, তা হলে একাকী গিয়ে এবং আযান ও ইকামত বলে একাকী নামায পড়াটা জামে মসজিদের জমাত থেকে আফজল। (ছগীর ও অন্যান্য কিতাব)

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিতরের নামায

বিতরের নামায ওয়াজিব। যদি কোন কারণে বিতরের নামায পড়া না হয়, কাযা ওয়াজিব। (আলমগীরী, হেদায়া)

বিতরের নামায মগরিবের নামাযের মত এক সালামে তিন রাকাত। বিতরে প্রথম বৈঠক ওয়াজিব অর্থাৎ দুরাকাত পড়ে বসবে এবং তাশাহুদ পড়ে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে এবং তৃতীয় রাকাতেও সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। এ তৃতীয় রাকাতে সূরা পড়ার পর উভয় হাত উঠায়ে কানের লতি পর্যন্ত নিয়ে যাবে এবং 'আল্লাহ আকবর' বলে পুনরায় হাত বেঁধে নিয়ে দুআ কুনুত পড়বে। দুআ কুনুত পড়া শেষ হলে আল্লাহ আকবর বলে রুকুতে যাবে এবং অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করবে।

মাসআলাঃ দুআ কুনুত পড়া ওয়াজিব। এতে কোন বিশেষ দুআ পড়া ওয়াজিব নয়। অবশ্য সে সব দুআ পাঠ করা উত্তম, যেগুলো হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। সবচেয়ে অধিক প্রসিদ্ধ দুআ কুনুত হচ্ছে এটি–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ۔

(আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ওয়া নাস্তাগফিরুকা ওয়া নুমিনু বিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়া নুছনি আলাইকাল খাইর, ওয়া নাশকুরুকা ওয়া নাকফুরুকা ওয়া নাখলাউ ওয়া নাতরুকু ওয়ালা মাঁইয়্যাফ জুরুকা। আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া লাকা নুসাল্লী ওয়া নাসজুদু ইলাইকা নাসয়া ওয়া নাহফিদু ওয়া নারজু রাহমাতাকা ওয়া নাখশা আজাবাকা ইন্না আজাবাকা বিল কুফফারে মুলহিক)

মাসআলাঃ যে দুআ কুনুত পড়তে না পারে, সে এ দুআটি পড়বে –

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(রাববানা আতিনা ফিদদুনিয়া হাসানা তাঁও ওয়া ফিল আখেরাতে হাসানা তাঁও ওয়া কিনা আযাবান নার।) যে এটাও বলতে পারে না, সে তিন বার

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ বলবে। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ দুআ কুনুত সব সময় প্রত্যেকে নিম্নস্বরে পড়বে, ইমাম হোক বা মুক্তাদী হোক বা একাকী হোক এবং কাযা হোক বা আদা বা অন্য সময়ে যে

কোন অবস্থায় নিম্নস্বরে পড়বে। (রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ বিতর ব্যতীত অন্য কোন নামাযে দুআ কুনুত পড়বে না। অবশ্য যদি কোন বড় দুর্যোগ আসে, তাহলে ফজরের নামাযেও পড়া যেতে পারে। এ সময়ও বিতরের মত রুকুতে যাবার আগে পড়বে।

(দুরুল মুখতার , বাহার ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ যদি প্রথম বৈঠকের কথা ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া হয়, তাহলে পুনরায় বসার অনুমতি নেই বরং শেষে সহ সিজদা করবে।

(দুরুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ যদি দুআ কুনুতের কথা ভুলে যায় এবং রুকুতে গিয়ে স্মরণ হয়, তাহলে রুকুতে পড়বে না এবং পুনরায় দাঁড়িয়েও পড়বে না বরং ওটা বাদ দিয়ে নামাযের শেষে সহ সিজদা করলে, নামায হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ বিতরের তিন রাকাতেই কিরাত পড়া ফরয এবং প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পড়া ওয়াজিব।

মাসআলাঃ উত্তম হচ্ছে প্রথম রাকাতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى বা قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ দ্বিতীয় রাকাতে اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ এবং তৃতীয় রাকাতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পড়া। মাঝেমধ্যে অন্য সূরাও পড়বে।

মাসআলাঃ বিতরের নামায বিনা কারণে বসে বা বাহনে পড়া যায় না।

(দুরুল মুখতার)

মাসআলাঃ সাহেবে তরতীবের (যার কোন ওয়াক্ত বাদ পড়েনি) যদি এটা স্মরণ হয় যে বিতরের নামায পড়েনি এবং সময়ও রয়েছে, তাহলে ফজরের নামায বাতিল বলে গণ্য হবে। যদিওবা নামায শুরু করার আগে বা মাঝখানে স্মরণ হয়।

(দুরুল মুখতার, বাহার)

মাসআলাঃ বিতরের নামায জমাত সহকারে শুধু রমযানেই পড়া যায়। রমযান ভিন্ন অন্য সময় মকরূহ। (হেদায়া ও অন্যান্য কিতাব)

এ মুবারক মাসে জমাত সহকারে পড়াটাই মুস্তাহাব।

মাসআলাঃ যে ইশার নামায জমাত সহকারে পড়ে নাই, সে বিতরের নামায একাকী পড়বে, যদিওবা তারাবীহ জমাত সহকারে পড়ে থাকে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুন্নাত ও নফলসমুহের বর্ণনা

সুন্নাতের মধ্যে কতেক মুয়াক্কাদা,যার ব্যাপারে শরীয়তে তাগিদ দেয়া হয়েছে। এ ধরনের সুন্নাত বিনা কারণে একবার বর্জন করলে সমালোচনার ভাগী হয় এবং অভ্যাসে পরিণত হলে, ফাসিক মরদুদে গণ্য হয়। এর বর্জন হারামের কাছাকাছি এবং এর বর্জনকারীদের বেলায় শাফায়াত থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয় রয়েছে। সুন্নাতে মুয়াক্কাদাকে সুন্নাতুল হুদাও বলা হয়। কতেক সুন্নাত গাইর মুয়াক্কাদা, যাকে সুন্নাতে যায়েদাও বলা হয়। এ ধরনের সুন্নাতের ব্যাপারে শরীয়তে তেমন জোর দেয়া হয়নি। কোন সময় এটাকে মুস্তাহাব ও মনদুবও বলা হয়। নফল হচ্ছে যেটা করলে ছওয়াব এবং না করলে কোন গুনাহ নেই।

মাসআলাঃ ফজরের ফরয নামাযের আগে দু'রাকাত, জোহরের ফরযের আগে চার রাকাত এবং পরে দু'রাকাত, মগরিবের ফরযের পর দু'রাকাত, ইশার পর দুরাকাত এবং জুমার আগে চার রাকাত ও পরে চার রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। তবে জুমার পর চার রাকাত ছাড়া আরও দু'রাকাত মোট ছয় রাকাত পড়া উত্তম। (গুণীয়া, বাহার)

মাসআলাঃ ফজরের সুন্নাত সবচেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মুয়াক্কাদা, এমন কি অনেক উলামা একে ওয়াজিব বলেন। সুতরাং এটা বিনা কারণে বসে, বাহনের উপর বা চলন্ত গাড়ীর উপর পড়া যায় না। (ফতহুল কদীর ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ ফজরের নামায কাযা হয়ে গেল এবং সূর্য ডুবার আগে কাযা পড়া হলো, তাহলে সুন্নাতও কাযা পড়বে। অন্যথায় কাযা আদায় হলো না। ফজর ভিন্ন অন্যান্য সুন্নাতসমূহ কাযা হলে এ সবের কাযা নেই।

মাসআলাঃ জোহর বা জুমার আগের সুন্নাত বাদ পড়লো এবং ফরয পড়ে নিল, তাহলে যদি সময় থাকে ফরযের পর পড়ে নিবে। পরের সুন্নাত সমূহ পড়ার পর এটা পড়া আফজল। (ফতহুল কদীর ও বাহার)

মাসআলাঃ ফজরের সুন্নাত কাযা হয়ে গেল এবং ফরয পড়ে নিল, তাহলে এখন আর সুন্নাতের কাযা নেই। অবশ্য সূর্য উঠার পর পড়ে নেয়াটা ভাল এবং সূর্য উঠার আগে পড়া নিষেধ। (রদ্দুল মুহতার, বাহার)

মাসআলাঃ ফজরের সুন্নাতের প্রথম রাকাতে আলহামদুর পর সূরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকাতে আলহামদুর পর সূরা ইখলাস পড়া সুন্নাত।

মাসআলাঃ জমাত কায়েম হওয়ার পর ফজরের সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন নফল বা সুন্নাত নামায শুরু করা নাজায়েয। ফজরের সুন্নাতও তখনই পড়া যাবে যদি ধারণা হয়, সুন্নাত শেষ করে জমাতে শরীক হওয়া যাবে, যদিওবা বৈঠকে

হোক না কেন, জমাত থেকে একটু দুরে সুন্নাত পড়ে নিবে। জমাতের কাতারের নিকট পড়াটা নিষেধ।

মাসআলাঃ যদি এটা ধারণা হয় যে নফল পড়ার দ্বারা ফরয বা জমাত চলে যাবে, তাহলে এমতাবস্থায় নফল পড়া নাজায়েয।

মাসআলাঃ ইশা ও আসরের আগে এবং ইশার পরও চার রাকাত এক সালামে পড়া মুস্তাহাব। এটাও ইখতিয়ার রয়েছে যে ইশার পর দুরাকাত পড়লেই মুস্তাহাব আদায় হয়ে যাবে। অনুরূপ যোহরের পর চার রাকাত পড়া মুস্তাহাব। হাদীছ শরীফে এটা আদায়কারীদের জন্য আগুন হারাম হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

মাসআলাঃ যোহর, মাগরিব ও ইশার পর যে সুন্নাত আছে, এর মধ্যে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন যোহরের পর চার রাকাত পড়লে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ও মুস্তাহাব উভয়টা আদায় হয়ে যাবে। এ রকমও হতে পারে যে মুয়াক্কাদা ও মুস্তাহাব উভয়টা এক সালামে আদায় করা যায় অর্থাৎ চার রাকাত পর সালাম ফিরাবে এবং এতে কেবল সুন্নাতের নিয়তই যথেষ্ট। মুয়াক্কাদা বা মুস্তাহাবের আলাদা আলাদা নিয়তের প্রয়োজন নেই। উভয়টা আদায় হয়ে যাবে। (ফতহুল কদীর, বাহার)

মাসআলাঃ নফল ও সুন্নাতের প্রত্যক রাকাতে কিরাত ফরয।

মাসআলাঃ সুন্নাত ও নফল স্বেচ্ছায় শুরু করলে ওয়াজিব হয়ে যায়। যদি ভঙ্গ করা হয়, কাযা পড়তে হবে।

মাসআলাঃ নফল ওজর ছাড়াও বসে পড়া যায়, কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়ার মধ্যে দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে। (হেদায়া)

মাসআলাঃ যদি নফল বসে পড়া হয়, তাহলে এমনভাবে বসবে যেমন কায়দায় (বৈঠকে) বসা হয়। কিন্তু কিরাতের সময় হাত বাঁধা থাকবে, যেমন দাঁড়ানো অবস্থায় হাত বাঁধা হয়। (দুরুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ বিতরের পর যে দু'রাকাত নফল পড়া হয়, ওটার প্রথম রাকাতে اذا زلزلت الارض এবং দ্বিতীয় রাকাতে قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ পড়া উত্তম।

মাসআলাঃ সুন্নাত ও নফল ঘরে পড়া উত্তম। (হেদায়া ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ সুন্নাত ও ফরযের মাঝখানে যেন কথা বলা না হয়, কারণ ছওয়াব কমে যায়। (ফতহুল কদীর) এ ধরণের প্রত্যেক কাজ, যা হারামের বিপরীত, একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। (তনবীর, বাহার)

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহাজ্জুদের নামায

এশার নামায পড়ে শোয়ার পর যখনই ঘুম ভাঙ্গবে, তখনই তাহাজ্জুদের সময়। তবে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে পড়া আফযল। তাহাজ্জুদ হচ্ছে সুন্নাত এবং সুন্নাতের নিয়তেই পড়তে হয়। এটা কমপক্ষে দু'রাকাত এবং বেশীর মধ্যে আট রাকাত পড়া যায়। (ফতহুল কদীর, আলমগীরী)

মাসআলাঃ দিনের নফলে এক সালামে চার রাকাতের অধিক এবং রাতের নফলে এক সালামে আট রাকাতের অধিক রাকাত পড়া মকরূহ। দিনে হোক বা রাতে চার রাকাতের পর সালাম ফিরানো আফযল। (দুরুল মুখতার)

মাসআলাঃ যদি দু'রাকাতের অধিক নফলের নিয়ত করা হয়, তাহলে প্রতি দু'রাকাতে বৈঠক করতে হবে।

বিঃদ্রঃ এক সাথে দু'রাকাত থেকে অধিক নফল নামায পড়ার শর্তসমূহ কঠিন। তাই দু'রাকাত করে পড়াটাই সহজ।

ইশরাকের নামায

এটাও সুন্নাত। ফজর পড়ে দরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠে নিয়োজিত থাকবে। যখন সূর্য একটু উপরে উঠবে অর্থাৎ সূর্য উদিত হওয়ার পর বিশ মিনিট অতিবাহিত হবে, তখন দু'রাকাত পড়বে।

চাশতের নামায

এটাও সুন্নাত। এটা কমপক্ষে দু'রাকাত এবং বেশীর মধ্যে বার রাকাত এবং বার রাকাতই আফযল। এটার সময় হচ্ছে সূর্য ভালমতে উপরে উঠার পর থেকে স্থির হওয়ার আগ পর্যন্ত। কিন্তু উত্তম সময় হলো দিনের এক চতুর্থাংশে পড়া।

ইসতিহারার নামায

হাদীছ সমূহে বর্ণিত আছে যে, যখন কোন ব্যক্তি কোন কাজ করার ইচ্ছে করে, তখন দু'রাকাত নফল পড়বে, যার প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ এবং ২য় রাকাতে সুরা ফাতিহার পর قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পড়বে। অতঃপর নিম্নে বর্ণিত দুআটি পড়ে কিবলা মুখী হয়ে শুয়ে পড়বে। দুআর আগে ও পরে সূরা ফাতিহা ও দরূদ শরীফও পাঠ করবে। দুআটি হচ্ছে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ

فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ وَعَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدُرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ وَعَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ ۔

বাংলা উচ্চারণঃ (আল্লাহুমা ইন্নী আসতাখীরুকা বি ইলমিকা ওয়া আস্তাকদিরুকা বিকুদরাতিকা ওয়া আসআলুকা মিন ফাদলিকাল আযীমে ফাইন্নাকা তাকদিরু ওয়ালা আকদিরু ওয়া তালামু ওয়া লা আলামু ওয়া আনতা আল্লামুল গুয়ুব। আল্লাহুমা ইন কুনতা তালামু আন্না হাজাল আমরা খাইরুল লীফী দীনী ওয়া মাআশী ওয়া আকেবাতে আমর ফা আকদিরহু লী ওয়া ইয়াসসিরহুলী ছুম্মা বারিক লী ফীহে ওয়া ইন কুনতা তালামু আন্না হাজাল আমরা শাররুল লী ফী দীনী ওয়া মাআশী ওয়া আকেবাতে আমরী ফাআসরিফহু আন্নী ওয়া আছরিফনী আনহু ওয়া আকদির হু লিয়াল খাইরা হাইছু কানা ছুম্মা আরদিনি বিহি)

অর্থঃ হে আল্লাহ আমি তোমার জ্ঞানের ওসীলায় জ্ঞান ও তোমার শক্তির ওসীলায় শক্তি কামনা করছি এবং তোমার কাছে তোমার মহান করুণা ভিক্ষা করছি। কারণ, তুমিই প্রকৃত ক্ষমতাবান,আমার কোন ক্ষমতা নেই। তুমিই প্রকৃত জ্ঞান রাখ আর আমি জ্ঞান রাখি না। তুমি অদৃশ্য জ্ঞানী। হে আল্লাহ! আমার এ কাজটি যদি তোমার জ্ঞান মতে আমার জন্য মঙ্গলময় হয়, আমার ধর্ম, আমার জীবিকা এবং পরিনামে শুভ হয়, তাহলে এটা আমার জন্য নির্ধারিত ও সহজ করে দাও এবং এতে আমার জন্য বরকত দান কর। আর যদি তোমার জ্ঞানে এ কাজটি আমার জন্য, আমার ধর্ম, জীবিকা ও পরিণামে ক্ষতিকর হয়, তাহলে তুমি এটা আমার থেকে এবং আমাকে এটার থেকে ফিরায়ে দাও। আমার জন্য কল্যাণ দান কর, সেটা যেখানে হোক না কেন। অতঃপর সেটা দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট কর।

উপরোক্ত দোআর মধ্যে উল্লেখিত উভয় اَلْاَمْرَ এর স্থলে নিজের প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যের নাম নিবে যেমন সফরের উদ্দেশ্যে হলে প্রথম الامر এর স্থলে

pdf By Syed Mostafa Sakib

هٰذَا السَّفَرُ شَرٌّ لِّيْ এবং দ্বিতীয় الامر এর স্থলে هٰذَا السَّفَرُ خَيْرٌ لِّيْ বলবে (গুণীয়া)

মাসআলাঃ নেককাজসমূহ যেমন হজ্ব, জিহাদ ইত্যাদির জন্য কোন ইস্তেহারা নেই। অবশ্য সে সবের সময় নির্ধারণ করার জন্য ইস্তেহারা করা যেতে পারে। (গুণীয়া)

মাসআলাঃ উত্তম হচ্ছে কমপক্ষে সাতবার ইস্তেহারা করা। এরপর যেটার উপর মন বসে, সেটা করার মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। (অনেক বুযর্গানে কিরাম থেকে বর্ণিত আছে যে যদি স্বপ্নে সাদা বা সবুজ দেখে, তাহলে ভাল, আর যদি কাল বা লাল দেখে, সেটা মন্দ, এর থেকে বিরত থাকা চাই। (রদ্দুল মুহতার)

হাজতের নামাযঃ যখন আল্লাহর কাছে কারো কোন কিছু হাজত হয় বা কোন বন্দা থেকে কোন কাজ আদায় করতে হয় অথবা কোন মুশকিলের সম্মুখীন হয়, তখন খুব সতর্কতার সাথে ভাল করে ওযু করে দুই বা চার রাকাত নফল পড়বে। এর প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার আয়াতে কুরসী পড়বে। দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার সূরা ইখলাস পড়বে। তৃতীয় রাকাতে ফাতিহার পর একবার সূরা ফলক পড়বে এবং চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার সূরা নাস পড়বে। সালাম ফিরানোর পর তিনবার هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ পড়বে। অতঃপর তিনবার سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পড়বে। এরপর তিনবার যে কোন একটা দরূদ শরীফ পড়ে এ দুআটি পাঠ করবেঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَكِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً لَكَ هِيَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

তারাবীহের নামাযের বর্ণনা

তারাবীহের নামায বিশ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, যেটা রমযান শরীফে ইশার ফরজের পর প্রতিরাতে পড়া হয়।

মাসআলাঃ তারাবীহের সময় হচ্ছে ইশার ফরয পড়ার পর থেকে সুবহে সাদেক হওয়া পর্যন্ত । (হেদায়া)

মাসআলাঃ তারাবীহের জমাত সুন্নাতে কেফায়া যদি মসজিদের সবলোক তারাবীহের জামাত বাদ দেয়, তাহলে সবাই গুনাহগার হবে। আর যদি কেউ ঘরে একাকী পড়ে নেয়, তাহলে গুনাহগার হবে না। (হেদায়া, কাযী খান)

মাসআলাঃ রাত্রের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করা মুস্তাহাব এবং অর্ধরাতের পরে পড়লেও কোন মকরূহ নেই। (রদ্দুল মুহতার, বাহার)

মাসআলাঃ তারাবীহ পুরুষদের জন্য যেমন সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, তেমন মহিলাদের জন্যও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এটা বাদ দেয়া নাজায়েয। (কাযী খান)

মাসআলাঃ তারাবীহের বিশ রাকাত দুই দুই রাকাত করে দশবার সালাম ফিরায়ে পড়তে হয় এবং প্রতি চার রাকাত পড়ার পর চার রাকাত পড়তে যতটুকু সময় লাগে, আরাম করার জন্য সেই পরিমাণ বসা মুস্তাহাব। আরামের জন্য এ বসাকে তরবীহা বলা হয়। (আলমগীরী, কাযী খান)

মাসআলাঃ তারাবীহের বিশ রাকাতের শেষে পঞ্চম তরবীহাও মুস্তাহাব; তবে যদি পঞ্চম তরবীহা লোকদের কাছে বোঝা মনে হয়, তাহলে না করা চাই। (আলমগীরী, অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ তরবীহার মধ্যে এটা ইখতিয়ার রয়েছে যে, হয়তো চুপচাপ বসে থাকবে অথবা কিছু কলেমা, তসবীহ, কুরআন শরীফ ও দরূদ শরীফ পড়তে থাকবে। একাকী নফলও পড়া যায়। তবে জমাত সহকারে মকরূহ। (কাযী খান)

মাসআলাঃ যে ইশার ফরয নামায পড়েনি সে ফরয আদায় করার আগে তারাবীহ বা বিতর কোনটাই পড়তে পারে না।

মাসআলাঃ যে ইশার ফরয নামায একাকী পড়েছে এবং তারাবীহ জমাত সহকারে পড়েছে, সে বিতর একাকী পড়বে। (দুরুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ যদি ইশার ফরয নামায জমাত সহকারে পড়া হয় এবং তারাবীহ একাকী পড়া হয়, তাহলে বিতরের জমাতে শরীক হতে পারে। (দুরুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ তারাবীহের কিছু রাকাত বাকী থাকা অবস্থায় ইমাম যদি বিতর পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে ফরয নামায জমাত সহকারে পড়া হলে ইমামের সাথে বিতর আদায় করবে।

অতঃপর তারাবীহের অবশিষ্ট নামায পড়ে নিবে। এটাই উত্তম। তবে তারাবীহের নামায পূর্ণ করে বিতর একাকী পড়াটাও জায়েয। (আলমগীরী, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ লোকেরা তারাবীহ পড়ে নিল। এখন যদি অন্যরা পড়তে চায়, তাহলে একলা একলা পড়তে পারে, জমাতের অনুমতি নেই। (আলমগীরী) এক ইমাম যদি দু'মসজিদে তারাবীহ পড়ায় এবং উভয় মসজিদে পুরাপুরি পড়ায়, তাহলে নাজায়েয। তবে মুক্তাদী যদি উভয় মসজিদে পুরাপুরি পড়ে, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু দ্বিতীয় বার পড়ার সময় বিতর পড়া নাজায়েয, যদি প্রথমবার পড়ে থাকে। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ তারাবীহ মসজিদে জমাত সহকারে পড়াটা আফযল। যদি ঘরে জমাত সহকারে পড়া হয়, তাহলে জমাত বর্জনের গুনাহ হলো না। কিন্তু সেই ছওয়াব পাবে না, যা মসজিদে পড়লে পেত। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ প্রাপ্ত বয়স্কের পিছনে প্রাপ্ত বয়স্কের নামায হবে না। হেদায়ার প্রণেতা এটাকে সঙ্গত বলেছেন। ফত্হুল কদীরও এটাকে সঠিক বলেছেন। আলমগীরীতে এটা সঠিক হওয়ার ব্যাপারে জোর দিয়েছেন।

মাসআলাঃ সারা মাসের তারাবীহ সমূহে একবার কুরআন মজীদ খতম করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। দুবার খতম ভাল এবং তিন বার খতম করা আফজল। লোকদের অলসতার কারণে খতমে কুরআন যেন বাদ দেয়া না হয়। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ হাফেজকে পারিশ্রমিক দিয়ে তারাবীহ পড়ানো নাজায়েয। দাতা ও গ্রহীতা উভয় গুনাহগার হবে। পারিশ্রমিক কেবল ওটা নয়, যেটা আগে থেকে নির্ধারিত করে নিল-এত দিবে,এত নিবে। বরং যদি এটা জানা থাকে যে এখানে কিছু পাওয়া যায়, যদিওবা কোন কথাবার্তা না হয়ে থাকে, কারণ জানাটা শর্তের মত। তবে যদি বলে দেয়া হয় যে কিছু দেবে না বা কিছু নিবে না, কিন্তু লোকেরা হাফেজকে খেদমত বা সাহায্য হিসেবে কিছু দিলে কোন ক্ষতি নেই। (বাহারে শরীয়ত)

শবীনাঃ এক রাতে পুরা কুরআন মজিদ তারাবীহে খতম করাকে শবীনা বলা হয়। যেমন আমাদের যুগে প্রচলন আছে যে, হাফেজ এত তাড়াতাড়ি পড়ে যে বর্ণের উচ্চারণের কথাতো বাদই দিলাম, শব্দ পর্যন্ত বুঝে আসেনা। শ্রবণকারীদেরও এ অবস্থা হয়ে থাকে যে, কেউ বসে থাকে, কেউ শুয়ে থাকে,

কেউ ঝিমুতে থাকে, যখন ইমাম রুকুর তকবীর বলে, তখন সবাই তাড়াতাড়ি নিয়ত বেঁধে রুকুতে চলে যায়। এ রকম শবীনা নাজায়েয। হাফেজ যদি নাম প্রচারের জন্য এত তাড়াতাড়ি পড়ে, তাহলে এতে রিয়ার গুনাহ অতিরিক্ত যোগ হবে।

রোগীর নামায

যে ব্যক্তি রোগের কারণে দাঁড়াতে না পারে, সে বসে নামায পড়তে পারে। বসে বসে রুকু করবে অর্থাৎ সামনের দিকে ভালমতে ঝুঁকে 'সুবহানা রাব্বিউল আজীম' বলবে। পুনরায় সোজা হয়ে যাবে এরপর স্বাভাবিক অবস্থায় যেভাবে সিজদা করা হয়, সেভাবে সিজদা করবে। যদি বসেও পড়তে না পারে, তাহলে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়বে। এমনভাবে শুইবে যেন পা কিবলার দিকে থাকে এবং হাঁটু খাড়া থাকে এবং মাথার নীচে বালিশ ইত্যাদি দিবে, যেন মাথা উঁচু হয়ে মুখ কিবলার দিকে হয়ে যায়। রুকু, সিজদা ইশারায় করবে। অর্থাৎ মাথাকে যতটুকু ঝুঁকানো যায়, ততটুকু সিজদার জন্য ঝুঁকাবে এবং রুকুর জন্য এর থেকে কম ঝুঁকাবে। অনুরূপ ডান বা বাম পার্শ্ব হয়েও কিবলার দিকে মুখ করে পড়া যায়।

মাসআলাঃ রোগী যদি মাথার ইশারায়ও নামায পড়তে না পারে, তাহলে নামায বাদ দিবে। চোখ, ভ্রু বা মনের ইশারায় নামায পড়ার প্রয়োজন নেই। যদি ছয় ওয়াক্ত এ অবস্থায় অতিবাহিত হয়, তাহলে কাযাও আদায় করতে হবে না এবং ফিদয়ারও কোন প্রয়োজন নেই। আর যদি এ অবস্থায় ছয় ওয়াক্ত থেকে কম সময় অতিবাহিত হয়, তাহলে সুস্থ হওয়ার পর কাযা আদায় ফরয। মাথার ইশারায় পড়তে পারার মত সুস্থ হলেও কাযা আদায় করতে হবে।

(দুর্রুল মুখতার, বাহার)

মাসআলাঃ যে রোগীর এ রকম অবস্থা হয়ে যায় যে রাকাত ও সিজদার সংখ্যা স্মরণ থাকে না, তাহলে ওর নামায আদায় করার প্রয়োজন নেই।

(দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ সমস্ত ফরয নামায, বিতর, উভয় ঈদের নামায এবং ফজরের সুন্নাতে দাঁড়ানো ফরয। যদি বিনা কারণে এ সব নামায বসে পড়া হয়, তাহলে নামায আদায় হবে না। (দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ দাঁড়ানো যেহেতু ফরয সেহেতু বিনা কারণে এটা বর্জন করা অনুচিত। অন্যথায় নামায হবে না। এমন কি যদি লাঠি বা খাদেম বা দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো যায়, তাহলে সেভাবে দাঁড়িয়ে পড়াটা ফরয। যদি কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াতে পারে, তাহলে দাঁড়িয়ে নামায শুরু করা ফরয। অতঃপর বসে

pdf By Syed Mostafa Sakib

নামায পূর্ণ করবে, অন্যথায় নামায হবে না। সামান্য জ্বর, মাথা ব্যথা বা এ ধরনের নগন্য কষ্টসমূহ, যেগুলো নিয়ে মানুষ চলাফেরা করে, কখনও ওজর হিসেবে গণ্য হবে না। এরকম মামুলি অসুখে যে সব নামায বসে পড়া হবে, সেগুলো হবে না ওগুলোর কাযা অপরিহার্য। (গুনীয়া, বাহারে শরীয়ত ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ যে ব্যক্তির দাঁড়ালে ফোঁটা ফোঁটা পায়খানা হয় বা যখম থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়, কিন্তু বসে পড়লে, সে রকম হয় না, তাহলে অন্য কোন উপায়ে বন্ধ করা না গেলে ওর জন্য বসে পড়া ফরয।

মাসআলাঃ এতটুকু দুর্বল যে মসজিদে জমাত পড়ার জন্য গেলে দাঁড়িয়ে পড়তে পারে না, আর ঘরে পড়লে দাঁড়িয়ে পড়তে পারে, তাহলে ঘরেই পড়বে। জমাত সহকারে পড়তে পারলে ভাল, নতুবা একাকী পড়বে।

(দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ রোগী যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে গেলে কিরাত মোটেই পড়তে পারে না, তাহলে বসে পড়বে। কিন্তু দাঁড়িয়ে যদি যৎ সামান্যও পড়তে পারে, তাহলে যতটুকু দাঁড়িয়ে পড়া যায়, ততটুকু দাঁড়িয়ে পড়া ফরয। অবশিষ্ট নামায বসে পড়বে। (দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ রোগীর বিছানা নাপাক এবং অবস্থা এ রকম যে বদলানো হলেও নামায পড়াকালীন সময়ে পুনরায় সে রকম নাপাক হয়ে যাবে, তাহলে ওটার উপরই নামায পড়ে নিবে। আর যদি বদলালে এ রকম তাড়াতাড়ি নাপাক না হলেও রোগীর ভীষণ কষ্ট হয়, তাহলে সেই নাপাকীর উপর পড়ে নিবে।

(আলমগীরী, দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ পানির মধ্যে ডুবন্ত অবস্থায় যদি সেই সময়ও আমলে কছীর ব্যতীত ইশারায় পড়া যায়, যেমন সাঁতরানো অবস্থায় লাকড়ি ইত্যাদির যদি আশ্রয় পাওয়া যায়, তাহলে নামায পড়া ফরয। অন্যথায় অপারগ হিসেবে মাফ। তবে বেঁচে গেলে কাযা আদায় করতে হবে। (দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

কাযা নামাযের বর্ণনা

বিনা কারণে শরয়ী নামায কাযা করা বড় মারাত্মক গুনাহ। এর কাযা আদায় করা ফরয এবং আন্তরিকভাবে তওবা করা চাই। তওবা বা হজ্বে মকবুল দ্বারা বিলম্বের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ কাযা আদায় করার পরই তওবা শুদ্ধ হয়। জিম্মায় যেটা বাকী আছে, সেটা আদায় না করে তওবা করলে তওবা হবে না। কারণ যেটা জিম্মায়

ছিল, সেটা এখনও পড়ার বাকী রয়েছে। অতএব যখন গুনাহ থেকে ফিরে আসা হলো না, তখন তওবা কিভাবে হতে পারে। (রদ্দুল মুহতার)

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যে, গুনাহের উপর অটল রয়ে ক্ষমা প্রার্থনাকারী ঐ লোকের মত, যে স্বীয় সৃষ্টিকর্তার সাথে রসিকতা করে।

মাসআলাঃ যে বিষয়ে বান্দাকে হুকুম করা হয়েছে, সেটা যথাসময়ে পালন করাকে আদা বলা হয় এবং সময় চলে যাওয়ার পর করাকে কাযা বলা হয়।

মাসআলাঃ ওয়াক্তের মধ্যে তকবীর তাহরীমা বাঁধা হলে নামায কাযা হবে না, বরং আদা বলে গণ্য হবে। কিন্তু ফজর, জুমা ও দুই ঈদের নামায যদি সালাম ফিরানোর আগে ওয়াক্ত চলে যায়, তাহলে নামায আদায় হবে না।

(দুর্রুল মুখতার, বাহার)

মাসআলাঃ ঘুমে বা ভুলে নামায কাযা হয়ে গেল, তখন এর কাযা আদায় করা ফরয। অবশ্য এর জন্য কাযার গুনাহ হবে না। তবে জাগা মাত্রই বা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে যদি মকরূহ ওয়াক্ত না হয়, তখনই পড়ে নেয়া চাই, বিলম্ব করা মকরূহ। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ ফরযের কাযা ফরয, ওয়াজিবের কাযা ওয়াজিব এবং সুন্নাতের কাযা সুন্নাত অর্থাৎ সেসব সুন্নাত, যেটার কাযা আছে যেমন ফজরের সুন্নাত, যদি ফরয বাদ পড়ে যায় যেমন যোহরের আগের সুন্নাত যদি ওয়াক্ত বাকী থাকে।

(আলমগীরী, দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ কাযার জন্য কোন ওয়াক্ত নির্দিষ্ট নেই। জীবনে যখনই পড়বে, দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু সূর্য্যোদয়, সূর্যাস্ত ও স্থিরের সময় পড়লে হবে না। কারণ এ তিন সময়ে নামায নাজায়েয। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ যে নামায যে রকম বাদ পড়েছে, সেটা সেরকম পড়া হবে। যেমন সফরে নামায কাযা হলো, তাহলে চার রাকাত বিশিষ্ট নামায দু'রাকাতই পড়া হবে, যদিওবা মুকীম অবস্থায় পড়া হয়। এবং যেটা মুকীম অবস্থায় বাদ পড়েছে, সেটা চার রাকাতের কাযা চার রাকাতই পড়তে হবে, যদিও বা সফরে পড়া হয়।

অবশ্য কাযা পড়ার সময় কোন ওজর থাকলে, সেটা গ্রাহ্য হবে। যেমন যে ওয়াক্তটা বাদ পড়লো; যে সময় দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সামর্থবান ছিল। কিন্তু এখন দাঁড়াতে পারছে না। তাই বসে পড়বে বা এখন কেবল ইশারাই পড়তে পারে, তাহলে ইশারায় পড়বে এবং সুস্থ হওয়ার পর পুনরায় আদায় করার প্রয়োজন নেই। (আলমগীরী, দুর্রুল মুখতার)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ এমন রোগীদের, যে ইশারায়ও নামায পড়তে পারে না, যদি এ রকম অবস্থায় পূর্ণ ছয়টি ওয়াক্ত অতিবাহিত করে, তাহলে যে নামাযগুলো বাদ পড়েছে, সেটার কাযা ওয়াজিব নয়। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ পাগল অবস্থায় যে নামাযসমুহ বাদ পড়ে, ভাল হওয়ার পর সেটার কাযা ওয়াজিব নয়, যদি পূর্ণ ছয় ওয়াক্ত বরাবর পাগল থাকে। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ যদি ওয়াক্তের মধ্যে এতটুকু সুযোগ থাকে যে সংক্ষিপ্তভাবে পড়লে উভয়টা পড়া যায় এবং ভালমতে পড়তে গেলে উভয় নামায পড়ার সুযোগ থাকে না, তাহলে এরকম অবস্থায়ও তরতীব ফরয এবং জায়েয সমত যতটুকু সংক্ষেপ করা যায়, ততটুকু সংক্ষেপ করবে। (আলমগীরী)

কাযা নামাযসমুহে তরতীব ওয়াজিব হওয়ার বর্ণনা

মাসআলাঃ সাহেবে তরতীব অর্থাৎ যার জিম্মায় ছয় ওয়াক্ত থেকে কম কাযা রয়েছে, যদি কাযা নামাযের কথা স্মরণ থাকে এবং ওয়াক্তে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ওয়াক্তিয়া নামায পড়ে নেয়, তার ওয়াক্তিয়া নামায হবে না। না হওয়ার অর্থ হচ্ছে নামায মুলতুবি থাকবে। যদি ওয়াক্তিয়া পড়ে নিল এবং কাযাটা পড়লো না, তাহলে এটা সহ ছয় ওয়াক্ত হয়ে যাবে এবং ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর সব শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর যদি এর মাঝখানে কাযা পড়ে নেয়া হয়, তাহলে সব বাতিল হয়ে যাবে। পুনরায় সব নামায শুরু থেকে পড়তে হবে।

মাসআলাঃ বাদ পড়া নামায ও ওয়াক্তিয়া নামাযে তরতীব প্রয়োজন। যদি বাদ পড়া নামায ছয় ওয়াক্ত থেকে কম হয়, তাহলে প্রথমে কাযা নামায পড়ে নিবে। অতঃপর ওয়াক্তিয়া নামায পড়বে। যেমন আজকে কারো ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব কাযা হয়ে গেল, তাহলে সে ইশা নামায পড়তে পারে না, যতক্ষন তরতীব অনুসারে ওই চার ওয়াক্তের কাযা পড়ে না নেয়।

মাসআলাঃ যদি ওয়াক্তের মধ্যে এতটুকু সুযোগ না থাকে যে ওয়াক্তিয়া ও কাযাসমূহ পড়ে নেয়া যায়, তাহলে ওয়াক্তিয়া ও কাযা নামায সমুহের মধ্যে বাদ বাকীর বেলায় তরতীবের প্রয়োজন নেই। যেমন নামায ইশা ও বিতর উভয়ট কাযা হয়ে গেল এবং ফজরের ওয়াক্তে মাত্র পাঁচ রাকাত পড়ার সুযোগ আছে, তাহলে বিতরের কাযা পড়ে ফজর পড়ে নিবে আর যদি ছয় রাকাত পড়ার সুযোগ থাকে, তাহলে ইশার কাযা পড়ে ফজর পড়বে (শরহে বেকায়া)

মাসআলাঃ যার ছয় ওয়াক্ত কাযা হয়ে গেছে, তার জন্য তরতীব ফরয নয়। তখন সময়ের সুযোগ এবং কাযার কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ওয়াক্তিয়া নামায

পড়লে হয়ে যাবে। কাযা নামাযসমূহ যেটা ওর জিম্মায় রয়েছে, সব যদি এক সাথে কাযা হয়, যেমন এক নাগাড়ে ছয় ওয়াক্ত পড়েনি বা সব এ সঙ্গে হয়নি বরং ভিন্ন ভিন্ন সময় কাযা হয়েছে, যেমন ছয় দিন ফজর নামায পড়েনি এবং অবশিষ্ট নামাযসমূহ পড়তে থাকে, কিন্তু ওগুলো পড়ার সময় ফজরের কাযা সমূহের কথা ভুলে রইলো নামায হয়ে যাবে । (দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ যখন ছয় ওয়াক্ত কাযা হয়ে যায়, তখন তরতীব আর ফরয থাকে না। সেই কাযাসমূহ পুরাতন হোক বা কিছু পুরাতন, কিছু নতুন হোক। যেমন একমাস নামায পড়লো না, পুনরায় পড়তে শুরু করলো এবং এর মধ্যে পুনরায় এক ওয়াক্ত কাযা হয়ে গেল, তাহলে এর পরবর্তী নামায হয়ে যাবে। কারণ ওর জিম্মায় ছয় ওয়াক্ত থেকে অধিক নামায অনাদায়ী রয়েছে, যার জন্য তরতীব বজায় রইলো না। (রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ যখন ছয় ওয়াক্ত নামায কাযা হওয়ার কারণে তরতীব বাতিল হয়ে গেল, তাহলে এখন ওই কাযাসমূহ থেকে কিছু পড়ে নিলে, সাহেবে তবতীব হবে না, যতক্ষন ছয় ওয়াক্ত পড়ে না নিবে। সব কাযা পড়ে নিলে পুনরায় সাহেবে তরতীব হয়ে যাবে। (শরহে বেকায়া, আলমগীরী, দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ ছয় বা এর থেকে অধিক নামায কাযা হলে যেভাবে কাযা আদায়ের তরতীব বাতিল হয়ে যায়, সে রকম কাযা সমূহের মধ্যেও তরতীব বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ কাযাসমূহের মধ্যে কোন ধারাবাহিকতা থাকে না, আগে পরে পড়া যায়। যেমন কেউ এক মাস পর্যন্ত নামায পড়লো না। পরে সেই মাসের কাযা সমূহ যদি এভাবে পড়ে যে প্রথমে ত্রিশ ফজরের কাযা পড়লো, অতপর ত্রিশ যোহরের কাযা পড়লো। এভাবে আসর, মাগরিব ও ইশার কাযা পড়লো, তাহলে এভাবে পড়াটাও শুদ্ধ হবে। (আলমগীরী)

যার জিম্মায় কাযা নামায আছে, তা অনতিবিলম্বে আদায় করা ওয়াজিব।

তবে ছেলে মেয়ের হকসমুহ আদায় এবং নিজের প্রয়োজনীয় কাজের কারণে বিলম্ব করা যায়। সুতরাং কাজ কারবারও চালিয়ে যাবে এবং যে সময় ফুরসত পাওয়া যাবে,তখন কাযাও আদায় করতে থাকবে। এভাবে যেন সব আদায় হয়ে যায়। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ কাযা নামায নফলসমূহ থেকে গুরুত্বপূর্ণ। তাই নফল বাদ দিয়ে কাযা আদায় করা প্রয়াজন, যেন দায়মুক্ত হওয়া যায়। তবে তারাবীহ ও বার রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা যেন বাদ দেয়া না হয়।

মাসআলাঃ যার জিম্মায় অনেক বছরের নামায কাযা রয়েছে এবং এটা সঠিকভাবে জানা নেই কত দিন থেকে কোন কোন ওয়াক্ত কাযা হয়েছে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহলে সে এভাবে নিয়ত করে পড়বে, সর্ব প্রথম যে ফজরটা আমার কাযা হয়েছে, সেটা আদায় করছি বা সর্ব প্রথম যোহর বা আসর অর্থাৎ যেটা পড়বে, সেটার নিয়ত করবে। এভাবে সব নামাযের কাযা পড়ে নিবে। শেষ পর্যন্ত যেন এ ধারণাটা হয় যে সব আদায় হয়ে গেছে।

মাসআলাঃ মানুষ, পুরুষ হোক বা মহিলা, যখন বালেগ হয়, তখন থেকে ওর উপর নামায, রোযা ফরয হয়ে যায়। মহিলা কমপক্ষে নয় বছরের এবং বেশী হলে পনের বছরে বালেগ হয়ে যায়। আর পুরুষ কমপক্ষে বার বছর এবং বেশী হলে পনের বছরে বালেগ হয়ে যায়। পনের বছর বয়স্ক পুরুষ হোক বা মহিলা, শরীয়তে বালেগ হিসেবে গণ্য করা হয়, যদিওবা বালেগ হওয়ার লক্ষনসমূহ প্রকাশ না পায়।

মাসআলাঃ অশিক্ষিত গেঁয়ো বা মহিলা হওয়াটা কোন অজুহাত নয়। সবার জন্য শরীয়তের জরুরী বিষয়সমূহ শিখা ফরয। যদি স্বীয় ফরয ও ওয়াজিবসমূহ না জানে, তাহলে গুনাহগার হবে এবং শাস্তি ভোগ করবে।

নামাযের ফিদয়া

যে নামায কাযা রেখে মারা যায় এবং নামাযের ফিদয়া আদায় করার ওসীয়ত করে যায় এবং সম্পদও রেখে যায়, তাহলে তার পরিত্যক্ত এক তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে প্রত্যেক ফরয ও বিতরের বদলায় অর্ধ ছাআ (দুই কেজি, পঞ্চাশ গ্রাম) গম বা এক ছাআ যব ছদকা করবে। আর যদি সম্পদ রেখে না যায় কিন্তু ওয়ারিশ ফিদয়া দিতে চায়, তাহলে কিছু জিনিষ নিজের থেকে বা কর্জ নিয়ে মিসকীনকে ছদকা দিবে। মিসকিন সেটা গ্রহণ করে নিজের পক্ষ থেকে ওয়ারিশকে দান করবে। ওয়ারিশ গ্রহণ করে পুনরায় মিসকীনকে ছদকা করবে। এভাবে হাত বদল করতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত যেন সব ফিদয়া আদায় হয়ে যায়। যদি অপর্য্যাপ্ত সম্পদ রেখে যায়, তখনও এ রকম করবে। যদি মৃত্যুবরণকারী ফিদয়া দেয়ার ওসীয়ত করে না যায় এবং ওয়ারিশ নিজের পক্ষ থেকে করুণা হিসেবে ফিদয়া দিতে চায়, তাহলে দিতে পারবে।

মাসআলাঃ যার নামাযসমূহে ক্ষতিকর বা মকরূহ জাতীয় কিছু হয়ে থাকে এবং সে যদি সারা জীবনের নামায পুনরায় পড়তে চায়, তাহলে ভাল কথা। আর যদি কোন ক্ষতি না হয়, তাহলে না পড়া চাই এবং পড়লে ফজর ও আছরের পরে যেন না পড়ে।

সমস্ত রাকাত পরিপূর্ণভাবে পড়বে এবং বিতরে দুআ কুনুত পড়ে তৃতীয় রাকাতের পর বৈঠক করে এক রাকাত অতিরিক্ত পড়বে যেন চার রাকাত হয়ে যায়। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ অনেক লোক শবে কদরে ও রমযানের শেষ ভাগে যে নামায কাযায়ে উমরীব (জিন্দেগীর কাযা) নামে পড়ে থাকে এবং মনে করে থাকে যে সারা জিন্দেগীর কাযা সমূহের জন্য এটা যথেষ্ট, তা একেবারে ভুল ধারণা ও বাতুলতা মাত্র।

মুসাফিরের নামাযের বর্ণনা

শরীয়তের পরিভাষায় মুসাফির হচ্ছে, যে তিন দিনের পথ পর্যন্ত যাবার উদ্দেশ্যে নিজ এলাকা থেকে বের হয়।

মাসআলাঃ এখানে দিন বলতে বছরের সবচেয়ে ছোট দিনটাই বিবেচ্য এবং তিন দিনের পথ বলতে এটাই বুঝানো হয়নি যে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিরাম চলতে থাকা। বরং দিনের অধিকাংশকে বুঝানো হয়েছে। যেমন–সুবহে ছাদেক থেকে যাত্রা শুরু করে দ্বিপ্রহর অতিক্রম করা পর্যন্ত চলার পর যাত্রাবিরতি করলো। এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন যাত্রার পর যতটুকু পথ অতিক্রম করবে, সেটাকে সফরের দুরুত্ব ধরা হবে। দ্বিপ্রহর অতিক্রম হওয়া পর্যন্ত চলা বলতেও অবিরাম চলাকে বুঝানো হয়নি। বরং মাঝপথে যতটুকু আরাম করা চাই, ততটুকু আরামও করা যাবে আর চলন বলতে স্বাভাবিক চলনই বিবেচ্য, তত জোরেও নয়, আবার তত ধীর গতিতেও নয়। শুষ্ক অবস্থায় মানুষ ও উটের স্বাভাবিক চলনই ধর্তব্য। পাহাড়ী রাস্তার জন্য সেই হিসেবে হবে, যেটা এর জন্য সঙ্গত এবং সমুদ্রে ওই সময়কার নৌকার চলনকে ধরতে হবে, যখন বাতাস একেবারে রুদ্ধ হয়ে না থাকে এবং জোরেও প্রবহিত না হয়।

(দুর্রুল মুখতার, আলমগীরী)

মাসআলাঃ সফরের ক্ষেত্রে কোস (দুইমাইল পরিমাণ দুরুত্ব) বিবেচ্য নয়। কারণ কোস বড় ছোট হয়ে থাকে বরং তিন মনজিলই গ্রাহ্য। (এক দিনের পথকে এক মনজিল বলা হয়) শুষ্ক মৌসুমে মাইলের হিসেবে ৫৭ $\frac{৩}{৮}$ মাইলই হচ্ছে সফরের দুরুত্ব। (ফতওয়ায়ে রেযভীয়া ও বাহার)

মাসআলাঃ তিন দিনের পথকে যদি দ্রুতগামী বাহনের সাহায্যে দুদিন বা এর কম সময়ে অতিক্রম করা হয়, তাহলে মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি তিন দিনের কম পথকে অধিক দিনে অতিক্রম করে, তাহলে মুসাফির হবে না। (দুর্রুল মুখতার, আলমগীরী)

মাসআলাঃ শুষ্ক মৌসুমের পরিষ্কার রাস্তায় ৫৭ $\frac{১}{২}$ মাইল ট্রেন বা মোটর ইত্যাদি যোগে এক ঘন্টায় অতিক্রম করা যায়। তাই ট্রেন বা মোটর ইত্যাদির

pdf By Syed Mostafa Sakib

যোগে এক ঘন্টা সফরের পর শরয়ী মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে এবং কছর ও সফরের অন্যান্য আহ্কাম ওর উপর বর্তাবে।

মাসআলাঃ কেবল সফরের নিয়ত করলেই মুসাফির হবে না। বরং মুসাফির তখনই গণ্য হবে, যখন নিজ লোকালয়ের বাইরে চলে যাবে। অর্থাৎ শহর হলে শহরের বাইরে চলে যাওয়া এবং গ্রাম হলে গ্রামের বাইরে চলে যাওয়া। শহরবাসীদের জন্য এটাও প্রয়োজন যে, শহরের পাশে যে শহরতলী আছে, সেটাও অতিক্রম করতে হবে। (দুর্রুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ ষ্টেশন যদি লোকালয়ের বাইরে হয়ে থাকে এবং সফরের দূরত্ব পর্যন্ত যাবার উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে ষ্টেশনে পৌছলে মুসাফির বলে গণ্য হবে।

মাসআলাঃ সফরের জন্য এটাও প্রয়োজন যে, যেখান থেকে যাত্রা শুরু করে, সেখান থেকে তিন দিনের পথ পর্যন্ত যাবার যেন উদ্দেশ্য থাকে। যদি দু'দিনের পথ পর্যন্ত যাবার উদ্দেশ্যে বের হয় এবং ওখানে পৌছে অন্য জায়গা যাবার উদ্দেশ্য করে এবং সেটাও তিনদিনের কম পথ, তাহলে এ রকম অবস্থায় মুসাফির হবে না। এভাবে সারা দুনিয়া ঘুরে আসলেও মুসাফির হবে না, যদি এক জায়গা থেকে পূর্ণ তিন দিনের যাত্রার উদ্দেশ্য না থাকে। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ সফরের জন্য এটাও শর্ত যে, তিন দিন লাগাতার সফরের উদ্দেশ্যে হওয়া চাই। সুতরাং যদি এ রকম উদ্দেশ্য করে যে, দুদিনের পথ পৌছার পর কিছু কাজ করতে হবে। এরপর আর একদিনের পথ অতিক্রম করবো, তাহলে এটা তিন দিনের পথ লাগাতার অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে হলো না। তাই মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে না। (ফত্ওয়ায়ে রেযভীয়া ও বাহারে শরীয়ত)

মুসাফিরের হুকুমাদি

মুসাফিরের জন্য নামাযে কসর করা ওয়াজিব অর্থাৎ চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায দু'রাকাত পড়বে, ওর বেলায় দু'রাকাত পূর্ণ নামায হিসেবে গণ্য।

মাসআলাঃ মাগরিব ও ফজরে কসর নেই বরং পুরাই পড়তে হয়। যোহর, আসর ও ইশার ফরযে কসর করতে হয়।

মাসআলাঃ মুসাফির কছর না করলে গুনাহগার হবে।

মাসআলাঃ সুন্নাতসমূহের বেলায় কসর নেই বরং পুরাপুরিই পড়তে হবে। অবশ্য ভয়ের সময় ও সফরপথে সুন্নাত ত্যাগ করা যায়। এতে কোন গুনাহ হবে না। তবে কসর করা হবে না। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ মুসাফির যদি কসরের পরিবর্তে চার রাকাতই পড়লো, তাহলে

দু'রাকাতের পর বৈঠক করলে নামায হয়ে যাবে। অন্যথায় নামায বাতিল হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ মুসাফির ওই সময় পর্যন্ত মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে, যতক্ষণ নিজ এলাকায় পৌছে না যাবে বা কোন আবাদী এলাকায় পূর্ণ পনের দিন অবস্থানের নিয়ত না করবে। এটা ওই সময় যখন তিন দিনের পথ অতিক্রম করে থাকবে। যদি তিন মনযিল পৌছার আগে ফিরে আসার উদ্দেশ্য করে, তাহলে মুসাফির হলো না, যদিওবা জংগল হোক না কেন। (আলমগীরী, দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ অবস্থানের নিয়ত শুদ্ধ হওয়ার জন্য ছয়টি শর্ত রয়েছে অর্থাৎ এ ছয়টি শর্ত পাওয়া গেলে মুকীম হিসেবে গণ্য হবে, অন্যথায় হবে না। শর্তগুলো হচ্ছে (১) যাত্রাবিরতি করা, যদি চলমান অবস্থায় অবস্থানের নিয়ত করে, তাহলে মুকীম হবে না। (২) যে জায়গায় অবস্থান করবে সেটা অবস্থানের উপযোগী হওয়া চাই। জংগল, সমুদ্র বা অনাবাদী জায়গায় অবস্থানের নিয়ত করলে মুকীম হবে না। (৩) পনের দিন অবস্থানের নিয়ত করা। এর কম অবস্থানের নিয়ত করলে মুকীম হবে না। (৪) একই জায়গায় অবস্থানের নিয়ত করা। যদি দু জায়গা মিলে পনের দিন অবস্থানের নিয়ত করে। যেমন এক জায়গায় দশ দিন, অন্য জায়গায় পাঁচ দিন থাকার নিয়ত করে, তাহলে মুকীম হবে না। (৫) ওর উদ্দেশ্যটা শর্তহীন হওয়া চাই। (৬) ওর উদ্দেশ্য ওর অবস্থার বিপরীত না হওয়া চাই।

মাসআলাঃ মুসাফির চলমান অবস্থায় আছে, এখনও শহর বা গ্রামে পৌছে নি অবস্থানের নিয়ত করে নিল, তাহলে মুকীম হবে না। অবশ্য পৌছার পর নিয়ত করলে মুকীম হয়ে যাবে, যদিওবা তখনও বাড়ীর ঠিকানা ইত্যাদি তালাশরত থাকে। (আলমগীরী, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি কারো অধীনে, তার নিয়তের কোন মূল্য নেই বরং যার অধীনে তার নিয়তই গ্রহণযোগ্য। যেমন স্বামীর নিয়ত বিবেচ্য, স্ত্রীর নিয়ত বিবেচ্য নয়। অনুরূপ মুনিবের নিয়ত বিবেচ্য, গোলামের নিয়ত বিবেচ্য নয়। সৈন্য বাহিনীর অফিসারের নিয়ত বিবেচ্য, সৈনিকদের নিয়ত বিবেচ্য নয়। স্বামী অবস্থানের নিয়ত করলে, স্ত্রীও মুকীম হিসেবে গণ্য। আর যদি স্ত্রী অবস্থানের নিয়ত করে এবং স্বামী না করে, তাহলে স্ত্রী মুকীম হবে না। এ রকম অন্যান্য অধীনস্থদের বেলায় একই হুকুম প্রযোজ্য।

মাসআলাঃ মুকীম মুসাফিরের পিছনে ইক্তেদা করতে পারে এবং ইমামের সালাম ফিরানোর পর মুকীম স্বীয় অবশিষ্ট রাকাতদ্বয় পড়ে নিবে এবং সেই দু'রাকাতে কেরাত মোটেই পড়বে না, বরং ততক্ষন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

যতক্ষন সূরা ফাতিহা পড়তে সময় লাগে। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ যদি ইমাম মুসাফির হয়, তাহলে তাঁর উচিত যে নামায শুরু করার আগে যেন বলে দেয়, আমি মুসাফির এবং পরেও সালাম ফিরানোর সাথে সাথেই যেন বলে দেয়া হয়, 'আপনারা আপনাদের নামায পূর্ণ করুন, আমি মুসাফির।'

মাসআলাঃ মুসাফির যদি মুকীমের পিছনে ইক্তেদা করে, তাহলে মুসাফির মুক্তাদীর জন্য প্রথম বৈঠক ওয়াজিব হয়ে গেল, ফরয রইলো না। তাই ইমাম যদি প্রথম বৈঠক না করে, নামায ভঙ্গ হবে না। আর মুকীম যদি মুসাফিরের পিছনে ইক্তেদা করে, তাহলে মুকীম মুক্তাদীর জন্য প্রথম বৈঠক ফরয হয়ে গেল। (দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ মুসাফির যখন নিজ আসল জায়গায় ফিরে আসে, তখন সফর শেষ হয়ে যায়, যদিওবা অবস্থানের নিয়ত না করে থাকে।

মাসআলাঃ আসল জায়গা হচ্ছে ওটাই যেটা তার জন্মস্থান বা তার পরিবারের লোক ওখানে থাকে বা ওখানে বসবাস করছে এবং এটা ধারণা আছে যে, ওখান থেকে অন্যত্র যাবে না। অবস্থানের জায়গা হচ্ছে ওটা, যেখানে মুসাফির পনের দিন বা এর থেকে অধিক সময় অবস্থানের মনস্থ করে। (আলমগীরী ও বাহার)

মাসআলাঃ এক অবস্থানের জায়গা অন্য অবস্থানের জায়গাকে বাতিল করে দেয় অর্থাৎ এক জায়গায় পনের দিনের উদ্দেশ্যে অবস্থান করলো, এরপর অন্য জায়গায় আরও পনের দিনের উদ্দেশ্যে অবস্থান করলো, তাহলে প্রথম অবস্থানের জায়গাটা এখন আর অবস্থানের জায়গা হিসেবে গণ্য হবে না; এ দু জায়গার মাঝখানে সফরের দুরুত্ব থাকুক বা না থাকুক। (আলমগীরী, বাহার)

মাসআলাঃ যদি সাময়িক অবস্থানের জায়গা থেকে আসল জায়গায় পৌছে গেল বা সেই সাময়িক অবস্থানের জায়গা থেকে অন্যত্র চলে গেল, তাহলে এখন আর সেটা বাসস্থান রইলো না অর্থাৎ যদি ওই জায়গায় পুনরায় আসা হয় এবং পনের দিনের কম অবস্থান করার নিয়ত করা হয়, তাহলে মুসাফির হিসেবেই গণ্য হবে। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ মুসাফির কোন জায়গায় বিবাহ করলে মুকীম হয়ে যায়, যদিওবা পনের দিন অবস্থানের নিয়ত না করে আর যদি দুই শহরে তার দুই স্ত্রী বসবাস করে, তাহলে এ দু জায়গায় পৌছা মাত্র মুকীম হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ মহিলা বিবাহের পর তার শ্বশুরবাড়ী চলে গেল এবং সেখানে বসবাস করতে লাগলো, তাহলে ওর বাপের বাড়ী মুল বাসস্থান রইলো না। অর্থাৎ যদি শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ী তিন মনযিল হয়, তাহলে বাপের বাড়ী

আসলে এবং পনের দিনের কম সময় থাকার নিয়ত করলে কসর পড়বে। আর যদি বাপের বাড়ীর অবস্থানটা ত্যাগ না করে বরং সাময়িক ভাবে শ্বশুরালয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে পিত্রালয়ে আসার সাথে সাথে সফর শেষ হয়ে যাবে এবং নামায পুরা পড়বে। (বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ মহিলার মুহরেম ব্যতীত তিন দিনের বা এর অধিক পথ যাওয়া নাজায়েয বরং একদিনের পথ যাওয়াও ঠিক নয়। নাবালেগ শিশু বা অনুগত কারো সাথে সফর করা যায় না। বালেগ মুহরেম বা স্বামী সাথে হওয়া প্রয়োজন। (আলমগীরী ও বাহার) মুহরেম ভীষণ ফাসিক ও সীমাহীন অবাধ্য না হওয়া চাই। (বাহারে শরীয়ত)

বাহন সমূহের উপর নামায পড়ার বর্ণনা

মুসাফির হোক বা না হোক যখন কেউ বাহনের উপর আরোহন করে কোন জায়গায় যাত্রা করে, তাহলে শহরের সীমানা অতিক্রম করার পর বাহনের উপর বসে ইশারায় নফল নামায পড়তে পারে অর্থাৎ সিজদার জন্য রুকু থেকে একটু বেশী ঝুঁকবে। তবে জীনের উপর মাথা রাখবে না। কারণ, জীনের উপর সিজদা বা অন্য কিছু রেখে ওটার উপর সিজদা করা নাজায়েয। যে দিকে বাহন যাবে সেদিকে মুখ করে নামায পড়বে। অন্য দিকে মুখ করে নামায পড়া নাজায়েয। এমনকি তকবীর তাহরীমা বলার সময়ও কিবলার দিকে মুখ করার প্রয়োজন নেই। (দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ বহনকারী পশুর উপর নফল নামায পড়ার সময় যদি আমলে কলীল (যে কাজ করলেও নামাযরত মনে হয়) দ্বারা হাঁকা হয়, যেমন পায়ের দ্বারা আঘাত করা হলো বা হাতে চাবুক থাকলে ওটা দিয়ে ভয় দেখানো হলো, তাহলে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না। তবে যেন বিনা প্রয়োজনে করা না হয়। (রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ ফরয, ওয়াজিব, ফজরের সুন্নাত, ভাঙ্গার নামায, মানতের নামায, তিলাওয়াতে সিজদা, যেটার আয়াত নীচে থাকাকালীন সময়ে পড়া হয়েছিল এবং সেই নফল যেটা নীচে থাকাকালীন সময়ে শুরু করে ভেঙ্গে ফেলেছে, এ সব নামায বিনা কারণে বাহনের উপর পড়া না জায়েয। আর কারণ থাকাকালীনও এ সব আদায় হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, বাহনকে সম্ভব হলে কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়া। অন্যথায় যেভাবে সম্ভব সেভাবে আদায় করবে। যে সব কারণে উপরোক্ত নামায বাহনের উপর পড়া জায়েয, সেই কারণগুলো হচ্ছে (১) বৃষ্টিপাত হওয়া (২) এতটুক কাদা যে নেমে নামায পড়লে

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুখ ধ্বসে যাবে বা কাদায় ভরে যাবে অথবা যে কাপড় বিছানো হবে সেটা একেবারে কর্দমাক্ত হয়ে যাবে। এরকম অবস্থায় বাহন না থাকলে দাঁড়িয়ে ইশারায় পড়বে (৩) সহযাত্রীরা চলে যাওয়ার ভয় থাকলে (৪) বাহনের পশু যদি দুষ্ট প্রকৃতির হয়, অবতরণ করলে অন্য জনের সাহায্য প্রয়োজন হয়, কিন্তু সাহায্যকারী কেউ না থাকলে (৫) রোগ বৃদ্ধি পাবে (৬) জান (৭) মাল বা মহিলার বেইযযতের ভয় থাকলে। (দুরুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ চলন্ত ট্রেনেও ফরয, ওয়াজিব ও ফজরের সুন্নাত নাজায়েয। তাই ষ্টেশনে যখন ট্রেন থামে, তখন পড়ে নেয়া চাই। আর যদি মনে হয় যে ওয়াক্ত চলে যাবে, তাহলে যেভাবে সম্ভব হয় পড়ে নিবে। পরে যখন সুযোগ হবে দোহরায়ে নিবে। (বাহারে শরীয়ত)

বিঃদ্রঃ চলন্ত ট্রেনকে চলন্ত নৌকা ও স্টীমারের একই হুকুমভুক্ত মনে করাটা ভুল। কারণ নৌকা দাঁড়ালেও মাটির উপর দাড়ায় না; কিন্তু ট্রেনের বেলায় এ রকম নয়। তবে নৌকার উপর ওই সময় জায়েয, যখন মাঝ দরিয়ায় থাকে। কিন্তু যদি নদীর কিনারায় থাকে এবং কূলে আসা যায়, তাহলে ওটার উপর নাজায়েয।

মাসআলাঃ চলন্ত নৌকা বা জাহাজে বিনা কারণে বসে নামায পড়া ঠিক নয়, যদি কূলে উঠে নামায পড়ার সুযোগ থাকে।

মাসআলাঃ যদি নৌকার তলি মাটিতে লেগে যায়, তখন অবতরণের প্রয়োজন নেই, ওটার উপর পড়া যাবে।

মাসআলাঃ নৌকা কিনারায় নোঙর করা আছে এবং নামার সুযোগও আছে, তাহলে নেমে কূলে পড়বে। আর যদি নামতে না পারে, তাহলে নৌকায় দাঁড়িয়ে পড়বে।

মাসআলাঃ যদি নৌকা মাঝ দরিয়ায় নোঙর করা থাকে, তাহলে ওই অবস্থায় বসে নামায পড়তে পারবে, যদি বাতাসের জোরে নৌকা দুলতে থাকে এবং দাঁড়িয়ে পড়তে গেলে ঘুরে পড়ে যাবার ভয় থাকে। আর যদি বাতাসের দ্বারা নৌকা বেশী নড়াচড়া না করে, তাহলে বসে পড়া যাবে না।

মাসআলাঃ নৌকায় নামায পড়ার সময় কিবলামুখী হওয়া জরুরী এবং নৌকা যখন ঘুরে যাবে, তখন নামাযীও ঘুরে যাবে, যেন কিবলার দিকে মুখ থাকে। যদি খুব জোরে এদিক সেদিক চক্রর দিতে থাকে, যার ফলে কিবলার দিকে মুখ করতে অক্ষম, তাহলে সেই সময় নামায পড়াটা স্থগিত রাখবে। তবে ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যেতে দেখলে পড়ে নিবে। (গুণীয়া, দুরুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

জুমার বর্ণনা

জুমা ফরযে আইন। এর ফরযটা যোহর থেকে অধিক জোরালো। এর অস্বীকারকারী কাফির (দুরুল মুখতার ও অন্যান্য কিতাব)

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যে, যে পরস্পর তিন জুমা বাদ দেয়, সে যেন ইসলামকে পিঠের পিছনে ফেলে দিল, সে মুনাফিক, সে আল্লাহ থেকে সম্পর্কচ্যুত (ইবনে খুযাইমা, হাব্বান, রযীন, ইমাম শাফেয়ী)

মাসআলাঃ জুমার নামায পড়ার জন্য ছয়টি শর্ত রয়েছে। যদি এর কোন একটি শর্ত পাওয়া না যায়, তাহলে জুমা হবে না। শর্তগুলো হচ্ছে (১) শহর বা শহরতলী (২) বাদশাহ (৩) যোহরের ওয়াক্ত (৪) খুতবা (৫) জমাত (৬) সকলের জন্য অনুমতি।

প্রথম শর্ত শহর বা শহরতলীর বর্ণনা

শহর বলতে ওই জায়গাকে বুঝানো হয়, যেখানে বিভিন্ন অলিগলি ও বাজার থাকে এবং সেটা জিলা বা মহকুমা সদর হয়ে থাকে, যার সাথে অনেক গ্রাম সংযুক্ত থাকে এবং সেখানে এমন কোন শাসক থাকে, যে স্বীয় ক্ষমতাবলে জালিমের বিচার করতে পারে। অর্থাৎ ইনসাফ করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখে, যদিওবা যথাযথ ইনছাফ না করে থাকে। শহরতলী বলতে ওই জায়গাকে বুঝানো হয়, যেটা শহরের সংলগ্ন থাকে এবং শহরের বিভিন্ন স্বার্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন কবরস্থান, ঘোড়দৌড় মাঠ, সেনানিবাস, কোর্ট কাছারী, ষ্টেশন। এ সব শহরের বাইরে হলেও শহরতলী হিসেবে গণ্য হয় এবং সেখানে জুমা জায়েয। সুতরাং জুমা শহর ও শহরতলীতে জায়েয এবং গ্রামে না জায়েয।

(গুনীয়া, বাহারে শরীয়ত)

বিঃদ্রঃ (শহর থেকে বিচ্ছিন্ন জায়গাকে শরীয়তের পরিভাষায় গ্রাম বলা হয়।)

মাসআলাঃ শহরের জন্য শাসক থাকাটা আবশ্যক। পরিদর্শক হিসেবে কোন জায়গায় গেলে সেটা শহর বলে গণ্য হবে না এবং সেখানে জুমার নামাযও কায়েম করা যাবে না (দুরুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ গ্রামের থেকে শহরে আসলো এবং জুমার দিন শহরে থাকার নিয়ত করলো, তাহলে ওর জন্য জুমা ফরয।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ শহরের কয়েক জায়গায় জুমা হতে পারে, শহর ছোট হোক বা বড় হোক। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে অনেক জায়গায় জুমা কায়েম করা অনুচিত। কারণ, জুমা ইসলামের নিদর্শন সমূহের অন্যতম এবং জমাতসমূহের সমষ্টি । আর একসাথে অনেক মসজিদে জুমার নামায হওয়ার দ্বারা ইসলামের সেই শান শওকত বজায় থাকে না, যেটা বড় জমায়েতে পরিলক্ষিত হয়। অধিকন্তু কেবল খরচ কমানোর জন্য একাধিক জায়গায় জুমার নামায পড়া জায়েয রাখা হয়েছে। তাই অনর্থক জমাতের সৌন্দর্য্য বিনষ্ট করা এবং পাড়ায় পাড়ায় জুমা কায়েম করা অনুচিত।

আর একটি খুব জরুরী বিষয়, যেটার প্রতি লোকদের মোটেই মনোযোগ নেই, সেটা হচ্ছে জুমাকে অন্যান্য নামাযের মত মনে করা এবং যার ইচ্ছে নতুন জায়গায় জুমার ব্যবস্থা করলো এবং যে ইচ্ছে করলো, সে নামায পড়ায়ে দিল, এটা না জায়েয। কারণ জুমার ব্যবস্থা করা ইসলামী শাসক বা এর প্রতিনিধির কাজ আর যেখানে ইসলামী শাসক না থাকে, সেখানে যিনি সবচে বড় আলিম, ফকীহ, সুন্নী ও সঠিক আকিদায় বিশ্বাসী, তিনি শরীয়তের আহকাম জারী করার ব্যাপারে ইসলামী শাসকের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচ্য হবেন। তাই তিনিই জুমা কায়েম করবেন। তাঁর অনুমতি ব্যতীত জুমা হতে পারে না। আর যদি এ রকম আলেম না থাকে, তাহলে সাধারণ লোকেরা যাকে ইমাম বানাবে, সেই জুমা কায়েম করবে। কিন্তু আলেম বর্তমান থাকতে, সাধারণ লোকেরা অন্য কাউকে ইমাম বানাতে পারে না। এ রকমও হয় না যে কয়েকজন মিলে কাউকে ইমাম করে নিল। এ রকম জুমার কোন প্রমাণ নেই। (বাহারে শরীয়ত)

দ্বিতীয় শর্ত বাদশাহের বর্ণনা

বাদশাহ বলতে ইসলামী শাসক বা এর সহকারীকে বুঝানো হয়েছে, যাকে শাসক জুমা কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছে। শাসক ন্যায় বিচারক হোক বা জালিম হোক, জুমা কায়েম করার অধিকার রাখে। অনুরূপ যদি জোর করে শাসক হয়ে যায় অর্থাৎ শরীয়ত মতে ওর রাজত্বের অধিকার না থাকে, যেমন কোরাইশী না হলে বা অন্য কোন শর্ত পাওয়া না গেলেও জুমা কায়েম করতে পারে। (দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

তৃতীয় শর্ত ওয়াক্তের বর্ণনা

যোহরের সময়টাই জুমার ওয়াক্ত অর্থাৎ যোহরের যে ওয়াক্ত নির্ধারিত এর মধ্যে জুমা হওয়া চাই। যদি জুমার নামাযে এমনকি তাশাহুদ পড়ার পর আসরের ওয়াক্ত হয়ে যায়, তাহলে জুমা বাতিল হয়ে গেল। যোহরের কাযা আদায় করবে।

(প্রায় কিতাবসমূহে বর্ণিত)

চতুর্থ শর্ত খুতবার বর্ণনা

জুমার খুতবার জন্য শর্ত হচ্ছে (১) ওয়াক্তের মধ্যে এবং (২) নামাযের আগে হওয়া এবং (৩) এ রকম সমাবেশের সামনে হওয়া, যা জুমার জন্য জরুরী। অর্থাৎ খতীব ব্যতীত কমপক্ষে তিন জন পুরুষ হতে হবে আর (৪) এতটুকু আওয়াজ হওয়া যে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকলে আশে পাশের লোক যেন শুনতে পায়। অতএব যদি সূর্য ঝুঁকে পড়ার আগে খুতবা পড়ে নেয় বা নামাযের পরে খুতবা পড়ে বা মহিলা ও শিশুদের সামনে খুতবা পড়ে, তাহলে এ সব অবস্থায় জুমা হবে না।

মাসআলাঃ খুতবার ও নামাযের মধ্যে যদি অধিক বিলম্ব হয়ে যায়, তাহলে সেই খুতবা যথার্থ নয়। (দুর্রুল মুখতার, বাহার)

মাসআলাঃ খুতবা হচ্ছে আল্লাহর জিকিরের নাম। তাই যদি কেবল একবার আলহামদুলিল্লাহ বা সুবহানাল্লাহ বা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বললো, তাহলে ফরয আদায় হয়ে গেল। কিন্তু খোতবা এ রকম সংক্ষিপ্ত করা মকরূহ। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ দু'খুতবা পড়া সুন্নাত, তবে দীর্ঘ না হওয়া চাই। যদি উভয়টা মিলে তওয়ালে মুফাচ্ছিল (অতিরিক্ত লম্বা) থেকে বেড়ে যায়, তাহলে মকরূহ, বিশেষ করে শীতকালে। (গুনীয়া দুর্রুল, মুখতার, বাহার)

মাসআলাঃ খুতবার মধ্যে এ বিষয়গুলো সুন্নাত–খতীব পাক হওয়া, দাঁড়ানো, খোতবার আগে খতীবের বসা, খতীর মিম্বরের উপর হওয়া, শ্রোতাদের দিকে মুখ করা, কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে রাখা, উপস্থিত সকলে ইমামের দিকে মনোনিবেশ করা, খোতবার আগে নিম্নস্বরে আয়ুজুবিল্লাহ পড়া, এতটুকু আওয়াজ করে খোতবা পড়া যেন লোকেরা শুনতে পায়, আলহামদু বলে শুরু করা, আল্লাহ তাআলা ওয়াজ্জাল্লার ছনা করা, আল্লাহ তাআলার একত্ব এবং রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) এর রেসালতের সাক্ষ্য দেয়া, হুযুরের প্রতি দরূদ প্রেরণ করা, কমপক্ষে একটি আয়াত তেলাওয়াত করা; প্রথম খোতবায় ওয়াজ নছীহত করা, দ্বিতীয় খোতবায় ছনা, হামদ, শাহাদত ও দরূদের পুনরাবৃত্তি করা, অন্যান্য মুসলমানদের জন্য দুআ করা, উভয় খোতবা হালকা করা, উভয় খোতবার মাঝখানে তিন আয়াত পাঠ পরিমাণ সময় বসা। মুস্তাহাব হচ্ছে–দ্বিতীয় খোতবায় প্রথম খোতবায় তুলনায় আওয়াজ ছোট হওয়া বরং খোলাফায়ে রাশেদীন ও বিশিষ্ট ছাহাবা হযরত হামযা ও আব্বাস (রাদি আল্লাহু তাআলা আনহুম) এর আলোচনা করা। দ্বিতীয় খোতবা

pdf By Syed Mostafa Sakib

এভাবে শুরু করা উত্তমঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِى اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآاِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

মুছাল্লি যদি ইমামের সামনে থাকে, তাহলে ইমামের দিকে মুখ করবে আর যদি ডান পাশে বা বাম পাশে থাকে, তাহলে ইমামের দিকে ফিরে বসবে। ইমামের কাছে হওয়া আফজল। তবে ইমামের কাছে হওয়ার জন্য লোকদেরকে ডিঙায়ে আসা জায়েয নয়। অবশ্য ইমাম যদি এখনও খুতবা দিতে যায়নি এবং সামনে জায়গা খালি আছে, তাহলে আগে যাওয়া যায়। খুতবা শরু হওয়ার পর যদি মসজিদে আসে, তাহলে যেন এক কিনারে বসে যায়। খুতবা শুনার সময় দু'জানু হয়ে বসবে, যেমন নামাযে বসা হয়। **(আলমগীরী, দুর্রুল মুখতার,** গুণীয়া, বাহার ও অন্যান্য কিতাব)।

মাসআলাঃ খুতবার মধ্যে ইসলামী শাসকের এ রকম প্রশংসা করা, যা তাঁর মধ্যে নেই, সেটা হারাম। যেমন مالك رقاب الامم (সমস্ত মানুষের মুনিব) এটা নিছক মিথ্যা ও হারাম। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ খুতবায় আয়াত না পড়া, বা দু'খোতবার মাঝখানে না বসা অথবা খোতবা পড়ার সময় কথা বলা মকরূহ। অবশ্য খতীব যদি নেক কাজের হুকুম দেন এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করেন, তাহলে কোন দোষ নেই। (আলমগীরী, বাহার)

মাসআলাঃ আরবী ভিন্ন অন্য ভাষায় খোতবা পড়া বা আরবীর সাথে অন্য ভাষা মিশ্রিত করা সুন্নাতে মুতওয়াতিবের খেলাপ। অনুরূপ খোতবায় শের পড়াও অনুচিত যদিওবা আরবীতে হয়ে থাকে। অবশ্য নছীহত বিষয়ক দু এক পংক্তি মাঝে মধ্যে পড়লে কোন ক্ষতি নেই (বাহারে শরীয়ত)

পঞ্চম শর্ত জামাতের বর্ণনা

জামাতে ইমাম ব্যতীত কমপক্ষে তিন ব্যক্তি হওয়া চায়। অন্যথায় জুমা হবে না। (হেদায়া, শরহে বেকায়া, আলমগীরী কাযী খান)

মাসআলাঃ যদি তিন জন গোলাম বা মুসাফির বা রোগী বা বোবা অথবা অশিক্ষিত মুক্তাদী হয়ে থাকে, তাহলে জুমা হয়ে যাবে। আর যদি কেবল মহিলা বা শিশু হয়ে থাকে, তাহলে হবে না। (আলমগীরী, রর্দুল মুহতার)

ষষ্ঠ শর্ত সকলের জন্য অনুমতি

এর ভাবার্থ হচ্ছে মসজিদের দরজা সকলের জন্য খোলা রাখা যেন যে মুসলমানের ইচ্ছে আসতে পারে, কোন বাধা–বিঘ্ন যেন না থাকে। জামে মসজিদে লোক সমবেত হওয়ার পর দরজা বন্ধ করে জুমার নামায পড়া হলে, জুমা আদায় হবে না (আলমগীরী)

মাসআলাঃ মহিলাদেরকে যদি জামে মসজিদে যাবার থেকে বাধা দান করা হয়, তাহলে সাধারণ অনুমতির বিপরীত হবে না। কারণ ওদের আগমনে ফিৎনার ভয় রয়েছে। (রর্দুল মুহতার)

জুমা ওয়াজিব হবার জন্য এগারটি শর্ত রয়েছে। যদি এর মধ্যে একটিও পাওয়া না যায়, তাহলে ফরয হবে না। এরপরও পড়লে হয়ে যাবে। বরং পুরুষ, বিবেকবান ও বালেগের জন্য জুমা পড়াটা আফজল আর মহিলার জন্য যোহর হচ্ছে আফজল।

প্রথম শর্তঃ শহরে মুকীম হওয়া।

দ্বিতীয় শর্তঃ সুস্থতা অর্থাৎ রোগীর উপর জুমা ফরয নয়। রোগী বলতে ওই ধরণের রোগীকে বুঝায় যে জুমা মসজিদ পর্যন্ত যেতে পারে না, বা গেলে রোগ বৃদ্ধি পাবে অথবা দেরীতে আরোগ্য লাভ করবে (গুনীয়া), থুর থুরে বৃদ্ধদের বেলায় রোগীর হুকুম প্রযোজ্য। (কাজী খান, রর্দুল মুহতার, ফতৃহুল কদীর)

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি রোগীর সেবা শুশ্রুষায় নিয়োজিত এবং সে জানে যে জুমা পড়তে গেলে রোগীর অসুবিধা হবে এবং তার দেখা শুনা করার মত কেউ থাকবে না, তাহলে সেই সেবা শুশ্রুষা কারীর উপর জুমা ফরয নয়।

তৃতীয় শর্তঃ আযাদ হওয়া। গোলামের উপর জুমা ফরয নয়। ওর মুনিব জুমা থেকে বারণ করতে পারে। (আলমগীরী, কাযী খান)

মাসআলাঃ কর্মচারী ও শ্রমিকদেরকে জুমা থেকে বাদ দেয়া যাবে না। অবশ্য জামে মসজিদ দুরে হলে মালিকের যা ক্ষতি হয়, সেটা বেতন থেকে কেটে রাখতে পারবে এবং কর্মচারীরা এর দাবী করতে পারবে না। (আলমগীরী)

চতুর্থ শর্তঃ পুরুষ হওয়া। মহিলার উপর জুমা ফরয নয়।

পঞ্চম শর্তঃ বালেগ হওয়া।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ষষ্ঠ শর্তঃ বিবেকবান হওয়া।

উপরোক্ত শর্ত দুটি শুধু জুমার জন্য নির্দিষ্ট নয় বরং প্রত্যেক ইবাদত ওয়াজিব হওয়ার জন্য বিবেকবান ও বালেগ হওয়া শর্ত।

সপ্তম শর্তঃ চক্ষু বিশিষ্ট হওয়া। কারণ অন্ধের উপর জুমা ফরয নয়। তবে ওই অন্ধের উপর জুমা ফরয, যে শহরের সমস্ত অলিগলিতে স্বাভাবিকভাবে ঘুরে বেড়ায়, জিজ্ঞাসা ও সাহায্য ছাড়া যে মসজিদে যেতে ইচ্ছে, সেখানে ঠিকমত পৌঁছে যায়। (দুর্রুল মুখতার, বাহার)

অষ্টম শর্তঃ চলা ফেরার উপর সামর্থবান হওয়া, অর্থাৎ পঙ্গু ব্যক্তির উপর জুমা ফরয নয়। তবে যে মসজিদ পর্যন্ত যেতে পারে, তার উপর জুমা ফরয।

(দুর্রুল মুখতার, বাহার)

নবম শর্তঃ বন্দী অবস্থায় না হওয়া। কারণ বন্দীর উপর জুমা ফরয নয়। কিন্তু যদি কোন কর্জের কারণে বন্দী করা হয় আর কর্জ আদায় করার মত সামর্থ রাখে, তাহলে তার উপর জুমা ফরয।

দশম শর্তঃ ভয় না থাকা। যদি শাসক, চোর–ডাকাত ও অন্য কোন জালিমের ভয় থাকে বা গরীব কর্জ গ্রহিতার বন্দী হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে, তাহলে তার উপর জুমা ফরয নয়। (দুর্রুল মুখতার)

একাদশ শর্তঃ ঝড়–তুফান, বন্যা, হিম প্রবাহ ইত্যাদি না হওয়া। অর্থাৎ এগুলো যদি এত জোরালো হয় যে যার ফলে ক্ষতির ভয় থাকে, তাহলে জুমা ফরয নয়।

মাসআলাঃ জুমার ইমামতি ওই ধরণের প্রত্যেক ব্যক্তি করতে পারে, যিনি অন্যান্য নামাযসমূহের ইমাম হওয়ার যোগ্যতা রাখে, যদিওবা তার উপর জুমা ফরয নয়। যেমন রোগী, মুসাফির, গোলাম (দুর্রুল মুখতার, হেদায়া কাযী খান)

অর্থাৎ ইসলামী শাসক বা ওর সহকারী অথবা যাকে সে অনুমতি দিয়েছে, অসুস্থ বা মুসাফির হলেও জুমার নামায পড়াতে পারে। বা তাঁরা তিনজন কোন রোগী বা মুসাফির বা গোলাম অথবা ইমামতের উপযুক্ত অন্য কাউকে অনুমতি দিয়ে থাকলে বা প্রয়োজনবোধে সাধারণ লোকেরা এমন কাউকে ইমাম নির্ধারিত করলো, যিনি ইমামতি করতে পারে, তাহলে সে পড়াতে পারে, যদিওবা রোগী, মুসাফির বা গোলাম হয়ে থাকে। অবশ্য যার ইচ্ছে সে জুমার নামায পড়ালে জুমা আদায় হবে না।

মাসআলাঃ যার উপর জুমা ফরয, তার জন্য শহরে জুমার নামায হয়ে যাবার আগে যোহর নামায পড়া মকরূহে তাহরীমী।

মাসআলাঃ রোগী বা মুসাফির বা বন্দী অথবা অন্য কেউ যার উপর জুমা ফরয নয়, তাদের বেলায়ও জুমার দিন শহরে জামাত সহকারে যোহর পড়া মকরূহে তাহরীমী, জুমার নামায হয়ে যাবার আগে জামাত পড়ুক বা পরে। অনুরূপ যারা জুমার নামায পায়নি, তাঁরাও বিনা আযান ও ইকামত একলা একলা যোহর নামায পড়বে। তাদের জন্যও জামাত নিষেধ। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ ওলামায়ে কিরাম ফরমান, যে সব মসজিদে জুমার নামায হয় না, সেসব মসজিদ জুমার দিন যোহরের সময় যেন বন্ধ করে রাখা হয।

(দুর্রুল মুখতার, বাহার)

মাসআলাঃ গ্রামে জুমার দিনও যেন যোহরের নামায আযান, ইকামত ও জামাত সহকারে পড়ে। (আলমগীরী, বাহার)

মাসআলাঃ জুমার নামাযের জন্য আগে যাওয়া, মিসওয়াক করা, ভাল ও সাদা কাপড় পড়া, তৈল ও সুগন্ধি লাগানো এবং প্রথম কাতারে বসা মুস্তাহাব এবং গোসল সুন্নাত। (আলমগীরী, গুনীয়া)

খুতবার আরও কিছু মাসায়েল

ইমাম যখন খোতবার জন্য দাঁড়ায়, সেই সময় থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত নামায, জিকির আজকার, এবং সব রকমের কথাবার্তা নিষেধ। অবশ্য সাহেবে তবতীব স্বীয় কাযা নামায পড়ে নিতে পারবে। আর যে ব্যক্তি সুন্নাত বা নফল নামাযে রত থাকে, তাড়াতাড়ি যেন শেষ করে। (দুর্রুল মুখতার, বাহার)

মাসআলাঃ যে সব বিষয় নামাযে হারাম, যেমন পানাহার, সালাম–কালাম ইত্যাদি, সে সব খোতবার সময়ও হারাম। এমনকি সৎকাজের নির্দেশ দেয়াও। অবশ্য খতীব সৎকাজের নির্দেশ দিতে পারেন।

যখন খোতবা পড়া হয়, তখন সমবেত সকলের জন্য শুনা ও নিশ্চুপ থাকা ফরয। যে সব লোক ইমাম থেকে দূরত্বে বসে এবং খুতবার আওয়াজ তাদের কান পর্যন্ত পৌঁছে না, তাদের বেলায়ও নিশ্চুপ থাকা ওয়াজিব। কাউকে মন্দ কথা বলতে দেখলে, হাত বা মাথার ইশারায় নিষেধ করতে পারে, কিন্তু মুখে বলা নাজায়েয। (দুর্রুল মুখতার, বাহার)

মাসআলাঃ খোতবা শুনার সময় দেখলো যে অন্ধ কূপে পড়ে যাচ্ছে বা কাউকে বিচ্ছু ইত্যাদি কামড় দিচ্ছে, তখন মুখ দিয়ে বলতে পারে। যদি ইশারা বা ধাক্কা দিয়ে বলা যায়, তখন মুখে বলার অনুমতি নেই।

(দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার ও বাহার)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ খতীব মুসলমানদের জন্য দুআ করার সময় শ্রোতাদের হাত উঠানো ও আমীন বলা নিষেধ। যদি এ রকম করে, তাহলে গুনাহগার হবে। খুতবায় দরূদ শরীফ পড়ার সময় খতীবের ডানে বামে মুখ করা বিদআত।

(রদ্দুল মুহতার, বাহার)

মাসআলাঃ খতীব যখন খোতবায় হুযুর (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) এর নাম মুবারক উচ্চারণ করে, তখন শ্রোতাগণ যেন মনে মনে দরূদ শরীফ পড়ে। ওই সময় মুখে পড়ার অনুমতি নেই। অনুরূপ সাহাবায়ে কিরামের নাম উল্লেখ করলে, মুখে 'রাদি আল্লাহু তাআলা আনহুম' বলার অনুমতি নেই। (দুর্রুল মুখতার, অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ প্রথম আযান হওয়ার পর পরই তাড়াহুড়া করা ওয়াজিব এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি, যেগুলো তাড়াহুড়ার প্রতিবন্ধক,বর্জন করা ওয়াজিব। এমন কি রাস্তা দিয়ে যাবার সময় বেচাকেনা করলে, সেটাও নাজায়েয আর মসজিদে বেচাকেনাতো মারাত্মক গুনাহ। খাবার গ্রহণ করার সময় জুমার আযানের আওয়াজ কানে আসলো, তখন যদি এ রকম ভয় হয় যে খাবার খেতে থাকলে জুমা চলে যাবে, তখন খানা বাদ দেবে এবং জুমায় চলে যাবে। জুমার জন্য যেন ধীরস্থির ও গাম্ভীর্য সহকারে গমন করে। (আলমগীরী, দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ জুমার খুতবা ছাড়া অন্যান্য খোতবা শুনাও ওয়াজিব। যেমন দুই ঈদ, বিবাহ ইত্যাদির খুতবা (দুর্রুল মুখতার, বাহার)

মাসআলাঃ খতীব যখন মিম্বরে বসে, তখন খতীবের সামনে দ্বিতীযবার আযান দেয়া হয়। সামনে বলতে মসজিদের ভিতর মিম্বরের কাছে নয়। কারণ মসজিদের অভ্যন্তরে আযান দেয়াকে ফকীহগণ মকরুহ বলেন।

(খালাছা, আলমগীরী ও কাযী খান)

মাসআলাঃ দ্বিতীয় আযানও যেন উচ্চস্বরে দেয়া হয়। কারণ এটার দ্বারাও ঘোষণা উদ্দেশ্য এবং যে প্রথম আযান শুনেনি, সে দ্বিতীয় আযান শুনে যেন উপস্থিত হয়। (বাহারে রায়েক ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ খোতবা শেষ হবার সাথে সাথে যেন ইকামত বলা হয়। খোতবা ও ইকামতের মাঝখানে দুনিয়াবী কথা বলা মকরুহ। (দুর্রুল মুখতার, বাহার)

মাসআলাঃ যিনি খোতবা পড়বেন, তিনিই নামায পড়াবেন। অন্য কেউ যেন না পড়ায়। আর অন্য জনে পড়ালেও হয়ে যাবে, যদি সে অনুমতি প্রাপ্ত হয়।

মাসআলাঃ জুমার নামাযের জন্য উত্তম হচ্ছে প্রথম রাকাতে সূরা জুমা এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা মুনাফেকুন বা প্রথম রাকাতে سَبِّحِ اسْمَ এবং দ্বিতীয় রাকাতে هَلْ أَتٰكَ পড়া। তবে সব সময় যেন এসব সূরা পড়া না হয়। মাঝে মধ্যে যেন অন্যান্য সূরা সমূহও পড়া হয়।

মাসআলাঃ জুমার দিন যদি সফরে বের হতে হয় এবং দ্বিপ্রহরের আগে যদি শহরের লোকালয়ের বাহিরে চলে যাওয়া যায়; তাহলে কোন দোষ নেই, অন্যথায় নিষেধ। (দুর্রুল মুখতার, বাহার)

ফায়দাঃ জুমার দিন রূহসমূহ সমবেত হয়। তাই কবর যিয়ারত করা উচিৎ।

(দুর্রুল মুখতার, বাহার)

দুই ঈদের বর্ণনা

দুই ঈদের নামায ওয়াজিব। তবে সবার উপর নয় বরং তাদের উপর ওয়াজিব যাদের উপর জুমা ওয়াজিব, এটা আদায়ের জন্যও সে শর্তসমূহ অপরিহার্য, যা জুমার জন্য বর্ণিত আছে। কেবল এতটুকু পার্থক্য রয়েছে যে জুমায় খোতবা শর্ত, কিন্তু ঈদদ্বয়ে সুন্নাত। যদি জুমায় খোতবা পড়া না হয়, তাহলে জুমা হলো না, আর ঈদদ্বয়ে না পড়লে নামায হয়ে যাবে। তবে কাজটা মন্দ বলে গণ্য হবে। দ্বিতীয় পার্থক্য হচ্ছে জুমার খোতবা নামাযের আগে আর ঈদের খোতবা নামাযের পরে পড়া হয়। যদি ঈদের খুতরা নামাযের আগে পড়া হয়, তাহলে মন্দ হলো, কিন্তু নামায হয়ে যাবে, পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই। খোতবাও পুনরায় পড়তে হবে না। ঈদদ্বয়ে আযান ইকামত কোনটা নেই। কেবল দু'বার اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ বলার অনুমতি রয়েছে।

(কাযী খান, আলমগীরী, দুর্রুল মুখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ বিনা কারণে ঈদের নামায বাদ দেয়া গোমরাহী ও বিদআত। (জাওহেরা, নায়্যারা, বাহার)

মাসআলাঃ মফস্বলে ঈদের নামায মকরূহ তাহরীমী (দুর্রুল মুখতার, বাহার)

মাসআলাঃ ঈদের দিন নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ মুস্তাহাবঃ চুল, দাড়ি-গোঁফ ঠিক করা, নখ কাটা, গোসল করা, মিসওয়াক করা, ভাল কাপড় অর্থাৎ নতুন কাপড় অথবা ধোলাই করা কাপড় পড়া। আংটি (১) পরিধান করা, সুগন্ধি লাগানো, ফজরের নামায মহল্লার মসজিদে পড়া, ঈদগাহে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া, নামাযের আগে ছদকায়ে ফিতর আদায় করা, ঈদগাহে হেঁটে যাওয়া, ভিন্ন রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা, নামাযে যাবার আগে তিন, পাঁচ, সাত এভাবে বেজোড় খেজুর খাওয়া, খেজুর না থাকলে মিষ্টি জাতীয় কোন কিছু খাওয়া।

(১) টীকাঃ পুরুষের জন্য সাড়ে চার মাশা অর্থাৎ প্রায় পঁয়ত্রিশ রত্তি ওজনের চান্দির আংটি পরা জায়েয। এটা ছাড়া অন্য কোন আংটি জায়েয নেই। লোহা, পিতল ও অন্যান্য ধাতবের তৈরী আংটি নারী পুরুষ সকলের জন্য নাজায়েয। বরং মহিলাদের জন্য সোনা-চান্দি ব্যতীত লোহা পিতল ইত্যাদির অলংকার পরাওনাজায়েয।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অবশ্য নামাযের আগে কিছু না খেলে গুনাহগার হবে না। তবে ঈশা পর্যন্ত কিছু না খেয়ে থাকা দোষনীয়। (দুর্রুল মুহতার) আনন্দ প্রকাশ করা, বেশী করে দান–ছদকা করা, ঈদগাহে ধীরস্থির ও গাম্ভীর্য সহকারে নীচের দিকে দৃষ্টি রেখে গমন করা। পরস্পর ঈদ মুবারক জ্ঞাপন করা।

মাসআলাঃ রাস্তায় যেন উচ্চস্বরে তকবীর বলা না হয়। (দুর্রুল মুখতার, বাহার)

মাসআলাঃ বাহনযোগে ঈদ গাহে গেলেও কোন দোষ নেই। কিন্তু হেঁটে যাবার শক্তি থাকলে হেঁটে যাওয়াটাই আফজল। ফিরে আসার সময় বাহন যোগে আসলে কোন ক্ষতি নেই। (জাওহের, আলমগীরী, বাহার)

মাসআলাঃ দুই ঈদের নামাযের ওয়াক্ত ওই সময় থেকে শুরু হয় যখন সূর্য তীর বরাবর উপরে উঠে এবং শরয়ী অর্ধ দিবস পর্যন্ত ওয়াক্ত বাকী থাকে। কিন্তু ঈদুল ফিতরে দেরী করা এবং কোরবানী ঈদে তাড়াতাড়ি পড়ে নেয়া মুস্তাহাব। যদি সালাম ফিরানোর আগে দ্বিপ্রহর হয়ে যায়, তাহলে নামায হবে না। (হেদায়া কাযী খাঁ, দুর্রুল মুখতার)। দ্বিপ্রহর বলতে এখানে শরয়ী অর্ধদিবসকে বুঝানো হয়েছে, যার বিবরণ আগে দেয়া হয়েছে।) (বাহার)

ঈদগাহে নামাযের নিয়ম

ঈদের নামায পড়ার নিয়ম হচ্ছে দু'রাকাত ওয়াজিব ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার নিয়ত করে কান পর্যন্ত হাত উঠাবে এবং আল্লাহ আকবর বলে হাত বেঁধে ছনা পড়বে। এরপর পুনরায় কান পর্যন্ত হাত উঠাবে এবং আল্লাহ আকবর বলে হাত ছেড়ে দিবে। পুণরায় হাত উঠাবে এবং আল্লাহ আকবর বলে হাত ছেড়ে দিবে। আবার হাত উঠাবে এবং আল্লাহ আকবর বলে হাত বেঁধে নিবে। অর্থাৎ প্রথম তকবীরে হাত বাঁধবে, এরপর দু'তকবীরে হাত লটকিয়ে রাখবে। অতঃপর চতুর্থ তকবীরে হাত বেঁধে নিবে। এটাকে এভাবে স্মরণ রাখুন, যখন তকবীরের পর কিছু পড়তে হয়, তখন হাত বাঁধবে এবং যখন কিছু পড়তে হয় না, তখন হাত ছেড়ে দিবে। চতুর্থ তকবীরের পর যখন হাত বেঁধে নিবে, তখন ইমাম আয়ুজুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ নিম্নস্বরে পড়ার পর আলহামদু ও অন্য একটি সূরা পড়বে। অতঃপর রুকু সিজদা করে প্রথম রাকাত শেষ করবে। যখন দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবে, তখন প্রথমে আলহামদু ও অন্য একটি সূরা পড়বে। এরপর তিনবার কান পর্যন্ত হাত উঠায়ে 'আল্লাহ আকবর' বলবে কিন্তু হাত বাঁধবে না এবং চতুর্থবার হাত না উঠায়ে আল্লাহ আকবর বলে রুকুতে চলে যাবে। এর থেকে বুঝা গেল যে দুই ঈদে ছয়টি অতিরিক্ত তকবীর রয়েছে। তিন তকবীর প্রথম রাকাতে কিরাতের আগে ও তকবীর তাহরীমার পরে এবং দ্বিতীয়

রাকাতে তিন তকবীর কিরাতের পর রুকুর তকবীরের আগে। এ ছয় তকবীরে প্রত্যেকবার হাত উঠাবে এবং প্রত্যেক দু'তকবীরের মাঝখানে তিন তসবীহ পরিমাণ বিরতি দিবে। ঈদদ্বয়ে মুস্তাহাব হচ্ছে প্রথম রাকাতে আলহামদুর পর সূরা জুমা পড়া এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা মুনাফেকুন অথবা প্রথম রাকাতে هَلْ اَتٰكَ এবং দ্বিতীয় রাকাতে سَبِّحِ اسْمَ পড়া। (দুর্রুল মুখতার, বাহার) নামাযের পর ইমাম দুটি খুতবা পড়বে। জুমার খোতবায় যে বিষয়গুলো সুন্নাত, ঈদদ্বয়ের খোতবায়ও সেগুলো সুন্নাত। আর যেসব বিষয় জুমার খোতবায় মকরুহ,সেগুলো ঈদদ্বয়ের খুতবায়ও মকরুহ। কেবল দুটি বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে, একঃ জুমার প্রথম খুতবার আগে খতীবের বসাটা সুন্নাত, কিন্তু ঈদে না বসাটা সুন্নাত। দুইঃ ঈদদ্বয়ে প্রথম খোতবার আগে নয়বার, দ্বিতীয় খোতবার আগে সাতবার এবং মিম্বর থেকে নেমে চৌদ্দবার আল্লাহ আকবর বলা সুন্নাত, কিন্তু জুমাতে নয়। (আলমগীরী, দুর্রুল মুখতার, বাহার)

মাসআলাঃ প্রথম রাকাতে তকবীর বলার পর কেউ শামিল হলে, সে সেই সময়ে তিন তকবীর বলে নিবে যদিওবা ইমাম কিরাত শুরু করে দেয়।

(আলমগীরী, দুর্রুল মুখতার,)

মাসআলাঃ ইমামকে যদি রুকুতে পায়, তাহলে প্রথমে দাঁড়িয়ে তকবীর তাহরীমা বলবে। এরপর দেখবে যে যদি ঈদের তকবীর বলার পরও ইমামকে রুকুতে পাওয়া যাবে, তাহলে ঈদের তকবীরও বলে রুকুতে শামিল হবে। আর যদি এটা মনে হয় যে, তকবীর বলতে গেলে ইমাম রুকু থেকে মাথা উঠায়ে ফেলবে, তাহলে আল্লাহ আকবর বলে রুকুতে শরীক হয়ে যাবে এবং রুকুতেই হাত না উঠায়ে ঈদের তকবীর বলবে। যদি রুকুতে তকবীর পূর্ন করার আগে ইমাম মাথা উঠায়ে ফেলে, তাহলে ইমামের সাথে মাথা উঠায়ে ফেলবে এবং অবশিষ্ট তকবীরগুলো বাদ দিবে। এগুলো পরে আর বলবে না।

(আলমগীরী ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ দ্বিতীয় রাকাতে যদি কেউ শরীক হয়, তাহলে প্রথম রাকাতের তকবীর ওই সময় পড়বে, যখন নিজের বাদ পড়া রাকাত পূর্ণ করার জন্য দাঁড়াবে। (আলমগীরী ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ ইমাম রুকু থেকে উঠার পর কেউ শামিল হলো, তখন সে তকবীর বলবে না বরং যখন নিজের বাদ পড়া রাকাত পড়বে, তখন বলবে। (আলমগীরী)।

মাসআলাঃ শেষ রাকাতে সালাম ফিরানোর আগে শরীক হলে, নিজের উভয় রাকাত তকবীর সমূহ সহকারে পুরা করবে। (আলমগীরী ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ কোন অজুহাতের কারণে ঈদের দিন নামায হতে পারলো না,

pdf By Syed Mostafa Sakib

(উদাহরণ স্বরূপ ভীষণ বৃষ্টি হলো বা মেঘের জন্য চাঁদ দেখা গেল না এবং এমন সময় চাঁদ দেখার প্রমান পেল যে তখন আর নামায পড়ার সময় নেই অথবা মেঘলা অবস্থার কারণে নামায পড়তে দ্বিপ্রহর গড়িয়ে গেল), তাহলে দ্বিতীয় দিন পড়া যাবে। যদি দ্বিতীয় দিনও পড়া না যায় তাহলে ঈদুল ফিতর তৃতীয় দিন পড়া যাবে না। আর দ্বিতীয় দিনের নামাযের সময় প্রথম দিনের মত অর্থাৎ এক তীর পরিমাণ সূর্য উঠার পর শরয়ী অর্ধ দিবস পর্যন্ত। যদি বিনা কারণে প্রথম দিন ঈদুল ফিতরের নামায পড়া না হয়, দ্বিতীয় দিন পড়া যাবে না।

(কাযী খান, আলমগীরী, দুরুল মুখতার)

মাসআলাঃ ঈদুল আযহারের সমস্ত আহকাম ঈদুল ফিতরের মত। কেবল দু'একটি বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। ঈদুল আযহায় মুস্তাহাব হচ্ছে, নামাযের আগে কিছু না খাওয়া, যদিওবা কুরবানী না করে। আর খেয়ে ফেললে কোন মকরূহ হবে না এবং উচ্চস্বরে তকবীর বলে রাস্তা দিয়ে যাওয়া। আর ঈদুল আযহার নামায কোন অজুহাতের কারণে বার তারিখ পর্যন্ত বিনা মকরূহে দেরী করা যায়। বার তারিখের পর দেরী করা যায় না। আর বিনা কারণে দশ তারিখের পরে পড়া মকরূহ (কাযী খান, আলমগীরী)

মাসআলাঃ কুরবানীকারীদের জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে পহেলা থেকে ১০ই জিলহজ্ব পর্যন্ত দাড়ি–গোঁফ, চুল ও নখ না কাটা (দুরুল মুখতার, বাহার)

মাসআলাঃ ঈদের নামাযের পর মুছাফাহা ও কোলাকুলি করা, যেমন প্রায় মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত আছে, উত্তম। (বাহারে শরীয়ত)

তকবীর তশরীক

৯ই জিলহজ্বের ফজর থেকে ১৩ই জিলহজ্বের আছর পর্যন্ত প্রত্যেক ফর্য নামাযের পর, যেটা জমাত সহকারে আদায় করা হয়, একবার উচ্চস্বরে তকবীর বলা ওয়াজিব এবং তিনবার বলা আফজল। এটাকে তকবীর তশরীক বলা হয়। তকবীরটা হচ্ছে-

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآاِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ۔

(আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ওয়ালিল্লাহিল হামদ) (তনবীরুল আবসার, বাহার)

মাসআলাঃ তকবীর তশরীক সালাম ফিরানোর সঙ্গে সঙ্গে বলা ওয়াজিব। যদি মসজিদের বাহির হয়ে গেল বা ইচ্ছাকৃতভাবে অযু ভঙ্গ করে ফেললো বা কারো সাথে কথা বললো, যদিওবা ভুলে বলে থাকে, তাহলে তকবীর বাদ পড়ে গেল। আর যদি বিনা ইচ্ছায় অযু ভঙ্গ হয়, তাহলে তকবীর বলে নিবে।

(রদ্দুল মুহতার, দুরুল মুখতার, বাহার)

মাসআলাঃ তকবীর তশরীক তার উপর ওয়াজিব, যে শহরে বসবাস করে বা যে স্থায়ী বসবাসকারীর পিছনে ইক্তেদা করে, যদিওবা সেই ইক্তেদাকারী মহিলা বা মুসাফির হোক বা মফস্বলে বসবাসকারী হোক। এসব লোক যদি শহরে স্থায়ী বসবাসকারীর ইক্তেদা না করে থাকে, তাহলে তাদের উপর ওয়াজিব নয়।

(দুরুল মুখতার, বাহার)

মাসআলাঃ তকবীর তশরীক জুমার পরেও ওয়াজিব যদি উল্লেখিত তারিখের মধ্যে জুমার দিন হয়ে থাকে। নফল, সুন্নাত ও বিতরের পর ওয়াজিব নয়। অবশ্য ঈদের নামাযের পরও বলা চাই। (দুরুল মুখতার, বাহার)

গ্রহণের নামায

সূর্য গ্রহণের নামায সুন্নাতে মুযাক্কাদা এবং চন্দ্রগ্রহণের নামায মুস্তাহাব। সূর্য গ্রহণের নামায জামাত সহকারে পড়া মুস্তাহাব। একাকীও পড়া যায়। যদি জামাত সহকারে পড়া হয়, তাহলে এর জন্য খোতবা ব্যতীত জুমার সমস্ত শর্ত প্রযোজ্য। এর জামাত সেই ব্যক্তিই কায়েম করতে পারেন, যিনি জুমা পড়াতে পারেন। এ রকম লোক পাওয়া না গেলে, ঘরে বা মসজিদে একাকী পড়বে।

(রদ্দুল মুহতার, দুরুল মুখতার, বাহার)

মাসআলাঃ গ্রহণের নামায তখনই পড়তে হয়, যখন গ্রহণ শুরু হয়; গ্রহণ ছেড়ে দেয়ার পর নয়। গ্রহণ ছেড়ে দিতে শুরু করেছে কিন্তু এখনও বাকী, তখনও নামায শুরু করা যায়। গ্রহণের সময় সেটার উপর মেঘের আবরণ আসলেও যেন নামায পড়া হয়। (জাওহেরা ও ন্যাইয়ারা)

মাসআলাঃ এমন সময় গ্রহণ লেগেছে যখন নামায নিষিদ্ধ, তাহলে নামায পড়বে না বরং দুআয় নিয়োজিত থাকবে। ওই অবস্থায় সূর্য ডুবে গেলে, দুআ শেষ করে মগরিবের নামায পড়বে। (জাওহেরা, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ গ্রহণের নামায নফলের মত দুরাকাত পড়বে অর্থাৎ অন্যান্য নামাযের মত প্রত্যেক রাকাতে রুকু সিজদা করবে।

মাসআলাঃ গ্রহণের নামাযে আযান একামত নেই। উচ্চস্বরে কিরাতও নেই। নামাযের পর গ্রহণ ছেড়ে দেয়া পর্যন্ত দুআয় নিয়োজিত থাকবে। দু'রাকাত থেকে অধিকও পড়া যায় এবং তখন দু'রাকাতের পর বা চার রাকাতের পর সালাম ফিরাতে পারে। (রদ্দুল মুহতার, দুরুল মুখতার, ফতহুল কদীর)

মাসআলাঃ লোক যদি নামাযের জন্য সমবেত না হয়, তাহলে اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ বলে আহবান করা যায়। (দুরুল মুখতার, ফতহুল কদীর)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ ঈদগাহ বা জামে মসজিদে গ্রহণের জামাত কায়েম করা আফজল। তবে অন্য জায়গায় কায়েম করলেও কোন ক্ষতি নেই। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ যদি স্মরণ থাকে, তাহলে সূরা বাকারা, আলে ইমরানের মত বড় বড় সূরা পাঠ করবে এবং রুকু সিজদা দীর্ঘায়িত করবে এবং নামাযের পর সূর্যের গ্রহণ ছেড়ে দেয়া পর্যন্ত দুআয় নিয়োজিত থাকবে। নামায সংক্ষিপ্ত করে দুআ দীর্ঘায়িত করাও জায়েয। ইমাম কিবলামুখি হয়ে দুআ করতে পারেন বা মুক্তাদীগণের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে পারেন এবং এটা উত্তম এবং মুক্তাদীগণ আমীন বলতে থাকবে। দুআ করার সময় লাঠি বা কামানের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানোও উত্তম। তবে দুআ করার জন্য যেন মিম্বরে যাওয়া না হয়।

(দুর্রুল মুখতার, বাহার, ফতহুল কদীর)

মাসআলাঃ সূর্য গ্রহণ ও জানাযা উভয়টা যদি একই সময় সম্মুখীন হয়, তাহলে প্রথমে জানাযার নামায পড়বে। (জাওহেরা, বাহার)

মাসআলাঃ চন্দ্রগ্রহণের নামাযে জামাত নেই। ইমাম বর্তমান থাকুক বা না থাকুক যে কোন অবস্থায় একাকী পড়বে। (দুর্রুল মুখতার, বাহার, ফতহুল কদীর) ইমাম দুই বা তিন ব্যক্তি নিয়ে জামাত করতে পারে। (বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ খুব জোরে ঝড়, তুফান আসলো বা দিনে ঘোর অন্ধকারে ছেয়ে গেল বা রাত্রে ভয়ংকর আলো দেখা গেল অথবা অবিরাম বজ্রপাত হলো বা আসমান লাল হয়ে গেল, অধিক হারে বিদ্যুৎ চমকালো, বা মহামারি ইত্যাদি দেখা দিল বা ভূমিকম্প আসলো কিংবা শত্রুর ভয় বা ভীতিকর কোন কিছু দেখলো, এ সবের জন্য দু'রাকাত নামায মুস্তাহাব।

(আলমগীরী, দুর্রুল মুখতার ইত্যাদি)

জানাযার অধ্যায়

অসুখ বিসুখের বর্ণনা

রোগও একটি বড় নিয়ামত। এর অগণিত উপকার রয়েছে, যদিওবা বাহ্যিকভাবে মানুষের কষ্টবোধ হয়। কিন্তু মূলতঃ এর ফলে সান্তনা ও আরামের বড় ভান্ডার হস্তগত হয়। এ বাহ্যিক শারীরিক রোগ যেটাকে মানুষ অসুখ ও মসীবত মনে করে, আসলে এটা রুহানী রোগসমূহের এক মোক্ষম চিকিৎসা। রুহানী রোগই হচ্ছে আসল রোগ এবং এটা অবশ্যই বড় ভয়ানক বিষয় এবং এটাকে ধ্বংসকারী রোগ মনে করা চাই। তাই শারীরিক রোগ বা মসীবতকে মানুষ যেন

খুশী মনে গ্রহণ করে। তা সম্ভব না হলে কমপক্ষে যেন ছবর ও ধৈর্য ধারণ করে। ভীত ও অধৈর্যতা প্রকাশ করে যেন ছওয়াবটা হাতছাড়া না করে। আর অধৈর্যতা প্রকাশ করার দ্বারা মসীবত দূরীভূত হয় না। এত বড় ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়াটা আর একটি মসীবত বৈ কি? অনেক অধৈর্য ব্যক্তি রোগাক্রান্ত অবস্থায় বেহুদা কথা বলে থাকে। এমনকি অনেকে কুফরী শব্দ উচ্চরণ করে। মাজাল্লা এটাকে আল্লাহ তাআলার জুলুম বলে ফেলে। এ ধরণের কথা ইহ ও পরকালের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হয়ে দাড়ায়। জনাব রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) ফরমান, মুসলমানের যে দুঃখ কষ্ট হয় ও বলা–মসীবত আসে, এমনকি কাঁটা বিদ্ধ হলে, আল্লাহ তাআলা এর উসীলায় তার গুনাহ বিলোপ করেন। (বুখারী মুসলিম)

হুযুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আরও ফরমান, মুসলমানের যে কষ্ট হয়, রোগে হোক বা অন্য কোন কারণে, আল্লাহ তাআলা এর কারণে ওর গুনাহ সমূহ ফেলে দেন, যেমন বৃক্ষ থেকে পাতাসমূহ ঝরে পড়ে। (ছহীহ বোখারী ও মুসলিম) রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) আরও ফরমায়েছেন, বান্দার জন্য আল্লাহ তাআলার ইলমে কোন মর্যাদা নির্দিষ্ট থাকে এবং বান্দা যখন আমলের দ্বারা সেই মর্যাদায় পৌছতে পারে না, তখন শরীর, সম্পদ সন্তানাদি দ্বারা যাচাই করেন। অতপর তাকে ধৈর্য দান করেন। শেষ পর্যন্ত তাকে সেই মর্যাদায় পৌছিয়ে দেন যেটা তার জন্য আল্লাহ তাআলার ইলমে রয়েছে। (আবু দাউদ,আহমদ ইত্যাদি) আরও ইরশাদ ফরমান, কিয়ামতের দিন যখন মসীবত প্রাপ্তদেরকে ছওয়াব দেয়া হবে, তখন আরাম প্রাপ্তগণ আরযু করবে, আহা, দুনিয়াতে কাচি দ্বারা আমাদের চামড়া কাটা হতো। (তিরমীযী)

রোগী পরিদর্শন

রোগী দেখতে যাওয়া সুন্নাত। হাদীছ শরীফে এর অনেক ফযীলতের কথা বর্ণিত আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম) ফরমান, মুসলমান যদি স্বীয় মুসলমান (রোগী) ভাইকে দেখতে যায়, তাহলে ফিরে আসা পর্যন্ত জান্নাতের ফুল সংগ্রহ করতে থাকে। (রোখারী, মুসলিম) হুযুর (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র অভ্যাস ছিল যে, যখন কোন রোগীকে দেখতে যেতেন, তখন ফরমাতেন, لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْشَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى অর্থাৎ ইনশাআল্লাহ, কোন ভয় নেই, এ রোগ গুনাহসমূহ থেকে পবিত্রকারী। (রোখারী) হুযুর (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) আরও ফরমান, যখন তুমি কোন রোগীকে দেখতে যাবে, তখন তাকে বলবে যেন তোমার জন্য দুআ করে। কারণ রোগীর দুআ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফিরিশতাগণের দুআর মত। (ইবনে মাযা) অন্য এক হাদীছে বর্ণিত আছে, যখন কোন মুসলমান অপর কোন মুসলমানকে দেখতে যাবে, তখন সাতবার এ দুআটি পড়বেঃ

اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ ـ

যদি মৃত্যু না আসে, তাহলে ওর আরোগ্য লাভ হবে।

মাসআলাঃ যদি মনে হয় যে দেখতে যাওয়াটা রোগী পছন্দ করেনা তাহলে এমতাবস্থায় দেখতে যাবে না। (দুরুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ যদি রোগী দেখতে গিয়ে রোগের জটিলতা পরিলক্ষিত হয়, তাহলে রোগীর সামনে যেন এ রকম প্রকাশ না করে যে, তোমার অবস্থা ভাল নয়, বা মাথা নাড়বে না, যদ্বারা অবস্থা খারাপ হওয়াটা বুঝায়। রোগীর সামনে এমন কথা বলা চাই যা তার কাছে ভাল লাগে। ওর মন মেজাজের কথা জিজ্ঞাসা করতে পারেন, তার মাথায় হাত রাখবেন না। তবে রোগী যদি কামনা করে, রাখতে পারেন। (দুরুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ ফাসেকের দেখাশুনা করাও জায়েয। কেন না রোগীর দেখাশুনা ইসলামের হক সমুহের অন্তর্ভূক্ত আর ফাসেকওতো মুসলমান। ইহুদী বা খৃষ্টান যদি জিম্মি হয়ে থাকে, তাহলে ওদের দেখাশুনাও জায়েয। (দুরুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার) মজুসীকে দেখতে যাওয়া না যাওয়া নিয়ে ওলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যদিও জিম্মি হয়ে থাকে। (এনায়া) হিন্দুরা মজুসীদের হুকুমের আওতাধীন। তাদের আহকাম ওটাই, যা মজুসীদের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য এরা আহলে কিতাবের হুকুমাদির আওতাধীন নয়! ভারতবর্ষের ইহুদী, খৃষ্টান, মজুসী, মূর্তি পূজারক কেউ জিম্মি নয়। (বাহারে শরীয়ত)

মৃত্যুর বর্ণনা

একদিন না একদিন এ পৃথিবী ত্যাগ করতে হবে এবং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হবে। অতএব যেহেতু এখান থেকে চলে যেতে হবে, সেহেতু সেখানকার প্রস্তুতি নিতে হবে, যেখানে সব সময় থাকতে হবে; এবং সেই সময়ের কথাটা সব সময় মনে জাগরুক রাখা চাই। হুযুর (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) ফরমান, দুনিয়াতে একজন মুসাফিরের মত বসবাস কর অর্থাৎ মুসাফির যেমনি এক অপরিচিত ব্যক্তি হয়ে থাকে, এবং পথের ধারে খেল তামাশার শরীক হয় না। কারণ এতে তার দেরী হবে এবং মনজিলে মকসুদে

পৌছতে পারবে না। অনুরূপ মুসলমানদের উচিৎ যেন দুনিয়ার ফান্দে জড়িয়ে না পড়ে এবং এর সাথে এ রকম সম্পর্কও যেন সৃষ্টি না করে,যদ্বারা মূল উদ্দেশ্য সাধনে বাধার সম্মুখীন হয়। প্রায় সময় যেন মৃত্যুকে স্মরণ করা হয়। কারণ মৃত্যুর স্মরণ পার্থিব সম্পর্কের গোড়া কেটে দেয়। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছেঃ اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ অর্থাৎ স্বাদসমূহ কর্তনকারী মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণ কর। তবে কোন মসীবতের সময় মৃত্যু কামনা কর না, কারণ এতে বারণ করা হয়েছে। আর যদি একান্ত বাধ্য হয়ে বলতে হয়, তাহলে এ রকমই বলবেন, 'হে আল্লাহ, আমাকে জীবিত রাখ, যতক্ষণ জিন্দেগী আমার জন্য মঙ্গলময় হয় এবং মৃত্যু দান কর, যখন মৃত্যুটা আমার জন্য উত্তম হয়'। (বুখারী, মুসলিম) মুসলমানদের উচিৎ আল্লাহ তাআলার প্রতি সদা ভাল ধারণা পোষণ করা এবং তার রহমতের প্রত্যাশী থাকা। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছেঃ কেউ যেন মৃত্যুবরণ না করে কিন্তু এ রকম অবস্থায় যে আল্লাহর প্রতি ভাল ধারনা পোষণ করে কারণ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ অর্থাৎ আমার বান্দা আমার প্রতি যে রকম ধারনা পোষন করে, আমি তার সাথে সে রকম আচরণ করি। হুযুর (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) এক যুবকের কাছে তশরীফ নিয়ে গেলেন। সেই যুবক তখন মৃত্যুর সন্নিকট ছিল। হুযুর (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজেকে কেমন অবস্থায় মনে করছ? আরয করলো, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহর প্রতি আশাবাদি এবং নিজের গুনাহসমূহের জন্য ভয়। হুযুর (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) ফরমালেন,এ দুটো (অর্থাৎ আশা এবং ভয়) যে বান্দার অন্তরে থাকবে, আল্লাহ তাআলা ওকে ওটা দান করবে, যেটার জন্য সে আশাবাদি এবং ওটা থেকে নিরাপদ রাখবে, যেটার থেকে ভয় করে। রূহ কবজ হওয়ার সময়টা খুবই কঠিন সময়। ওটার উপরই সমস্ত আমল নির্ভরশীল, এমন কি ঈমানের সমস্ত পরকালীন পরিণতি এ শেষ মুহূর্তের উপর নির্ভরশীল। অভিশপ্ত শয়তান তখন ঈমান হরনের সুযোগে থাকে। যাকে আল্লাহ তাআলা ওর ধোঁকা থেকে রক্ষা করেন এবং ঈমানের সাথে পরিসমাপ্তি দান করেন, সে কৃতকার্য হলো। হুযুর (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) ফরমান, যার শেষ বাক্য হবে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ অর্থাৎ যে কলেমা তৈয়্যবা পাঠ করে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করলো।

মাসআলাঃ যখন মৃত্যুর সময় সন্নিকট হয় এবং এর লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়, তখন সুন্নাত হচ্ছে ডান পাশ করে শোয়ায়ে কিবলার দিকে মুখ করে দেয়া এবং চিৎ করে শোয়ানোও জায়েয। তখন পাদ্বয় কিবলার দিকে রাখবে, কারন এ

pdf By Syed Mostafa Sakib

রকম শোয়ানো হলেও মুখ কিবলার দিকে হয়ে যাবে। কিন্তু এ রকম অবস্থায় মাথাকে একটু উঁচু করে রাখতে হবে আর যদি কিবলার দিকে মুখ করানোটা কষ্টকর হয়, তাহলে যে রকম আছে, সে রকম রেখে দেয়া চায়।

(হেদায়া আলমগীরী, দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ সকরাতের অবস্থায় যতক্ষণ রূহ ওষ্ঠাগত না হয়, ততক্ষণ ওকে যেন তলকীন করে অর্থাৎ ওর পাশে উচ্চ স্বরে কালেমা পাঠ করে । তবে ওকে যেন বলার জন্য নির্দেশ দেয়া না হয়।

(আলমগীরী ফত্হল কদীর জাওহেরা, নায়ারা)

মাসআলাঃ যখন কলেমা পড়ে নেয়, তখন যেন তলকীন মওকুফ করে দেয়। অবশ্য কলেমা পাঠ করার পর সে যদি অন্য কোন কথা বলে, তাহলে পুনরায় যেন তলকীন করে, যাতে শেষ বাক্য, لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ হয়। (আলমগীরী ও জাওহেরা)

মাসআলাঃ তলকীনকারী নেককার ব্যক্তি হওয়া বাঞ্চনীয় এবং এ রকম ব্যক্তি না হওয়া চায়, যার কাছে ওর মৃত্যুটা আনন্দদায়ক। ওর কাছে ওই সময় নেক্কার ও পরহিজগার লোক উপস্থিত থাকা খুবই উত্তম এবং ওই সময় ওর পাশে সুরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করা এবং সুগন্ধির ব্যবস্থা যেমন লোবান বা আগরবাতি জ্বালানো মুস্তাহাব। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ মৃত্যুর সময় হায়েজ নিফাসওয়ালী মহিলাগণ ওর পাশে আসতে পারে (কাযী খান, ফত্হল কদীর, আলমগীরী) কিন্তু যার হায়েজ নিফাস বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু এখনও গোসল করেনি, ওই ধরণের নাপাক মহিলার না আসা চায় আর চেষ্টা করা চায় যে ঘরে যেন কোন ফটো বা কুকুর না থাকে। যদি এ রকম কিছু থাকে তাহলে যেন সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে ফেলা হয়। কারণ এগুলো যেখানে থাকে, ওখানে রহমতের ফিরিশতা আসে না। ওর সকরাতের সময় নিজের জন্য ও ওর জন্য যেন দুআ করতে থাকে। তখন যেন মুখ দিয়ে কোন মন্দ শব্দ বের করা না হয়, কারণ ওই সময় যা কিছু বলা হয়, ফিরিশতাগণ ওটার উপর আমীন বলে। সকরাতের সময় কষ্ট হতে দেখলে সূরা ইয়াসিন ও সুরা রাআদ যেন পড়া হয়। (বাহার)

মাসআলাঃ মৃত্যুর সময় খোদা না করুক, মুখ দিয়ে যদি কুফরী শব্দ বের হয়, তাহলে যেন কুফরীর হুকুম প্রয়োগ করা না হয়। হয়তো মৃত্যু যন্ত্রনায় অস্থির হয়ে বেহুঁশ অবস্থায় এ ধরণের শব্দ মুখ দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে। (দুর্রুল মুখতার, ফত্হল কদীর আলমগীরী) আর এ রকম হওয়ারও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে যে পূর্ণ কথাটা বুঝে আসেনি কারণ সে সময় পরিষ্কারভাবে কথা বলাটা

দুষ্কর হয়। (বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ যখন রূহ বের হয়ে যায়, তখন যেন একটি চওড়া কাপড় দ্বারা চোয়ালের নিচ থেকে মাথায় উপরে পেচায়ে গিরা মারা হয়, যাতে মুখ খোলা না থাকে, চোখ যেন বন্ধ করে দেয়া হয় এবং আঙ্গুলসমূহ ও হাত পা যেন সোজা করে দেয়া হয়। এ কাজটি ঘরের অধিবাসীদের যে সবচে নমনীয়ভাবে করতে পারে, বাপ হোক বা ছেলে সে যেন করে। (আলমগীরী জাওহেরা, নায়ারা)

মাসআলাঃ চোখ বন্ধ করার সময় যেন এ দুআটি পড়া হয়ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ اَمْرَهٗ وَسَهِّلْ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهٗ وَاَسْعِدْهُ بِلِقَاءِكَ وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ اِلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا خَرَجَ عَنْهُ.

(দুর্রুল মুখতার, আলমগীরী ফত্হল কদীর)

মাসআলাঃ মৃতের পেটের উপর যেন লোহা, নরম মাটি বা অন্য কোন ভারী জিনিষ রাখা হয়, যাতে পেট ফুলে না যায় (আলমগীরী) তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভারী যেন না হয়, কারণ সেটা মৃতের জন্য কষ্টদায়ক।

(দুর্রুল মুখতার, বাহার)

মাসআলাঃ মৃতের সমস্ত শরীর যে কোন কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখবে এবং ওকে খাটে বা আসন জাতীয় কোন উঁচু জায়গায় রাখবে, যাতে মাটির আর্দ্রতা না লাগে। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ গোসল, কাফন ও দাফনে জলদি করা চায়, হাদীছ শরীফে এ ব্যাপারে খুবই জোর দেয়া হয়েছে। (জাওহেরা, ফত্হল কদীর)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তির জিম্মায় কর্জ বা যে কোন প্রকারের দেনা থাকলে, তাড়াতাড়ি যেন আদায় করে দেয়। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, মৃত ব্যক্তি স্বীয় কর্জের জন্য বন্দী থাকে। অন্য এক হাদীছে বর্ণিত আছে, ওর রূহ জ্বলন্ত অবস্থায় থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত কর্জ আদায় করা না হয়।

মাসআলাঃ কোন মহিলা মারা গেল এবং ওর পেটে শিশু নড়াচড়া করছে, তাহলে বাঁ দিকের পেট কেটে যেন শিশু বের করে ফেলা হয়।

মাসআলাঃ মহিলা জীবিত কিন্তু ওর পেটে শিশু মারাগেল এবং মহিলার জীবন হুমকীর সম্মুখীন হলো, তাহলে শিশু কেটে বের করা যাবে আর যদি শিশু জীবিত থাকে, তাহলে মহিলার যতই কষ্ট হোক না কেন, শিশু কেটে বের করা না জায়েয। (আলমগীরী, দুর্রুল মুখতার, বাহার)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার বর্ণনা

মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোটা ফরযে কেফায়া। কয়েকজনে গোসল করালে সবার জিম্মা থেকে আদায় হয়ে যাবে, (আলমগীরী) গোসল দেয়ার নিয়ম হচ্ছে, যে খাটে বা আসন বা তক্তায় গোসল দেয়ার মনস্থ করা হয়, সেটাকে তিন বা পাঁচ বা সাতবার ধোঁয়া দিবে অর্থাৎ যে জিনিষে সেই সুগন্ধিটা জ্বালানো হবে, সেটা খাট ইত্যাদির চারিদিকে তিন বা পাঁচ বা সাতবার ঘুরাবে এবং সেটার উপর মৃত ব্যক্তিকে শোয়ায়ে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত কোন কাপড় দ্বারা ঢেকে দিবে। অতপর গোসলদানকারী স্বীয় হাতে কাপড় জড়িয়ে প্রথমে শৌচক্রিয়া করাবে। এর পর নামাযের ওযুর মত ওযু করাবে অর্থাৎ মুখ এরপর কনুই সহ হাত ধুইয়ে দিবে। অতপর মাথা মুসেহ করাবে। তারপর পা ধুইয়ে দিবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির ওযুতে প্রথমে কব্জি পর্যন্ত হাত ধোয়া, কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া নেই। তবে কোন কাপড় ও রুই এর পুটলি ভিজায়ে দাঁত, মাড়ি ও ঠোঁট ও নাকের ছিদ্র মুছে দিবে। অতপর চুল ও দাড়ি থাকলে গোলাপজল দ্বারা ধুইবে। এটা পাওয়া না গেলে পবিত্র সাবান যা মুসলমানদের কারখানায় তৈরীকৃত বা বেসন অথবা অন্য কিছু দ্বারা ধুইবে। এসব কিছু পাওয়া না গেলে কেবল পানিই যথেষ্ট। তারপর মৃত ব্যক্তিকে বাম পাশ করে শোয়ায়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কুল পাতা সিদ্ধ পানি ঢেলে দিবে যেন তক্তা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অতপর ডান পাশ করে শোয়ায়ে অনুরূপভাবে পানি ঢালবে। যদি কুল পাতা সিদ্ধ পানি পাওয়া না যায়, তাহলে পরিষ্কার মৃদু গরম পানিই যথেষ্ট। অতপর হেলান করে বসায়ে আস্তে আস্তে পেটের উপর হাতে চাপ দিবে এবং কিছু বের হলে ধুইয়ে ফেলবে। ওযু বা গোসল পুনরায় করাবে না। এর পর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা শরীরে কর্পূরের পানি ঢেলে দিবে। তারপর কোন কাপড় দ্বারা ওর শরীরটা আস্তে আস্তে মুছে দিবে।

মাসআলাঃ একবার সারা শরীরে পানি ঢালা ফরয এবং তিনবার সুন্নাত। গোসল করানোর স্থান পর্দাবৃত করা সুন্নাত যেন গোসল দানকারী ও সাহায্যকারী ব্যতীত কেউ না দেখে। গোসল করানোর সময় ওভাবে শোয়ানো চায়, যেভাবে কবরে রাখা হয় অথবা কিবলার দিকে পা করে বা যেভাবে সহজ হয়, সেভাবে শোয়াবে। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ পুরুষকে পুরুষ এবং মহিলাকে মহিলা গোসল করাবে। মৃত ব্যক্তি যদি ছোট বালক হয়, তাহলে মহিলাও গোসল করাতে পারে এবং ছোট বালিকাকেও পুরুষ গোসল করাতে পারে। ছোট বলতে নাবালককে বুঝানো হয়েছে। (আলমগীরী, বাহার)

মাসআলাঃ স্ত্রী মারা গেলে, স্বামী ওকে গোসল করাতে বা স্পর্শ করতে পারে না, তবে দেখতে মানা নেই। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ স্বামী স্ত্রীর জানাযা কাঁধে নিতে পারে। কবরে নামাতে পারে এবং মুখও দেখতে পারে, অবশ্য গোসল করানো ও বিনা আবরনে শরীরের উপর হাত রাখা নিষেধ। (বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ কোন পুরুষ মারা গেল এবং ওখানে অন্য কোন পুরুষ নেই এবং ওর স্ত্রীও নেই, তাহলে যে মহিলা ওখানে উপস্থিত আছে সে ওকে তায়াম্মুম করাবে। যদি মহিলাটা ওর মুহরেম বা ওর বাঁদী হয়, তাহলে তায়াম্মুম করানোর সময় হাতে কাপড় জড়ানোর প্রয়োজন নেই আর যদি অপরিচিত হয়, তাহলে হাতে কাপড় মুড়ায়ে তায়াম্মুম করাবে। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ কোন ব্যক্তি এমন জায়গায় মারা গেল, যেখানে পানি পাওয়া যায় না, তাহলে তায়াম্মুম করায়ে জানাযার নামায পড়বে। তবে জানাযার পর দাফনের আগে যদি পানি পাওয়া যায়, তাহলে গোসল করায়ে পুনরায় নামায পড়বে। (আলমগীরী, দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ মৃত কাফিরের জন্য গোসল কাফন ও দাফন নেই বরং চটে মুড়ায়ে অপ্রসস্থ গর্তে গেরে ফেলা চায়। তাও তখন করবে যখন ওর সধর্মী কেউ না থাকে বা ওকে নিয়ে না যায়। অন্যথায় মুসলমান ওর গায়ে হাত লাগাবে না এবং ওর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় শরীক হবে না। (দুর্রুল মুখতার রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তির দু'হাত পাশে রাখবে, বুকের উপর রাখবে না। কারণ বুকের উপর রাখাটা কাফিরদের নিয়ম। (দুর্রুল মুখতার) অনেক জায়গায় নাভীর নিচে এমনভাবে রাখা হয়, যেমন নামাযে দাড়ানো অবস্থায় রাখা হয়, তাও না করা চায়। (বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তির গোসলের জন্য নতুন মাটির কলসির প্রয়োজন নেই। ঘরের ব্যবহৃত পাত্র দ্বারাও গোসল করানো যায়। অনেক লোক, যারা কুসংস্কার বশতঃ গোসলের পর লোটা কলসি ভেঙ্গে ফেলে, তা নাজায়েয ও হারাম। কারণ তা সম্পদের অপচয়, হয়তো গরীবদেরকে দিয়া দিবে অথবা নিজের কাজে লাগাবে, নাপাক হয়ে গেলে পাক করে নিবে। ঘরে রাখাটা অমঙ্গলজনক ধারনা করাটা অজ্ঞতা ও মুর্খতার পরিচায়ক বৈ অন্য কিছুই নয়। অনেকে কলসির পানি ফেলে দেয়। এটাও হারাম। (বাহারে শরীয়ত)

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাফনের বর্ণনা

মৃত ব্যক্তিকে কাফন দেয়াটা ফরযে কেফায়া (ফত্হুল কদীর) কাফনের তিনটি স্তর রয়েছে–জরুরত, কেফায়ত ও সুন্নাত। পুরুষের জন্য কাফনে সুন্নত হচ্ছে তিন কাপড়–লেফাফা, ইযার ও কামীছ এবং মহিলার জন্য কাফনে সুন্নাত হচ্ছে পাঁচ কাপড় যথাঃ লেফাফা, ইযার, কামীছ, উড়নী এবং সীনা বন্দ। পুরুষের জন্য কাফনে কেফায়ত হচ্ছে দুই কাপড়–লেফাফা ও ইযার এবং মহিলার জন্য কাফনে কেফায়ত হচ্ছে তিন কাপড়–লেফাফা, ইযার, উড়নী অথবা লেফাফা, কামীছ, উড়নী। পুরুষ ও মহিলার জন্য কাফনে জরুরত হচ্ছে, যতটুক পাওয়া যায়। তবে কমপক্ষে এতটুকু হওয়া চায় যদ্বারা সমস্ত শরীর ঢাকা যায়।

(হেদায়া, দুর্রুল মুখতার,আলমগীরী, কাযী খান)

মাসআলাঃ লেফাফা অর্থাৎ চাদর এমন হওয়া চায়, যা মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে এতটুকু অধিক লম্বা হওয়া চায় যাতে উভয় দিকে বাঁধা যায়। ইযার অর্থাৎ তোহবন্দ মাথা থেকে পা পর্যন্ত হতে হবে, এটা লেফাফা থেকে ততটুকু ছোট , যা লেফাফায় বাঁধার জন্য অতিরিক্ত থাকে। কামীছ যাকে কাফনী বলা হয়, এটা গলা থেকে হাঁটুর নিচে পর্যন্ত লম্বা রাখতে হয়! এর সামনে পিছে উভয় দিকে বরাবর হওয়া চায়। মূর্খদের মধ্যে পিছনে কম রাখার যে প্রচলন আছে, তা ভ্রান্ত। কামীছে আস্তিন ও কলি না হওয়া চায়। পুরুষ ও মহিলার কামীছে পার্থক্য রয়েছে। পুরুষের কামীছ কাঁধের উপর এবং মহিলার কামীছ বুকের দিকে ছিড়া হয়। উড়নী তিন হাত পরিমাণ হওয়া চায় এবং সীনাবন্দ বুক থেকে নাভী পর্যন্ত হওয়া চায় তবে রান পর্যন্ত হওয়াটা উত্তম। (আলমগীরী দুর্রুল মুখতার ও বাহার)

মাসআলাঃ বিনা প্রয়োজন কাফনে কিফায়ত থেকে কম করা নাজায়েয ও মকরূহ। (দুর্রুল মুখতার ও বাহার)

মাসআলাঃ কাফনে জরুরত হওয়া সত্বেও কাফনে সুন্নাতের জন্য সাহায্যের আবেদন করা নাজায়েয। কারণ বিনা প্রয়োজনে কারো কাছে প্রার্থনা করা নাজায়েয। অবশ্য যদি কাফনে জরুরত না থাকে, তাহলে কাফনে জরুরতের জন্য সাহায্যের আবেদন করা যাবে, অতিরিক্তের জন্য নয়, যদি বিনা আবেদনে কোন মুসলমান কাফনের চাহিদা পূর্ণ করে, তাহলে ইনশা আল্লাহ পূর্ণ ছওয়াব পাবে।

(ফত্ওয়ায়ে রেজভীয়া)

মাসআলাঃ কাফন উত্তম কাপড়ের হওয়া চায় অর্থাৎ পুরুষ ঈদ ও জুমার জন্য যে ধরণের কাপড় পরতো এবং মহিলা যে ধরণের কাপড় পরে বাপের বাড়ীতে

যাতায়ত করতো, সে ধরণের হওয়া চায়। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, পুরুষদেরকে ভাল কাফন পরিধান করাও কারণ তারা পরস্পর সাক্ষাৎ করে এবং ভাল কাফনের জন্য গর্ববোধ করে অর্থাৎ আনন্দিত হয়। সাদা কাফন উত্তম। কারণ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ফরমায়েছেন, নিজেদের মৃতদেরকে সাদা কাপড়ের কাফন পরিধান করাও।

(আলমগীরী গুণীয়া, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ কুসুম ও যাফরান দ্বারা রংগানো বা রেশমের কাফন পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ কিন্তু মহিলার জন্য জায়েয। অর্থাৎ জিন্দেগীতে যে কাপড় পরা যায়, সেটার কাফন দেয়া যায় এবং জিন্দেগীতে যেটা পড়া নাজায়েয, সেটার কাফনও নাজায়েয। (আলমগীরী, বাহার)

মাসআলাঃ পুরানো কাপড় দ্বারাও কাফন দেয়া যায়। (আলমগীরী জাওহেরা)

মাসআলাঃ নয় বছর বা এর অধিক বয়সের বালিকাকে মহিলার বরাবর পূর্ণ কাফন দিতে হবে এবং বার বছর বা এর অধিক বয়সের ছেলেকে পুরুষের বরাবর কাফন দিতে হবে আর নয় বছরের কম বয়সের বালিকাকে দু কাপড় এবং বার বছরের কম বয়সের ছেলেকে এক কাপড়ের কাফন দেয়া যায়। ছেলেদেরকেও দু কাপড় দিতে পারলে ভাল। তবে উভয়কে পূর্ণ কাফন দেয়াটা উত্তম যদিওবা একদিনের শিশু হোক না কেন।

(কাযীখান, রদ্দুল মুহতার, বাহার)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তি যদি কিছু সম্পদ রেখে যায়, তাহলে সেই সম্পদ থেকে কাফন দেয়া চায়। (রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ কর্জ, ওসীয়ত, মীরাছ এ সব থেকে কাফনের অগ্রাধিকার রয়েছে অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে প্রথমে কাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। এরপর অবশিষ্ট থেকে কর্জ আদায় করা হবে। অতপর যা অবশিষ্ট থাকে, এর এক তৃতীয়াংশ দ্বারা ওসীয়ত পূর্ণ করা হবে। এরপর যা অবশিষ্ট থাকে,তা ওয়ারীশগণ লাভ করবে। (জাওহেরা)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তি যদি কোন সম্পদ রেখে না যায়, তাহলে কাফনের জিম্মা ওর উপর যার উপর জিন্দেগীতে ভরনপোষণের দায়িত্ব ছিল। যদি এ রকমও কেউ না থাকে বা থাকলেও অপারগ, তাহলে বায়তুল মাল (সরকারী কোষাগার) থেকে দিতে হবে। যদি বায়তুল মালের ব্যবস্থা না থাকে, যেমন আমাদের দেশে এ রকম কোন ব্যবস্থা নেই, তাহলে সেই এলাকার মুসলমানদের উপর কাফন দেয়াটা ফরয। জেনে শুনে না দিয়ে থাকলে সবাই গুনাহগার হবে। যদি ওসব লোকদের পক্ষেও সম্ভব না হয়, তাহলে এক কাপড় পরিমাণ

pdf By Syed Mostafa Sakib

অন্যলোকদের থেকে চেয়ে নিবে। (দুর্রুল মুখতার জাওহেরা, নায়ারা ও বাহার)

মাসআলাঃ মহিলা সম্পদ রেখে গেলেও ওর কাফনের জিম্মা ওর স্বামীর উপর। তবে শর্ত হলো যে মৃত্যুর আগে এরকম কোন কিছু না হওয়া চায়, যদ্বারা স্বামী স্ত্রীর ভরণ পোষন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। আর যদি স্বামী মারা যায়, তাহলে ওর স্ত্রী সম্পদশালী হলেও ওর উপর কাফন প্রদান ওয়াজিব নয়।

(আলমগীরী, দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ উপরে যে বলা হয়েছে, অমুকের উপর কাফন ওয়াজিব, এর দ্বারা শরয়ী কাফন বুঝানো হয়েছে। অনুরূপ অন্যান্য জিনিসপত্র যেমন সুগন্ধি গোসলদানকারী ও বহনকারীর পারিশ্রমিক এবং দাফনের যাবতীয় খরচাদির বেলায় শরয়ী পরিমাণ ধর্তব্য।

এছাড়া অন্যান্য খরচাদি যা মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে খরচ করা হয়েছে তা যদি প্রাপ্তবয়স্ক ওয়ারীশগণের অনুমতি সাপেক্ষ হয়ে থাকে, তাহলে জায়েয, অন্যথায় খরচকারীই দায়ী থাকবে। (রদ্দুল মুহতার, বাহার)

কাফন পরিধানের নিয়ম

কাফন পরিধানের নিয়ম হচ্ছে, মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর শরীরকে কোন কাপড় দ্বার আস্তে আস্তে মুছে ফেলবে যাতে কাফন ভিজে না যায়। কাফনকে একবার বা তিনবার বা পাঁচ বা সাতবার আগরবাতি বা এ জাতীয় অন্য কিছুর ধোঁয়া লাগাবে, কিন্তু এর অধিক না। অতপর কাফন এভাবে বিছাবে যে প্রথমে বড় চাদর, এরপর তোহবন্দ, অতপর কামীছ বিছাবে। তারপর মৃতব্যক্তিকে ওটার উপর শোয়াবে এবং কামীছ পরিধান করাবে এবং দাড়ি ও সমস্ত শরীরে সুগন্ধি লাগাবে এবং সিজদার অংগসমূহ অর্থাৎ মস্তক নাক, হাত, হাঁটু ও পায়ে কর্পুর লাগাবে। তারপর লেফাফা প্রথমে বাম দিক থেকে,পরে ডান দিক থেকে জড়াবে, যেন ডান দিকটা উপরে থাকে। অতপর চুল ও পায়ের দিক বাঁধবে যাতে উড়ার কোন ভয় না থাকে।মহিলাকে কামীছ অর্থাৎ কাফনী পরিধান করানোর পর ওর চুলকে দুভাগ করে কাফনীর উপর বুক বরাবর রেখে দিবে এবং উড়নী অর্ধ পিঠের নিচ থেকে বিছায়ে মাথা পর্যন্ত এনে মুখের উপর নেকাবের মত রাখবে যাতে বুক পর্যন্ত ঢেকে থাকে। এর দৈর্ঘ হচ্ছে অর্ধপিঠ থেকে বুক পর্যন্ত এবংপ্রস্থ হচ্ছে এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি পর্যন্ত। যেসব লোকেরা বলে থাকে যে জিন্দেগীর মত ঢেকে রাখতে হবে, তা নিছক বেহুদা ও সুন্নাতের বিপরীত। অতপর যথারীতি ইযার ও লেফাফা জড়াবে। শেষে সবগুলোর উপর সীনাবন্দ স্তনের উপর থেকে রান পর্যন্ত এনে বাধঁবে (আলমগীরী, দুর্রুল মুখতার ও বাহার)

জানাযা নিয়ে যাবার বর্ণনা

মাসআলাঃ জানাযা কাঁধে নেয়া ইবাদত। প্রত্যেকের উচিত যে, এ ইবাদতে অলসতা না করা। হুযুর (দঃ) সা'দ বিন মুয়াযের জানাযা উঠায়েছিলেন।

(জাওহেরাঃ রাহার)

মাসআলাঃ একের পর এক করে খাটিয়ার চারিদিক কাঁধে নেয়া এবং প্রত্যেকবার দশ কদম যাওয়া সুন্নাত। পূর্ণ সুন্নাত হচ্ছে, প্রথমে মাথার ডানদিক কাঁধে নিবে এর পর পায়ের ডান দিক অতপর মাথার বাম দিক এবং শেষে পায়ের বাম দিক। প্রতিবার দশ কদম করে মোট চল্লিশ কদম নিয়ে যাবে। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, যে চল্লিশ কদম জানাযা বহন করে নিয়ে যাবে, ওর চল্লিশটি কবীরা গুনাহ বিলুপ্ত করা হবে এবং যে জানাযার চারিদিক কাঁধে নিবে আল্লাহ তাআলা ওকে চূড়ান্ত ক্ষমা করবেন।

(জাওহেরা আলমগীরী, দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ জানাযা নিয়ে যাবার সময় চারদিকের হাতলকে হাতে ধরে কাঁধের উপর রাখবে। জিনিষ পত্রের মত গরদান বা পিঠের উপর রাখা মকরূহ। চতুস্পদ জন্তুর উপর রেখে নিয়ে যাওয়াটাও মকরূহ।

মাসআলাঃ ছোট শিশুকে যদি এক ব্যক্তি হাতে উঠায়ে নিয়ে যায়, তাতে কোন দোষ নেই। লোকেরা একজনের হাত থেকে অন্যজনের হাতে নিয়ে নিবে।

মাসআলাঃ জানাযা বহনকারী দ্রুততার সাথে নিয়ে যাবে,তবে এমনভাবে যেতে হবে যেন মৃত ব্যক্তির উপর কোন চোট না লাগে। (মুজমেউল আনহার, রদ্দুল মুহতার, কাযী খান হেদায়া বেকায়া ফতহুল কদীর আলমগীরী)

মাসআলাঃ জানাযার সাথে গমনকারীদের জানাযার পিছে যাওয়াটাই আফজল। ডানে বামে যেন গমন না করে। যদি কেউ আগে আগে যায়, তাহলে ওর এতটুকু দুরত্ব বজায় রেখে চলা দরকার যেন অন্যান্য সাথীদের মধ্যে গণ্য করা না হয়। আর যদি সবাই জানাযার আগে থাকে, তাহলে সেটা মকরূহ।

(আলমগীরী, রদ্দুল মুহতার, বাহার)

মাসআলাঃ জানাযার সাথে পায়ে হেটে যাওয়া আফজল এবং বাহনযোগে হলে আগে যাওয়াটা মকরূহ,আর আগে থাকলে যেন জানাযার অনেক দুরত্বে থাকে।

(আলমগীরী ছগীরী)

মাসআলাঃ জানাযা নিয়ে যাবার সময় মাথার দিকটা সামনে হওয়া চায়।

(আলমগীরী বাহার)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ জানাযার সাথে আগুন নিয়ে যাওয়া নিষেধ। (আলমগীরী, বাহার)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তি যদি প্রতিবেশী বা আত্মীয় হয় অথবা কোন নেকবান্দা হয়, তাহলে ওনার জানাযার সাথে যাওয়াটা নফল নামায পড়া থেকে আফজল। (আলমগীরী ও বাহার)

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি জানাযার সাথে থাকে,ওর নামায পড়া ব্যতীত ফিরে না আসা চায়। এবং নামাযের পর মৃত ব্যক্তির ওলির অনুমতি নিযে ফিরে আসতে পারে। আর দাফনের পর অনুমতির প্রয়োজন নেই। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ জানযার সাথে গমনকারীদের দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা, হাসিঠাট্টা করা নিষেধ। (দুরুল মুখতার)

জানাযার নামাযের বর্ণনা

জানাযার নামায ফরযে কেফায়া। একজনও যদি পড়ে নেয়, তাহলে সবাই দায়মুক্ত হবে। অন্যথায় যাদের কাছে খবর পৌছেছিল কিন্তু নামায পড়েনি, তারা গুনাহগার হবে। এর ফরয হওয়াকে যে অস্বীকার করে, সে কাফির।

মাসআলাঃ জানাযার নামাযের জন্য জমাত শর্ত নয়। এক ব্যক্তিও যদি পড়ে নেয়, আদায় হয়ে গেল। (আলমগীরী) জানাযার নামায পড়ার নিয়ম হচ্ছে জানাযার নামাযের নিয়ত করে কান পর্যন্ত হাত উঠায়ে আল্লাহ আকবর বলে হাত নামিয়ে যথারীতি নাভীর নিচে বেঁধে নিবে এবং এ দুআটি পড়বে–

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَااِلٰهَ غَيْرُكَ ۔

বাংলা উচ্চারনঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা ছানাউকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা) এরপর হাত না উঠায়ে আল্লাহ আকবর বলবে এবং দরূদ শরীফ পড়বে। সেই দরূদ শরীফ পড়াটা উত্তম, যেটা নামাযে পড়া হয়। যদি অন্য কোন দরূদ শরীফ পড়া হয়, তাতেও কোন ক্ষতি নেই। এরপর পুনরায় আল্লাহ আকবর বলে নিজেরও মৃতব্যক্তির জন্য এবং সমস্ত ঈমানদার পুরুষ ও মহিলার জন্য এ দুআটি পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ۔

বাংলা উচ্চারনঃ আল্লাহুম্মাগফির লিহায়্যেনা ওয়া মাইয়্যেতেনা ওয়া শাহেদেনা ওয়া গায়েবেনা ওয়া ছাগীরেনা ওয়া কাবীরেনা ওয়া যাকারেনা ওয়া উনছানা। আল্লাহুম্মা মান্ আহ্ইয়াইতাহ মিন্না ফা আহয়িহী আলাল ইসলাম ওয়া মান তাওয়াফফাইতাহ মিন্না ফাতাওয়াফফাহ আলাল ঈমান) এরপর আল্লাহ আকবর বলে সালাম ফিরাবে।

মাসআলাঃ যার উপরোক্ত দুআটি স্মরণ না থাকে, সে অন্য কোন একটি দুআয়ে মাছুরা পড়ে নিবে। যেমন

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ تَوَالَدَ وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اَلْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ اِنَّكَ مُجِيْبُ الدَّعْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَاۤاَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۔

মাসআলাঃ জানাযার নামাযের চার তকবীরের মধ্যে কেবল প্রথম তকবীরে হাত উঠাবে, বাকীগুলোতে নয়। এবং চতুর্থ তকবীর বলার সাথে সাথে কিছু না পড়ে হাতখুলে সালাম ফিরাবে।

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তি যদি পাগল বা নাবালেগ হয়, তাহলে তৃতীয় তকবীরের পর এ দুআটি পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا ۔

বাংলা উচ্চারনঃ আল্লাহুম্মাজ আলহু লানা ফারতাঁও ওয়াজ আলহু লানা আজরাঁও ওয়া যুখরাও ওয়াজ আলহু লানা শাফিয়াঁও ওয়া মুশাফ্ফাআ) যদি বালিকা হয়, উপরোক্ত দুআর اِجْعَلْهَا এর জায়গায় شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً পড়বে। পাগল বলতে এমন পাগলকে বুঝানো হয়েছে, যে বালেগ হওয়ার আগে পাগল হয়ে গেছে। (গুনীয়া, বাহার)

মাসআলাঃ সালামে মৃত ব্যক্তি, ফিরিশতাসমূহও নামাযে অংশ গ্রহণকারীদের নিয়ত যেন থাকে। (দুরুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ ইমাম তকবীর ও সালাম উচ্চস্বরে বলবে এবং বাকী সব কিছু নিম্নস্বরে পড়বে।

মাসআলাঃ জানাযার নামাযে রোকন অর্থাৎ ফরয দুটি–চার তকবীর ও কিয়াম, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা তিনটি–(১) আল্লাহ তাআলার ছানা পাঠ, (২) দরূদ শরীফ

pdf By Syed Mostafa Sakib

পড়া ও (৩) মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করা।

মাসআলাঃ যেহেতু কিয়াম ফরয, সেহেতু বিনা কারণে বসে বা বাহনের উপর নামায পড়লে হবে না। তবে যদি মৃত ব্যক্তির অলী বা ইমাম অসুস্থ হেতু বসে নামায পড়ালো এবং মুক্তাদীগণ দাঁড়িয়ে পড়লো, তাহলে নামায হয়ে গেল।

(দুর্রুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ যার কয়েক তকবীর বাদ পড়ে গেছে; সে ইমাম সালাম ফিরানোর পর বাদ পড়া তকবীরগুলো বলে নিবে আর যদি এ ভয় হয় যে দুআ পড়তে গেলে দুআ পূর্ণ পড়ার আগে লোকেরা মুদারকে কাঁধে উঠায়ে নিবে, তাহলে কেবল তকবীর বলে নিবে এবং দুআ বাদ দিবে (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি চতুর্থ তকবীর বলার পর আসলো, ইমাম তখনও সালাম ফিরায়নি, তাহলে জামাতে শরীক হয়ে যাবে এবং ইমামের সালাম ফিরানোর পর তিনবার আল্লাহ আকবর বলে নিবে। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ যে সব বিষয় দ্বারা অন্যান্য নামায ভঙ্গ হয়ে যায়, ওসব বিষয় দ্বারা জানাযার নামাযও ভঙ্গ হয়ে যায়। শুধু একটি বিষয় যে, মহিলা পুরুষের সামনাসামনি হয়ে গেলে, জানাযার নামায ভঙ্গ হবে না। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ জানাযার নামেযের জন্যও ওসব শর্তসমূহ প্রযোজ্য, যা অন্যান্য নামায সমূহের জন্য নির্ধারিত। অর্থাৎ (১) পবিত্রতা (নামাযীর শরীর, কাপড়ও নামাযের জায়গা পাক হওয়া এবং নামাযী বাগেসল ও বাওযু হওয়া) (২) সতর ঢাকা ৩) কিবলার দিকে মুখ করা (৪) নিয়্যত করা। অবশ্য জানাযার জন্য সময় নির্দিষ্ট নেই এবং তকবীর তাহরীমা এর রোকন বা শর্ত নয়। (রদ্দুল মুহতার) মৃত ব্যক্তির জন্য শর্ত হচ্ছে ওকে গোসল করানো এবং গোসল সম্ভব না হলে তায়াম্মুম করানো এবং পবিত্র কাফন পরিধান করানো যদিওবা নীরে ময়লাযুক্ত হয়ে যায়, জানাযা সামনে থাকা চায় এবং জানাযা যেন মাটির উপর রাখা হয়। কোন জন্তু ইত্যাদির উপর রাখা হলে, নামায হবে না।

মাসআলাঃ প্রত্যেক মুসলমানের জানাযার নামায যেন পড়া হয়, যদিওবা সে যত বড় গুনাহগার হোক। তবে কয়েক প্রকার গুনাহগারের নামায পড়তে নেই। যেমন (১) বিদ্রোহী, যে বরহক ইমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হলো এবং সেই বিদ্রোহ অবস্থায় যদি মারা যায় (২) ডাকাত, যে ডাকাতি করা অবস্থায় মারা যায়, ওর গোসল ও জানাযার নামায কোনটায় হবে না। (৩) যে কয়েকজনকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে এবং যে নিজের মা বা বাপকে মেরে ফেলেছে, ওর নামাযও পড়া হবেনা। (আলমগীরী, দুর্রুল মুখতার, বাহার)

মাসআলাঃ জানাযার নামাযে ইমামতির হক সর্বাগ্রে ইসলামী শাসকের। অতপর কাযীর। এরপর জুমার ইমামের, তারপর মহল্লার ইমামের, অতপর ওলির। ওলির উপর মহল্লার ইমামকে অগ্রাধিকার দেয়া মুস্তাহাব। তবে মহল্লার ইমাম ওলি থেকে উত্তম হতে হবে, অন্যথায় ওলি আফজল (গুনীয়া, দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ ওলি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির আপনজন এবং নামায পড়ানোর ব্যাপারে ওলিদের ক্ষেত্রে সেই তরতীবই প্রযোজ্য, যা বিবাহের বেলায় রয়েছে। তবে কেবল এতটুকু পার্থক্য রয়েছে যে জানাযার নামাযে মৃত ব্যক্তির পিতাকে ছেলের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। অবশ্য পিতা যদি আলেম না হয় এবং ছেলে যদি আলেম হয়, তাহলে জানাযাতেও ছেলের অগ্রাধিকার রয়েছে। যদি আপনজন না থাকে, তাহলে আত্মীয় স্বজনকে অন্যান্যদের উপর প্রাধান্য দেয়া হবে।

(দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয় অনুপস্থিত এবং দুর সম্পর্কীয় আত্মীয় উপস্থিত রয়েছে, এ ক্ষেত্রে দুর সম্পর্কীয় আত্মীয়ই নামায পড়াবে। অনুপস্থিত বলতে এতটুকু দুরত্বকে বুঝানো হয়, যেখান থেকে আসার জন্য অপেক্ষা করাটা ক্ষতিকর। (রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ মহিলার কোন ওলি না থাকলে, স্বামী নামায পড়াবে। স্বামীও না থাকলে প্রতিবেশী পড়াবে। অনুরূপ পুরুষের ক্ষেত্রেও ওলি না থাকলে প্রতিবেশী অন্যান্যদের উপর অগ্রাধিকার পাবে। (দুর্রুল মুখতার, বাহার)

মাসআলাঃ মহিলা ও শিশুগণ জানাযার নামাযের ওলী হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

মাসআলাঃ জানাযার নামাযে তিন কাতার করা উত্তম। হাদীছ শরীফ বর্ণিত আছে–যার নামায তিন কাতারে পড়া হবে, ওর মাগফিরাত হয়ে যাবে। যদি সর্বমোট সাতজন হয়ে থাকে, তাহলে একজন ইমাম হবে তিনজন প্রথম কাতারে, দুজন দ্বিতীয় কাতারে এবং একজন তৃতীয় কাতারে দাঁড়াবে।

(গুণীয়া বাহার)

মাসআলাঃ ইমাম মৃত ব্যক্তির বুকের সামনে দাড়ানো মুস্তাহাব। মৃত ব্যক্তি থেকে দুরে না হওয়া চায়।

মাসআলাঃ মসজিদে জানাযার নামায যে কোন অবস্থায় মকরূহ তাহরীমী, লাশ মসজিদের ভিতরে হোক বা বাহিরে অথবা সব নামাযী মসজিদের ভিতরে হোক বা কিছু অংশ (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ জুমার দিন কেউ মারা গেলে, জুমার আগে কাফন দাফন করে

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফেলতে পারলে, করে ফেলা চায়। জুমার পর বেশী লোক হবে, এ ধারনায় রেখে দেয়াটা মকরূহ। (রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তিকে যদি নামায না পড়ে দাফন করা হয় ও মাটি চাপা ও দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে ওর কবরের উপর নামায পড়বে। যদি ফেটে যাওয়ার সন্দেহ না হয়, আর যদি মাটি না দিয়ে থাকে, তাহলে বের করে নামায পড়ার পর দাফন করবে। (রদ্দুল মুহতার, দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ মুসলমানের শিশু বা মুসলমান মহিলার শিশু জীবিত জন্ম হওয়ার পর মারা গেলে, ওকে গোসল ও কাফন দেয়া হবে এবং নামায পড়বে আর যদি মৃত জন্ম হয়, তাহলে এমনি গোসল করায়ে পবিত্র কাপড়ে জড়ায়ে দাফন করে ফেলবে। ওর জন্য নামায ও সুন্নাত তরীকা মত গোসল ও কাফনের প্রয়োজন নেই।

মাসআলাঃ যে শিশু মাথা বের করে জন্ম হলো এবং বুক বের হওয়া পর্যন্ত জীবিত ছিল অতপর মারা গেল, তাহলে ওকে জীবিত জন্ম হয়েছে বলে ধরা হবে, আর যে পা বের করে জন্ম হলো এবং কোমর বের হওয়া পর্যন্ত জীবিত ছিল অতপর মারা গেল, তাহলে ওকেও জীবিত ধরা হবে। যদি উল্লেখিত পরিমাণ বের হবার আগে মারা যায়, যদিওবা ক্রন্দন করে থাকে, মৃত জন্ম হয়েছে বলে ধরা হবে। (দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ শিশু জীবিত জন্ম হোক বা মৃত, পূর্ণাঙ্গ হোক,অপূর্ণাঙ্গ যে কোন অবস্থায় ওর নাম রাখতে হবে, কিয়ামত দিবসে ওর হাশর হবে।

(দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার ও বাহার)

মাসআলাঃ বিধর্মীনী থেকে মুসলমানের শিশু জন্ম হলো এবং সে ওর বিবাহিত ছিল না অর্থাৎ শিশুটা অবৈধ, ওর নামায পড়া হবে। (রর্দুল মুহতার)

কবর ও কাফনের বর্ণনা

মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা ফরযে কেফায়া

মাসআলাঃ কবরের দৈর্ঘ মৃত ব্যক্তির দেহ বরাবর প্রস্থে অর্ধ দেহ পরিমাণ এবং গভীরতায় কমপক্ষে অর্ধদেহ পরিমাণ হওয়া চায়। দেহ পরিমান গভীরতা হওয়াটা উত্তম এবং বুক বরাবর হওয়াটা হচ্ছে মধ্যম পর্যায়ের (রদ্দুল মুহতার) এ গভীরতা বলতে লহদ বা সিন্দুকের গভীরতা বুঝতে হবে,এমন নয় যে যেখান থেকে খনন শুরু হয়েছে ওখান থেকে শেষ পর্যন্ত ধরা হবে।

মাসআলাঃ কবর দু রকম হয়ে থাকে--এক লহদ (বোগলী) যা কবরের ভিতর

অংশ কিবলার পাশেরটা লাশ রাখার জন্য খনন করা হয়। অন্যটি সিন্দুক কবর, যেটা কুপের মত খনন করা হয়। এর মধ্যে লাশ রেখে তক্তা দেয়া হয়। লহদ আকৃতি সুন্নাত। এ রকম খনন করা না গেলে সন্দুক আকৃতিতে খনন করা হলে কোন ক্ষতি নেই। (আলমগীরী, বাহারে রায়েক, কাযী খান)

মাসআলাঃ কবরের ওই অংশ যেটা মৃত ব্যক্তির শরীরের নিকটতর, সেথায় পাকা ইট ব্যবহার করা মকরূহ। (আলমগীরী ও কাযী খান)

মাসআলাঃ কবরে মাদুর ইত্যাদি বিছানো নাজায়েয। কারণ অনর্থক সম্পদের অপচয় বুঝায়। (দুর্রুল মুখতার, বাহার)

মাসআলাঃ কবরে দুই তিন বা যত লোকের প্রয়োজন হয়, অবতরণ করতে পারবে। তবে এ সব লোক নেককার ও আমানতদার হওয়া চাই, যেন অপছন্দনীয় কিছু দেখলে, লোকদের কাছে প্রকাশ না করে এবং ভাল কিছু দেখলে প্রকাশ করে। (আলমগীরী ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ জানাযা কবরের কিবলার দিকে রাখা মুস্তাহাব, যেন লাশ কিবলার দিক থেকে কবরে নামানো যায়। এ রকম ঠিক নয় যে কবরের পায়ের দিকে রাখলো এবং মাথার দিক থেকে কবরে নামানো হলো (দুর্রুল মুখতার, আলমগীরী, ফতহুল কাদীর)

মাসআলাঃ মহিলার লাশ কবরে নামানোকারীগণ মহিলার মুহরেম হওয়া চাই। যদি এ রকম কেউ না থাকে, অন্য আত্মীয়গণ নামাবে। এ রকম আত্মীয়স্বজনও না থাকলে, পরহিজগার পরপুরুষ অবতরন করালে কোন দোষ নেই।

(আলমগীরী)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় যেন এ দুআটি পড়া হয়ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

(দুর্রুল মুখতার, আলমগীরী)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তিকে কবরে ডান পাশ করে শোয়াবে এবং মুখটা কিবলার দিকে করে দিবে। যদি মুখ কিবলার দিকে করার কথা ভুলে গেল। তক্তা লাগানোর পর স্মরণ হলো, তাহলে তক্তা সরায়ে কিবলা মুখী করে দিবে। যদি মাটি দেয়ার পর স্মরণ হয়, তাহলে তখন আর করা যাবে না। অনুরূপ যদি বাম পাশ করে রাখা হয় অথবা যে দিক মাথা হওয়ার ছিল, সেদিকে পা হয়েছে, তাহলে মাটি দেয়ার আগে স্মরণ হলে ঠিক করে দিবে,অন্যথায় নয়।

(আলমগীরী দুর্রুল মুখতার রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ কবরে রাখার পর কাফনের বাধন খুলে দিবে, কারণ এখন আর এর

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রয়োজন নেই। তবে না খুললেও কোন ক্ষতি নেই। (জাওহেরা বাহার)

মাসআলাঃ লাশ লহদে রাখার পর কাঁচা ইটের দ্বারা বন্ধ করে দিবে আর মাটি যদি নরম হয় তাহলে পাকা ইট ব্যবহারও জায়েয। তক্তাসমুহের মাঝখানে ফাঁক রয়ে গেলে টিল ইত্যাদি দ্বারা বন্ধ করে দিবে। সন্দুক কবরেরও একই হুকুম (দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার, বাহার)

মাসআলাঃ মহিলার লাশ হলে, কবরে নামানো থেকে তক্তা লাগানো পর্যন্ত কবরকে কাপড় ইত্যাদি দ্বারা আড়াল করে রাখবে। কিন্তু পুরুষের লাশ দাফন করার সময় আড়াল করবে না। অবশ্য বৃষ্টি ইত্যাদি কোন অজুহাত থাকলে ঢাকা জায়েয। মহিলার জানাযাও ঢেকে রাখবে। (জাওহেরা, দুর্রুল মুখতার বাহার)

মাসআলাঃ তক্তা ফিট করার পর মাটি দেয়া হবে। মুস্তাহাব হচ্ছে, মাথার দিকে উভয় হাতে তিনবার মাটি ফেলা। প্রথমবার مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ দ্বিতীয় বার وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ তৃতীয় বার وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى বলবে। অতপর টুকরী ইত্যাদি যেটার দ্বারা সম্ভব, বাদ বাকী মাটিগুলো কবরে ফেলে দিবে। তবে যতটুকু মাটি কবর থেকে বের করা হয়েছে এর অধিক ফেলা মকরূহ।

(আলমগীরী, জাওহেরা আয়না)

মাসআলাঃ হাতে যে মাটি লাগবে, সেটা ঝেড়ে ফেলা বা ধুইয়ে ফেলার ইখতিয়ার রয়েছে। (বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ কবরকে খাড়া করবে না এবং উটের পিটের মত ঢালু রাখবে। কবরে পানি ছিটকা দিলে কোন ক্ষতি নেই বরং ভাল। কবর এক বিগাত বা এর থেকে সামান্য উঁচু হবে। (আলমগীরী রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ জাহাজে কেউ মারা গেল এবং কুলও কাছে নয়, তখন গোসল কাফন দিয়ে ও নামায পড়ে সমুদ্রে ডুবায়ে দিবে। (গুণীয়া, রর্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ উলামায়ে কিরাম ও সৈয়্যদ বংশীয়দের কবরের উপর গম্বুজ ইত্যাদি তৈরী করলে, কোন ক্ষতি নেই। তবে কবরকে যেন পাকা করা না হয়।

(দুর্রুল মুখতার, রর্দুল মুহতার)

অর্থাৎ ভিতরে পাকা করা যাবে না। তবে ভিতরে কাঁচা ও উপরে পাকা হলে কোন ক্ষতি নেই। (বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ প্রয়োজনবোধে কবরের নিদর্শনের জন্য কিছু লিখা যাবে। তবে এমন জায়গায় লিখবে না যেথায় অবমাননা হবে। (জাওয়াহেরা, দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ এমন কবরস্থানে দাফন করা উত্তম, যেখানে নেকবান্দাদের কবর রয়েছে।

মাসআলাঃ দাফনের পর কবর পাড়ে সুরা বাকরার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়া মুস্তাহাব। মাথার দিক الٓمّٓ থেকে مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে সুরার শেষ পর্যন্ত পড়বে।

(জাওহেরা, বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ কবরের উপর বসা, শোয়া, হাঁটা, পায়খানা, প্রস্রাব করা হারাম। কবরস্থানের মধ্যে দিয়ে নতুন রাস্তা তৈরী করা হলে, সেটা দিয়ে চলাফেরা নাজায়েয। নয়া রাস্তা হওয়াটা ওর জানা থাকুক বা ধারণা হোক।

(আলমগীরী, দুর্রুল মুখতার, বাহার)

মাসআলাঃ নিজের কোন আত্মীয়ের কবরের কাছে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু অন্যদের কবরের উপর দিয়ে যেতে হবে, তাহলে ওখান পর্যন্ত যাওয়া নিষেধ। দুর থেকে যিয়ারত করবে। কবরস্থানে জুতা পরে না যাওয়া চায়। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে জুতা পরিহিত দেখে ফরমায়েছিলেন, জুতা খুলে ফেল, যেন তুমি কবরবাসীদেরকে আর ওরা তোমাকে কষ্ট না দেয়। (বাহারে শরীয়ত)

কবর যিয়ারত

কবর যিয়ারত করা সুন্নাত। প্রতি সপ্তাহে একদিন যিয়ারত করা চায়। শুক্র, বৃহস্পতি, শনি ও সোমবার, যিয়ারত করা উত্তম। সবচে উত্তম হচ্ছে জুমার দিন সকাল বেলা। আওলীয়া কিরামের মাযারসমুহে সফর করে যাওয়া জায়েয। আওলীয়া কিরাম তাঁদের যিয়ারতকারীদের উপকার করেন। যদি ওখানে শরীয়ত বিরোধী কোন কার্জকর্ম হয়েও থাকে যেমন মহিলাদের সমাগম, গানবাজনা ইত্যাদি তবুও যিয়ারত বাদ দেয়া না চায়। কারন এ ধরণের কাজের ফলে নেককাজ বাদ দেয়া যায় না। বরং ওটাকে নিন্দা করবে এবং পারলে এসব গর্হিত কাজ দমন করবে। (রদ্দুল মুহতার ও বাহার)

মাসআলাঃ মহিলাদেরকে কবর যিয়ারত থেকে বাধা দানের মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। (ফত্ওয়ায়ে রেজভীয়া, বাহার)

pdf By Syed Mostafa Sakib

কবর যিয়ারতের নিয়ম

পায়ের দিক থেকে গিয়ে মৃত ব্যক্তির মুখের সামনে দাঁড়াবে এবং এ দুআটি পড়বেঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَاِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ نَسْئَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَاخِرِيْنَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْاَرْوَاحِ الْفَانِيَةِ وَالْاَجْسَادِ الْبَالِيَةِ وَالْعِظَامِ النَّخِرَةِ اَدْخِلْ هٰذِهِ الْقُبُوْرَ مِنْكَ رَوْحًا وَّرَيْحَانًا وَّمِنَّا تَحِيَّةً وَّسَلَامًا.

এরপর সূরা ফাতেহা পাঠ করবে এবং বসতে চাইলে এতটুকু দূরত্বে বসবে, যে পরিমাণ দূরুত্বে ওনার জিন্দেগীতে ওনার পাশে বসা হতো। (রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তির মাথার দিক দিয়ে আসবে না। সেটা মৃত ব্যক্তির কষ্টের কারণ হয়ে দাড়ায় । কারণ তখন মৃত ব্যক্তিকে ঘাড় ফিরায়ে দেখতে হয়। (রদ্দুল মুহতার ও বাহার)

মাসআলাঃ কবরস্থানে গেলে আলহামদু শরীফ, الٓمٓ থেকে مفلحون পর্যন্ত আয়াতুল কুরসী اٰمَنَ الرَّسُوْلُ শেষ পর্যন্ত, সূরা ইয়াসীন এবং সূরা তাকাছুর এক এক বার এবং সূরা ইখলাছ বার অথবা এগার অথবা সাত বা তিন বার পাঠ করবে এবং এ সবের ছওয়াব মৃতদেরকে পৌছাবে। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে–যে এগার বার সূরা ইখলাছ পড়ে এর ছওয়াব মৃতদেরকে পৌছাবে, তাহলে সে মৃতদের সংখ্যা বরাবর ছওয়াব লাভ করবে।

(দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার বাহার)

ঈসালে ছওয়াব

নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, ছদকা, খায়রাত এবং সব রকমের ইবাদত, নেক আমল, ফরয ও নফলের ছওয়ার মৃতদেরকে পৌছানো যায়। ওদের সবার কাছে পৌছবে এবং পৌছানোকারীদের ছওয়াবের মধ্যে কোন কমতি হবে না। খোদার রহমতে এটা আশা করা যায় যে সবার পূর্ণ ছওয়াব অর্জিত হবে। এ রকম নয় যে সেই ছওয়াব ভাগাভাগি হয়ে টুকরা টুকরা লাভ করবে। (শরহে আকাইদ,

হেদায়া আলমগীরী রদ্দুল মুহতার) বরং আশা করা যায় যে সেই ছওয়াব পৌছানোকারীগণ ওসব ছওয়াব প্রাপ্ত মৃতদের সমষ্টির বরাবর পাবে। যেমন কেউ কোন নেক কাজ করলো যার ছওয়াব হলো কমপক্ষে দশ। সে এর ছওয়াব দশজন মৃত ব্যক্তিকে পৌছালো, তাহলে প্রত্যেকে দশ দশ লাভ করবে এবং পৌছানোকারী একশদশ লাভ করবে এবং একহাজারকে পৌছালে দশ হাজার লাভ করবে। এভাবে যত বেশীজনকে পৌছাবে ততবেশী লাভ করবে।

(ফত্ওয়ায়ে রেজভীয়া)

মাসআলাঃ কবর চুমু দেয়া এবং এর তাওয়াফ করা নিষেধ। (বাহারে শরীয়ত আশআতুল লোমআত)

মাসআলাঃ কবরে ফুর দেয়া ভাল কাজ। এ ফুল যতক্ষণ তাজা থাকবে ততক্ষণ তসবীহ পাঠ করবে এবং মৃত ব্যক্তির আত্মা তৃপ্তিবোধ করবে। (রদ্দুল মুহতার, বাহার) এরকম জানাযার উপর ফুলের মালা দিলে কোন ক্ষতি নেই।

(বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ কবরের উপর থেকে তাজা ঘাস উঠায়ে ফেলা অনুচিত কারণ ঘাসের তসবীহ দ্বারা রহমত অবতীর্ণ হয় এবং কবরবাসীর আরামবোধ হয় আর ঘাস উঠায়ে ফেলার দ্বারা মৃত ব্যক্তির হক বিনষ্ট করা হয়।

(রদ্দুল মুহতার ও বাহার)

মাসআলাঃ আওলিয়া ও উলামায়ে কিরামের মাযারের উপর গিলাফ দেয়া জায়েয, যদি এ উদ্দেশ্য হয় যে মাযারবাসীদের মর্তবা সাধারণ লোকদের সামনে প্রকাশ হোক এবং লোকেরা সম্মান করুক ও বরকত হাছিল করুক।

(রদ্দুল মুহতার)

শোক প্রকাশ

শোক প্রকাশ করা সুন্নাত। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, যে স্বীয় মুসলমান ভাই এর মছীবতে সমবেদনা জ্ঞাপন করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা ওকে কেরামতি স্যুট পরিধান করাবেন। (ইবনে মায়া) অন্য আর এক হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, যে কোন মুসিবত গ্রস্ত ব্যক্তির সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, সে সেটার বরাবর ছওয়াব লাভ করবে। তিরমিযী, ইবনে মাজা)

মাসআলাঃ শোক প্রকাশের সময় এটা বলবে–আল্লাহ তাআলা মরহুমকে ক্ষমা করুক তাঁকে স্বীয় রহমতের মধ্যে আবৃত করুক এবং আপনাকে ধৈর্যদান করুক এবং এ মুসিবতের জন্য ছওয়াব দান করুক। হুযুর (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওয়াআলিহি, ওয়াসাল্লাম) এ শব্দসমূহ দ্বারা শোক প্রকাশ করতেন–

لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَاَعْطٰى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِاَجَلٍ مُّسَمًّى

(আল্লাহর জন্যই, যেটা তিনি নিয়েছে এবং দিয়েছে। তাঁর কাছে প্রত্যেক কিছুর একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ মুস্তাহাব হচ্ছে, মৃতব্যক্তির পরিবার পরিজনের বড় ছোট নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা। তবে মহিলাদেরকে ওদের মুহরেমগণই সমবেদনা জ্ঞাপন করবে। (আলমগীরী বাহার)

মাসআলাঃ শোক প্রকাশের সময় হচ্ছে, মৃত্যুর পর থেকে তিন দিন পর্যন্ত। এরপর মকরূহ। কারণ এটা বেদনাকে সতেজ করে। কিন্তু শোক প্রকাশকারী বা যার কাছে শোক প্রকাশ করা হবে, সে যদি উপস্থিত না থাকে বা সে জানতো না, তাহলে পরে প্রকাশ করলেও কোন ক্ষতি নেই। (জাওহেরা, রুদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ কবরস্থানে শোক প্রকাশ করা বিদআত। (রুদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ দাফনের আগেও শোক প্রকাশ জায়েয কিন্তু দাফনের পরে প্রকাশ করাটা আফজল। কিন্তু মৃতব্যক্তির পরিবার পরিজন যদি অধৈর্য হয়ে কান্নাকাটি করে তাহলে দাফনের আগেও ওদেরকে সান্তনা দেয়া যায়। (জাওহেরা)

মাসআলাঃ যে একবার সমবেদনা জ্ঞাপন করে এসেছে, ওর দ্বিতীয় বার সমবেদনা জ্ঞাপন করার জন্য যাওয়াটা মকরূহ। (দুরুল মুখতার)

মাসআলাঃ মৃতব্যক্তির পরিবার পরিজন কর্তৃক কুলখানী, চেহলাম ইত্যাদিতে কাউকে দাওয়াত করা নাজায়েয এবং খুবই মন্দ বিদআত। শরীয়তে দাওয়াত হচ্ছে খুশীর সময়, শোকের সময় নয়। অবশ্য গরীব ও অভাবীদেরকে খাওয়াতে পারলে ভাল। (ফতহুল কদীর)

মাসআলাঃ কুলখানী ইত্যাদির খাবার পরিবেশন মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে করা নাজায়েয। অবশ্য সম্পদ বন্টন হয়ে যাওয়ার পর যে ইচ্ছে করে সে স্বীয় অংশ থেকে করতে পারে। (খানীয়া ইত্যাদি)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তির প্রতিবেশী বা দুর সম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজন কর্তৃক সেই দিন ও সেই রাত মৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজনের জন্য খাবার আনা ও জোর করে খাওয়ানো উত্তম।

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তির পবিরার পরিজনের জন্য যে খাবার পাঠানো হয়,সেটা কেবল ওদেরই খাওয়া উচিত এবং ওদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাঠানো অনুচিত; অন্যান্যদের সেই খাবার খাওয়াটা নিষেধ (কাশফুল গেতা ও বাহারে শরীয়ত) প্রথম দিনই খাবার পাঠানো সুন্নাত, এর পর মকরূহ।

(আলমগীরী ও বাহার)

বিলাপ করা

বিলাপ করা অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিদের অতিরিক্ত গুণকীর্তন করে উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। অনুরূপ 'হায় মুসিবত হায় মুসিবত' বলে চিৎকার করাও হারাম। (জাওহেরা নায়ারা)

মাসআলাঃ কাপড় ছেঁড়া, মুখে আছড় দেয়া, চুল খুলে ফেলা, মাথা চাপড়ানো, বুকে ও রানে হস্তাঘাত করা ইত্যাদি মূর্খদের কাজ ও হারাম। (আলমগীরী) হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, যে মুখে আঘাত করে, জামার কলার ছিঁড়ে জাহেলিয়াত যুগের চিৎকারের মত চিৎকার করে অর্থাৎ বিলাপ করে, সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়। (বুখারী ও মুসলিম) অন্য একটি হাদীছে বর্ণিত আছে, যে মাথা মুন্ডায়ে ফেলে, বিলাপ করে এবং কাপড় ছিঁড়ে, আমি ওর থেকে আলাদা।

মাসআলাঃ আওয়াজ করে কান্নাকাটি করা নিষেধ। যদি আওয়াজ বের না হয়, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। এ রকম কান্না রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত আছে যে সাহেব জাদা (রাদিআল্লাহ তাআলা আনহু) এর ইন্তেকালে হুযুরের চোখের পানি বের হয়েছিল এবং ফরমায়েছিলেন চোখের পানি ও মনের দুঃখের উপর আল্লাহ তাআলা শাস্তি দিবেন না। অবশ্য মুখের কারণে আজাব বা রহম প্রদান করেন আর ক্রন্দনকারীদের কারনে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয়। মৃত ব্যক্তিও ক্রন্দন করে।

(বুখারী মুসলিম)

তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ জায়েয নেই। কিন্তু মহিলা স্বামীর মৃত্যুতে যেন চার মাস দশদিন শোক প্রকাশ করে। (বুখারী, মুসলিম)

মাসআলাঃ মুসিবতের সময় যে ছবর করে, সে দু ছওয়াব লাভ করে–এক, মুসিবতের এবং দুই ছবরের আর কান্নাকাটি করার দ্বারা উভয়টা বাদ পড়ে যায়। (রুদ্দুল মুহতার) হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, যে মুসলমান পুরুষ বা মহিলার উপর কোন মুসিবত আসলো, সেটা স্মরণ করে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ - বলে যদিওবা মুসিবতের সময়কাল অতিবাহিত হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলা এর জন্য নতুন ছওয়াব দান করেন এবং এ রকম ছওয়াব দান করেন যেমন ওই দিনের মত, যে দিন মুসিবত এসেছিল।

(আহমদ ও বায়হাকী)

শহীদের বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান–

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ۚ بَلْ اَحْيَاءٌ

pdf By Syed Mostafa Sakib

وَلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ○

(যারা আল্লাহর রাস্তায় কতল হয়ে যায় ওদেরকে মৃত বল না বরং ওরা জীবিত কিন্তু তোমরা অবহিত নও।)

আর এক জায়গায় ইরশাদ করেছেন–

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا ..... اِلٰى اَجْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

(যারা আল্লাহর রাস্তায় কতল হয়ে যায়, ওদেরকে কখনো মৃত মনে কর না, বরং তারা স্বীয় সৃষ্টিকর্তার কাছে জীবিত এবং রিযিক পায়। আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে ওদেরকে যা দিয়েছেন, তারা এতে সন্তুষ্ট এবং পরবর্তী লোকেরা, যারা এখনও ওদের সাথে মিলেনি, ওদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে। ওদের কোন ভয় নেই এবং কোন দুঃখ নেই। আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে। আর আল্লাহ ঈমানদারদের কর্মফল বিনষ্ট করেন না।). শহীদের ফজীলত সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত আছে।

মাসআলাঃ শহীদকে গোসল দেয়া হবে না, ওর রক্তও ধৌত করা হবে না এবং কাফনও পরিধান করানো হবে না বরং ওই অবস্থায় জানাযার নামায পড়ে দাফন করা হবে। অবশ্য সুন্নাত কাফনের পরিমাণ থেকে কিছু কম হলে তা পূরন করে দেয়া হবে এবং পায়জামা খোলা যাবেনা। কিন্তু অতিরিক্ত কাপড় যা কাফনের পরিপূরক নয়, যেমন রুই এর কাপড়, চর্মপোষাক হাত মৌজা যুদ্ধাস্ত্র, ঢাল ইত্যাদি খুলে ফেলা যাবে। (হেদায়া ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ শহীদকে গোসল না দেয়ার সাতটি শর্ত রয়েছে। যদি এর মধ্যে কোন একটি পাওয়া না যায়, তাহলে গোসল দিতে হবে, শর্তগুলো হচ্ছে (১) মুসলমান হওয়া (২) বিবেকবান (৩) প্রাপ্ত বয়স্ক ও (৪) পবিত্র হওয়া এবং (৫) জুলুম পূর্বক তলোয়ার বা অন্যান্য মরণাস্ত্র দ্বারা কতল হওয়া (৬) ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা (৭) আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পর দুনিয়াবী কোন ফল ভোগ না করা।

বিঃ দ্রঃ দুনিয়াতে যেহেতু শহীদের এ কদর ও সম্মান যে ওদের রক্ত পাক, শরীর পাক ও ওদের শরীরের কাপড়ই কাফন, সেহেতু পরকালে ওদের মর্যাদা ও পুরস্কারের বিষয় প্রশ্নাতীত।

মাসআলাঃ কাউকে চোর ডাকাত, বিধর্মী বা স্বপক্ষ ত্যাগী হত্যা করলো, এবং তা অস্ত্রের সাহায্যে হোক বা অন্য কোন কিছুর দ্বারা হোক, সে শহীদ হিসেবে গণ্য হবে এবং ওর গোসল দেয়া হবে না। (হেদায়া রদ্দুল মুহতার ও অন্যান্য কিতাব) সে যদি দুনিয়াবী ফায়দা উঠায়ে থাকে অর্থাৎ আহত হওয়ার পর কিছু পানাহার করলো বা বিশ্রাম করলো অথবা চিকিৎসা করালো বা ক্যাম্পে অবস্থান করলো বা নামাযের একটি ওয়াক্ত পূর্ণ জ্ঞান থাকা অবস্থায় অতিবাহিত করলো

এবং নামায আদায়ে সামর্থবান ছিল বা ওখান থেকে অন্য জায়গায় চলে গেল অথবা লোকেরা ওকে উঠায়ে অন্য জায়গায় নিয়ে গেল, (জীবিত পৌছা হোক বা রাস্তায় মারা যাক) বা দুনিয়াবী কোন বিষয়ে ওসীয়ত করলো বা কিছু বেচা কেনা করল বা অনেক কথা বললো, তাহলে এসব অবস্থায় গোসল দেয়া হবে। তবে শর্ত হলো যে এসব বিষয় যদি যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পরে ঘটে থাকে। কিন্তু যুদ্ধের মাঝখানে হলে এসব বিষয় শাহাদতের প্রতিবন্ধক নয় অর্থাৎ তখন গোসল দেয়া হবে না।

মাসআলাঃ যদি কোন মুসলমান কোন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে অনর্থক মেরে ফেলে, তাহলে সে শহীদ হিসেবে গণ্য, ওর গোসল দেয়া হবে না।

মাসআলাঃ নিজের জানমাল বা কোন মুসলমানকে বাঁচানোর জন্য সংগ্রাম করে মারা গেলো সেও শহীদ (অর্থাৎ ওর গোসল দেয়া হবে না।) লোহা পাথর কাঠ যে কোন জিনিষ দ্বারা মারা হোকনা কেন, শহীদ হিসেবে গণ্য হবে।

(আলমগীরী।

মাসআলাঃ শহীদের সমস্ত কাপড় খুলে নতুন কাপড় দেয়া মকরূহ।

(রদ্দুল মুহতার, আলমগীরী)

রোযা

রোযাও নামাযের মত ফরযে আইন। এর ফরয হওয়ার অস্বীকারকারী কাফির। এবং বিনা কারণে রোযা বর্জনকারী মারাত্মক গুনাহগার ও দোযখের উপযোগী। যেসব শিশু রোযা রাখতে পারে, ওদেরকে রোযা রাখানো চায় এবং শক্ত সামর্থ ছেলে মেয়েদেরকে প্রয়োজনে পিঠায়ে* রোযা রাখানো চায় (দুর্রুল মুখতার) রমাযানের পূর্ণ এক মাস রোযা ফরয। শরীয়তের পরিভাষায় রোযা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের নিয়তে ছুবহে ছাদেক থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও সহবাস থেকে নিজেকে বিরত রাখা। রোযার জন্য মহিলার হায়েয নিফাস থেকে মুক্ত হওয়া শর্ত অর্থাৎ হায়েয নিফাস অবস্থায় রোযা শুদ্ধ নয়। হায়েয নিফাস ওয়ালী মহিলার উপর ফরয হচ্ছে পবিত্র হওয়ার পর অন্য সময়ে ওসব দিনের রোযা কাযা আদায় করা। নাবালেগের উপর রোযা ফরয নয়। পাগলের উপরও রোযা ফরয হবে না, যদি পূর্ণ রমাযান মাস পাগল অবস্থায় অতিবাহিত হয়ে যায়। যদি মাসের কোন একদিনও এমন সময়ে জ্ঞান ফিরে আসে যে সেই সময়টা রোযার নিয়তের সময়, তাহলে পূর্ণ মাসের কাযা অপরিহার্য। যেমন রমাযানের শুরুতে পাগল হলো এবং উনত্রিশ তারিখের ছুবহে ছাদেক থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সময়ের কোন মূহুর্তে স্বজ্ঞান হলো, তাহলে পূর্ণ রমাযানের কাযা অপরিহার্য হলো (রদ্দুল মুহতার)

☆ নামায রোযায় পিঠানোর যে হুকুম এর দ্বারা তিন থাপ্পর কে বুঝানো হয়, লাঠি বা ডাণ্ডা দিয়ে পিটানো নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ রমাযানের রোযা, নির্দিষ্ট নযর, নফল, সুন্নাত, মুস্তাহাব ও মকরূহ রোযাসমূহের নিয়তের সময় হচ্ছে সূর্যাস্ত থেকে শরয়ী অর্ধদিসব পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে নিয়ত করে নিলে এ সব রোযা হয়ে যাবে। তবে রাত্রেই নিয়ত করে নেয়াটা উত্তম। এ ছয় প্রকার রোযাসমূহ ব্যতীত অন্য যত প্রকার রোযা আছে যেমন রমাযানের কাযা রোযা, অনির্দিষ্ট নযরের রোযা, নফলের কাযা রোযা, নির্দিষ্ট নফলের কাযা রোযা, কাফফারার রোযা, জানাবতের রোযা এবং তামাত্তোর রোযার নিয়তের সময় হচ্ছে সূর্যাস্তের পর থেকে সুবাহ ছাদেক শুরু হওয়া পর্যন্ত, এর পরে নয় এবং এগুলোর মধ্যে যে রোযা রাখা হবে, সেটার নির্দিষ্ট নিয়তও প্রয়াজন। এ রকম যেন নিয়ত করে যে কাল আমি আমার ২৮শে রমাযানের কাযা রোযা রাখবো বা আমি যে একদিনের রোযা মানত করেছিলাম কাল সেই রোযা রাখবো। এভাবে যে রোযা রাখা হবে, সেটার নিয়তে নির্দিষ্ট করে নিবে। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ রোযার নিয়ত শরয়ী অর্ধদিবস শুরু হওয়ায় আগেই হওয়া চায়। এবং যদি ঠিক সেই সময় অর্থাৎ যে সময় সূর্য শরয়ী অর্ধ দিবসের সীমানায় পৌছে গেল; তখন নিয়ত করলে রোযা হবে না। (দুর্রুল মুখতার বাহার)

মাসআলাঃ যে রকম অন্যান্য ইবাদতসমূহের বেলায় বলা হয়েছে যে মনে মনে উদ্দেশ্যে করার নামই নিয়ত মুখে বলার প্রয়োজন নেই, সে রকম রোযার বেলায়ও একই হুকুম। অবশ্য মুখে বলাটা উত্তম। যদি রাত্রে নিয়ত করে, তাহলে এরকম বলবে, আমি নিয়ত করলাম আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে আজ রমাযানের ফরয রোযা রাখবো (জাওহেরা বাহার)

মাসআলাঃ দিনে নিয়ত করলে, এ রকম নিয়ত করা প্রয়োজন–আমি সুবহে সাদেক থেকে রোযাদার আর যদি এরকম নিয়ত করে আমি এখন থেকে রোযাদার, ভোর থেকে নয়, তাহলে রোযা হবে না।

(জাওহেরা রদ্দুল মুহতার বাহা)

মাসআলাঃ ৩০শে শাবানের ব্যাপারে যদি এটা সন্দেহ হয় যে এটা ১লা রমাযান, নাকি ৩০শে শাবান, তাহলে ওই দিন খালেছ নফলের নিয়তে রোযা রাখা যায়। কিন্তু এ রকম নিয়ত দ্বারা হবে না যে যদি রমাযান প্রমানিত হয়, তাহলে রমাযানের রোযা, অন্যথায় নফল। এ রকম নিয়তে রোযা রাখা মকরূহ তাহরীমী। তবে যদি এ রকম ৩০ তারিখ ওর নির্ধারিত দিনে পতিত হয়, তাহলে রোযা রাখাটাই উত্তম। যেমন কোন ব্যক্তি সব সময় বৃহস্পতিবার রোযা থাকে এবং সেই ৩০শে শাবানও বৃহস্পতিবার হলো, তাহলে সে স্বীয় নফল রোযা রাখবে। (দুর্রুল মুখতার রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ সন্দেহের দিন শরয়ী অর্ধদিবসের আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যদি ও সময়ে চাঁদ দেখাটা প্রমাণিত হয়ে যায়, তাহলে রমাযানের রোযার নিয়ত করে নিবে, অন্যথায় পানাহার করবে। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ শাবানের শেষে এক বা দু'দিনের রোযা মকরূহ; তিন বা তিন দিনের অধিক মকরূহ নয়।

মাসআলাঃ ঈদের দিনের রোযা মকরূহ তাহরীমী এবং অনুরূপ ঈদুল আযহার দিন ও এরপর এগার বার ও তের তারিখ পর্যন্ত রোযা রাখা মকরূহ তাহরীমী।

মাসআলাঃ সুন্নাত ও নফল রোযা একটি রাখা মকরূহ তনযীহী যেমন মহরমের দশ তারিখের রোযা সুন্নাত কিন্তু একটি রোযা রাখা মকরূহ। এর সাথে আরও একটি মিলায়ে রাখা চায় অর্থাৎ নয় ও দশ তারিখ রাখবে। দশ ও এগার তারিখ রাখলেও কোন ক্ষতি নেই।

মাসআলাঃ স্বামীর বিনা অনুমতিতে মহিলার নফল রোযা রাখা মকরূহ তনযীহী।

মাসআলাঃ যদি রোযা রাখার মানত করা হয়, তাহলে কাজ সাধিত হলে সেই রোযা রাখাটা ওয়াজিব।

মাসআলাঃ নফল রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেললে, এর কাযা ওয়াজিব।

চাঁদ দেখার বর্ণনা

রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) ফরমায়েছেন চাঁদ দেখে রোযা রাখা শুরু কর এবং চাঁদ দেখে ইফতার (ঈদ) কর এবং যদি মেঘলা হয়, তাহলে শাবানের হিসাব ত্রিশ পূর্ণ করে নাও (বুখারী ও মুসলিম) আরও ফরমায়েছেন রোযা রেখো না, যতক্ষণ চাঁদ দেখ না এবং ইফতার (ঈদ) করোনা যতক্ষণ চাঁদ দেখ না এবং যদি মেঘলা হয়, তাহলে কোটা পূর্ণ করে নাও (অর্থাৎ ত্রিশ দিন পূর্ণ কর) বুখারী মুসলিম)

মাসআলাঃ পাঁচটি মাসের চাঁদ দেখা ওয়াজিবে কেফায়া–শাবান, রমাযান শাওয়াল, জিল্‌কদ ও জিলহজ্ব (ফত্‌ওয়ারে রেজভীয়া)

মাসআলাঃ শায়ানের উনত্রিশ তারিখ সন্ধ্যায় যেন চাঁদ দেখা হয়। চাঁদ দেখা গেলে পর দিন রোযা রাখবে অন্যথায় শাবানের ত্রিশ দিন পূর্ণ করে যেন রমাযানের মাস শুরু করে। (হেদায়া, আলমগীরী ও বাহার)

মাসআলাঃ চাঁদ উদয়ের স্থান পরিস্কার না থাকা অবস্থায় অর্থাৎ মেঘ,

pdf By Syed Mostafa Sakib

কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থায় কেবল রমাযানের প্রমাণের জন্য একজন বিবেকবান, বালেগ মসতুর বা আদিল মুসলমানের সাক্ষ্য যথেষ্ট, সে পুরুষ হোক বা মহিলা। রমাযান ব্যতীত অন্যান্য মাসের চাঁদের জন্য দু'জন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য প্রয়োজন, এবং সবাইকে আদিল হতে হবে আর এভাবে বলতে হবে যে আমি নিজেই চাঁদ দেখেছি, তখনই চাঁদ দেখা প্রমানিত হবে। (হেদায়া দুর্রুল মুখতার, বাহার ও অন্যান্য কিতাব)

আদিল হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যে কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে, বার বার ছগীরা গুনাহও করে না, এবং এমন কাজ করে না, যা ভদ্রতার খেলাপ যেমন বাজারে আহার করা। এবং মসতুর হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যার বাহ্যিক চালচলন শরীয়ত সম্মত কিন্তু আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানা নেই।

(দুর্রুল মুখতার রদ্দুল মুহতার, বাহার)

মাসআলাঃ যে আদিল ব্যক্তি রমাযানের চাঁদ দেখে, ওর উপর ওয়াজিব যে সেই রাত্রেই যেন সাক্ষ্য প্রদান করে।

মাসআলাঃ গ্রামে চাঁদ দেখলো এবং ওখানে শরীয়ত মুতাবেক কোন কাযী বা বিচারক নেই, যার কাছে সাক্ষ্য দেয়া যায়, তাহলে গ্রামের লোকদেরকে একত্রিত করে যেন সাক্ষ্য দেয়া হয়। এ সাক্ষ্যদাতা যদি আদিল হয়ে থাকে,তাহলে সকলের উপর রোযা রাখাটা অপরিহার্য।

মাসআলাঃ যখন চাঁদ উদয়ের স্থান পরিষ্কার না হয়, তাহলে ঈদের চাঁদ প্রমাণের জন্য দু'জন বিবেকবান বালেগ আদিল পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য প্রয়োজন। (হেদায়া,দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ যদি উদয়ের স্থান পরিষ্কার হয়, তাহলে অনেক লোক সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত চাঁদ দেখা প্রমাণিত হতে পারে না, (সেটা রমাযানের হোক বা ঈদের অথবা অন্য কোন মাসের হোক) এর জন্য কতজন লোক হওয়া চায়, তা কাযীর রায়ের উপর নির্ভর করে। যতজন লোকের সাক্ষ্য দ্বারা ওর দৃঢ় বিশ্বাস হবে, ততজনের সাক্ষ্য নিয়ে চাঁদ দেখার ঘোষণা দিবে। কিন্তু যদি শহরের বাইর থেকে বা কোন উচু জায়গা থেকে চাঁদ দেখার খবর দেয়া হয়, তাহলে একজন মসতুরের সাক্ষ্যও রমাযানের চাঁদের জন্য গৃহীত হবে। (হেদায়া দুর্রুল, মুখতার, বাহার) আমার মতে চাঁদ দেখার ব্যাপারে লোকদের যে অবজ্ঞা ও উদাসিন্যতার অবস্থা, সে হিসেবে চাঁদ উদয়ের স্থান পরিষ্কার হওয়া অবস্থায়ও ঈদ ব্যতীত অন্যান্য চাঁদের ক্ষেত্রেও অনেক লোকের পরিবর্তে দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য যথেষ্ট হওয়া চায়।

মাসআলাঃ সাক্ষ্য দেয়ার সময় এ রকম বলা প্রয়োজন–'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি।' এ

শব্দ ছাড়া সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। কিন্তু মেঘলা দিনে রমাযানের চাঁদের সাক্ষ্যের ব্যাপারে এতটুকু বললেও যথেষ্ট–'আমি নিজের চোখে এ রমাযানের চাঁদ আজ বা কাল অথবা অমুক দিন দেখেছি।'

মাসআলাঃ কিছু সংখ্যক লোক এসে যদি বলে অমুক জায়গায় চাঁদ দেখা গেছে বা যদি সাক্ষ্য দেয় যে অমুক জায়গায় চাঁদ দেখা গেছে বা এ রকম সাক্ষ্য দেয় যে অমুক অমুক চাঁদ দেখেছে বা যদি এ রকমও সাক্ষ্য দেয় যে অমুক জায়গার কাযী সাহেব লোকদেরকে রোযা বা ইফতারের জন্য বলেছেন, এসব বক্তব্য অপর্যাপ্ত। (দুর্রুল মাখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ কোন শহরে চাঁদ দেখা গেল এবং ওখানকার বিভিন্ন কাফেলা অন্য শহরে আসলো এবং সবাই খবর দিল যে ওখানে অমুক দিন চাঁদ দেখা গেছে এবং সারা শহরে একথাটি প্রচার হয়ে গেছে,ওখানকার লোকেরা চাঁদ দেখার ভিত্তিতে অমুক দিন থেকে রোযা রাখা শুরু করেছে, তাহলে এখানকার লোকদের জন্যও প্রমানিত হয়ে গেল। (রদ্দুল মুহতার ও বাহার)

মাসআলাঃ কেউ একাকী রমাযান বা ঈদের চাঁদ দেখলো এবং সাক্ষ্য দিল, কিন্তু কাযী ওর সাক্ষ্য গ্রহণ করেনি, তাহলে ওর উপর রোযা রাখা ওয়াজিব। যদি না রাখে বা ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে কাযা আবশ্যক।

(হেদায়া, দুর্রুল মুখতার ও আলমগীরী)

মাসআলাঃ যদি দিনে চাঁদ দেখা গেল, দ্বিপ্রহরের আগে হোক বা পরে যে কোন অবস্থায় সেটাকে আগত রাতের চাঁদ মনে করতে হবে। অর্থাৎ এখন যে রাতটা আসবে যেটা থেকে মাস শুরু হবে। যদি ৩০শে রমাযানের দিনে দেখা যায়, তাহলে দিনটা রমাযানেরই, শাওয়ালের নয় এবং রোযা পূর্ণ করা ফরয আর যদি শাবানের ৩০ তারিখের দিন দেখা যায়, তাহলে সেটা শাবানের দিন, রমাযানের নয়, সুতরাং সেই দিনের রোযা ফরয নয়।

(আলমগীরী দুর্রুল মুখতার রদ্দুল মুহতার বাহার)

মাসআলাঃ যদি কোন এক জায়গায় চাঁদ দেখা গেল, তাহলে সেটা কেবল সেই জায়গার জন্য নয় বরং সারা দুনিয়ার জন্য প্রযোজ্য কিন্তু অন্য জায়গার জন্য এর হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যখন অন্য এলাকাবাসীর জন্য ঐদিন চাঁদ দেখার শরয়ী প্রমাণ পাওয়া যায় অর্থাৎ চাঁদ দেখার সাক্ষ্য পাওয়া গেল বা কাযীর হুকুমের সাক্ষ্য পাওয়া গেস বা বিভিন্ন কাফেলা ওখান থেকে এসে খবর দিল যে অমুক জায়গায় চাঁদ দেখা গেছে এবং ওখানকার লোকেরা রোযা রেখেছে বা ঈদ করেছে।

মাসআলাঃ টেলিগ্রাম, টেলিফোন ও রেডিও দ্বারা চাঁদ দেখা প্রমাণিত হতে পারে না। কারণ এগুলোকে যদি সবদিক দিয়ে সঠিক মনেও হয়, তবুও এটা কেবল একটি খবর মাত্র, সাক্ষ্য নয় এবং কেবল খবর দ্বারা চাঁদের প্রমাণ হয়

pdf By Syed Mostafa Sakib

না। অনুরূপ গুজব, পত্রিকা ও সংবাদ পত্রে ছাপানোর দ্বারাও চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয়না।

মাসআলাঃ নতুন চাঁদ দেখে ওই দিকে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা মকরূহ, যদিওবা অন্যদেরকে দেখানোর জন্য করে থাকে। (আলমগীরী, শিরাজীয়া, বযাযিয়া দুর্রুল মুখতার, বাহার)

রোযা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের বর্ণনা

মাসআলাঃ পানাহার ও সংগম করার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়, যদি রোযাদার হওয়াটা স্মরণ থাকে। আর যদি রোযাদার হওয়াটা স্মরণ না থাকে এবং ভুলে পানাহার, সংগম করলো, তাহলে রোযা ভঙ্গ হলো না।

(হেদায়া, আলমগীরী কার্যী খান)

মাসআলাঃ হুক্কা, সিগারেট, বিড়ি, সুরুট ইত্যাদি পান করার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয়েযায়।

মাসআলাঃ পান, তামাক, চুন খাওয়ার দ্বারাও রোযা ভেঙ্গে যায়, যদিওবা থুথু করে পিক ফেলে দেয়া হয়।

মাসআলাঃ চিনি,গুড় ইত্যাদি যে গুলো মুখে রাখলে গলে যায়, মুখে রাখলো এবং থুথু গিলে ফেললো, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেল।

মাসআলাঃ দাঁতে কোন জিনিষ চনাবুট বরাবর বা এর থেকে বড় লেগে রয়েছিল, সেটা খেয়ে ফেললো অথবা চনাবুট থেকে ছোট ছিল কিন্তু মুখ থেকে বের করে পুনরায় খেয়ে ফেললো, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেল।

মাসআলাঃ দাঁতসমূহ থেকে রক্ত বের হয়ে কণ্ঠনালীর ভিতরে চলে গেল এবং রক্তের পরিমাণটি থুথু থেকে অধিক বা বরাবর বা কম ছিল কিন্তু কণ্ঠনালীর মধ্যে এর স্বাদ অনুভব হলো, তাহলে এসব অবস্থায় রোযা ভঙ্গ হয়ে গেল। আর যদি রক্ত কম ছিল এবং স্বাদও অনুভব হয়নি, তাহলে রোযা ভঙ্গ হলো না। (দুর্রুল মুখতার, বাহার)

মাসআলাঃ নশ টানলো বা নাকের ছিদ্রে ওষুধ প্রয়োগ করলো বা কানে তেল দিল এবং তা ভিতরে চলে গেল, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেল, তবে যদি কানে পানি দেয়া হয় বা ঢুকে যায়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না। (আলমগীরী, বাহার)

মাসআলাঃ কুলি করছিল, অনিচ্ছাকৃতভাবে পানি কণ্ঠনালীর ভিতর চলে গেল বা নাকে পানি দিচ্ছিল এবং পানি মস্তিস্কে পৌছে গেল, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেল। আর যদি রোযার কথা ভুলে যায়, তাহলে ভঙ্গ হবে না।

(আলমগীরী, বাহার)

মাসআলাঃ নিদ্রিতাবস্থায় পানি পান করলো বা কিছু খেয়ে নিল অথবা মুখ খোলা ছিল এবং পানির ফোঁটা বা বৃষ্টি কণ্ঠনালীর ভিতর চলে গেল, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেল। (জাওহেরা আলমগীরী, বাহার)

মাসআলাঃ অন্য জনের থুথু গিলে ফেললো বা নিজের থুথু হাতে নিয়ে গিলে ফেললো তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেল। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ মুখে রঙিন সূতা রেখেছিল, যার ফলে থুথু রঙিন হয়ে গিয়েছিল এবং সেই থুথু গিলে ফেললো, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেল।

(আলমগীরী, বাহার)

মাসআলাঃ চোখের পানি মুখে পড়লো এবং গিলে ফেললো, তাহলে যদি দু এক ফোঁটা হয়, রোযা ভঙ্গ হলো না আর যদি এর অধিক হয় এবং সারা মুখে লবনাক্ততা অনুভব হয়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেল। ঘামের ও একই হুকুম।

(আলমগীরী)

মাসআলাঃ পুরুষ স্ত্রীকে চুমু দিল বা স্পর্শ করলো অথবা জড়িয়ে ধরলো এবং বীর্যপাত হয়ে গেল, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেল। আর যদি মহিলা পুরুষকে স্পর্শ করে এবং পুরুষের বীর্যপাত হয়ে যায়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না। মহিলাকে কাপড়ের উপর থেকে স্পর্শ করলো এবং কাপড় এতটুকু মোটা ছিল যে শরীরের উত্তাপ অনুভব হলো না, তাহলে রোযা ভঙ্গ হলো না, যদিওবা বীর্যপাত হয়ে যায়।

মাসআলাঃ এমন অতিরিক্তভাবে শৌচকার্য করা হলো যার ফলে মলদ্বারের অভ্যন্তরে পানি পৌছে গেল,তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেল। এ রকম শৌচকার্য না করা চায়, কারণ এতে মারাত্মক রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ পুরুষ প্রস্রাবের ছিদ্রে পানি বা তৈল প্রবেশ করালে রোযা ভঙ্গ হবে না, যদিওবা মূত্রথলী পর্যন্ত পৌছে যায়। আর যদি মহিলা লজ্জাস্থানে তৈল বা পানি প্রবেশ করায়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আলমগীরী, বাহার)

মাসআলাঃ মহিলা প্রস্রাবের জায়গায় তুলা বা কাপড় রাখলো এবং তা মোটেই বাইরে রইলো না, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেল আর শুকনা আঙ্গুলী পায়খানার রাস্তায় বা লজ্জাস্থানে রাখলে রোযা ভঙ্গ হয় না। যদি আঙ্গুলী ভিজা ছিল বা এতে কিছু লেগে ছিল, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেল। (আলমগীরী, দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ ইচ্ছেকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করলো এবং রোযাদার হওয়াটা স্মরণ ছিল, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেল আর যদি মুখ ভরা না হয়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হলো না। (দুর্রুল মুখতার ও অন্যান্য কিতাব)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি আসলো, রোযা ভঙ্গ হলো না, যদিওবা বেশী হোক বা কম হোক এবং রোযার কথা স্মরণ থাকুক বা না থাকুক। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ বমির এ হুকুম ওই সময় প্রযোজ্য যদি বমিতে খাবার বের হয়ে আসে বা পিত্তরস বা রক্ত আসে। কিন্তু কফ আসলে কোন অবস্থায় রোযা ভঙ্গ হবে না। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ রমাযান মাসে যে ব্যক্তি বিনা কারণে প্রকাশ্যে পানাহার করে, শরীয়তের হুকুম হচ্ছে ওকে কতল করে ফেলা।

(দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার, বাহার)

রোযা ভঙ্গের ওসব অবস্থাদির বর্ণনা, যে সবের বেলায় কেবল কাযা আবশ্যক

মাসআলাঃ এটা ধারণা ছিল যে এখনও সুবহে সাদেক শুরু হয়নি তাই কিছু পানাহার করলো বা সংগম করলো কিন্তু পরে জানতে পারলো যে সুবহে সাদেক হয়ে গিয়েছিল, তাহলে রোযা হলো না এবং কেবল কাযা আবশ্যক।

(দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ পানাহারের ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে অর্থাৎ প্রাণনাশ বা অঙ্গহানির হুমকি দেয়া হলো, তাহলে নিজ হাতে পানাহার করলেও কেবল কাযা আবশ্যক। (দুর্রুল মুখতার, ও অন্যান্য কিতাব) অর্থাৎ একটি রোযার বদলে একটি রোযা রাখতে হবে। (বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ কানে তেল দিল বা পেট বা মস্তিস্কের পাতলা চামড়া পর্যন্ত যখম ছিল এবং এতে ওষুধ দেয়ায় পেট বা মস্তিস্কে পৌছে গিয়েছিল বা নশ টানলো বা নাকে ওষুধ দিল অথবা পাথর, কঙ্কর, মাটি, তুলা, কাগজ, ঘাস ইত্যাদি খেলো, যেগুলোর প্রতি লোকেরা ঘৃণা করে বা রমাযান মাসে নিয়ত ছাড়া রোযার মত রইলো অথবা সকালে নিয়ত করেনি, দিনের দ্বিপ্রহরের পর নিয়ত করলো এবং নিয়তের পর খেয়ে নিল বা রোযার নিয়ত ছিল কিন্তু রমাযানের রোযার নিয়ত ছিল না বা গলায় বৃষ্টি বা কুয়াশার ফোঁটা ঢুকে গেল বা উল্লেখযোগ্য পরিমান ঘাম বা অশ্রু গিলে ফেললো বা এমন ছোট মেয়ের সাথে সংগম করলো যে সংগমের উপযোগী ছিল না বা লাশ বা পশুর সাথে সংগম করলো বা রান বা পেটের উপর সংগম করলো বা চুমু দিল অথবা মহিলার ঠোঁট চুষলো বা মহিলার শরীর স্পর্শ করলো যদিওবা কাপড় প্রতিবন্ধক হিসেবে ছিল কিন্তু শরীরের

উষ্ণতা অনুভব হলো এবং এসব অবস্থায় বীর্যপাত হয়ে গেল বা হস্তমৈথুন করে বীর্য বের করলো বা অশ্লীল আচরনের দ্বারা বীর্যপাত হয়ে গেল বা রমাযানের রোযা ছাড়া অন্য যে কোন রোযা ভঙ্গ করলো, যদিওবা সেটা রমাযানের কাযা রোযাও হয়ে থাকে বা নিদ্রারত রোযাদার মহিলার সাথে সংগম করা হলো বা সকালে সুস্থ ছিল এবং রোযার নিয়ত করেছিল অতপর পাগল হয়ে গেল এবং এ অবস্থায় ওর সাথে সংগম করা হলো বা রাত্রি মনে করে সাহরী খেয়ে নিল অথবা রাত আছে কিনা সন্দেহ ছিল তবুও সাহরী খেয়ে নিল অথচ তখন ভোর হয়ে গিয়েছিল বা সূর্য ডুবে গিয়েছে মনে করে ইফতার করে নিল অথচ সূর্য ডুবেনি বা দু'ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে সূর্য ডুবে গেছে এবং দু'জন সাক্ষ্য দিল যে এখনও দিন আছে। এবং প্রথম দুজনের কথার উপর বিশ্বাস করে ইফতার করে নিল কিন্তু পরে জানতে পারলো যে সূর্যাস্ত হয়নি। এসব অবস্থায় কেবল কাযা আবশ্যক, কাফ্ফারার প্রয়োজন নেই। (দুর্রুল মুখতার, বাহার)

মাসআলাঃ মুসাফির সফর থেকে ফিরে এলো, হায়েয-নিফাসওয়ালী পবিত্র হলো, পাগল হুঁশে আসলো, রোগী রোগমুক্ত হলো, কারো রোযা কেউ জোর করে ভাঙ্গালো বা অসতর্কাবস্থায় পানি ইত্যাদি গলার ভিতরে চলে গেল, রাত মনে করে সাহরী খেয়েছিল অথচ ভোর হয়েগিয়েছিল, সূর্য ডুবে গেছে মনে করে ইফতার করলো অথচ দিন বাকী ছিল। এসব অবস্থায় দিনের যে অংশটুকু বাকী থাকে, সেটা রোযার মত অতিবাহিত করা ওয়াজিব এবং সেই দিনের কাযাও আবশ্যক। নাবালেগ বালেগ হলে কিংবা কাফির মুসলমান হলে ওদের উপর ওই দিন কাযা ওয়াজিব নয়। অবশ্য অবশিষ্ট দিন রোযাদারের মত অতিবাহিত করা ওদের জন্যও ওয়াজিব। (দর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ শিশুর বয়স যখন দশ বছর হয় এবং রোযা রাখার মত শক্তি হয়, তাহলে ওকে যেন রোযা রাখানো হয়। না রাখতে চাইলে যেন মারধর করে রাখানো হয়। যদি পূর্ণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে কাযা আদায়ের নির্দেশ দিবে না। তবে নামায ভঙ্গ করলে পুনরায় পড়ার নির্দেশ দিবে। (রদ্দুল মুহতার, বাহার)

মাসআলাঃ সুবহে সাদেকের আগে সংগমে নিয়োজিত হলো, সুবহে সাদেক হওয়ার সাথে সাথে পৃথক হয়ে গেল। তাহলে কোন ক্ষতি হলো না আর যদি ওই অবস্থায় থাকে, তাহলে কাযা ওয়াজিব। তবে কাফ্ফারার প্রয়োজন নেই।

(রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ ভুলে সংগমে নিয়োজিত হলো কিন্তু স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে পৃথক হয়ে গেল, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। আর যদি ওই অবস্থায় রয়ে যায়,

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহলে কাযা ওয়াজিব, কাফ্ফারা নয়। (রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তির রোযা কাযা হয়ে থাকলে ওর ওলি ওর পক্ষ থেকে ফিদয়া আদায় করবে , যদি মৃত ব্যক্তি ওসীয়ত করে যায় এবং সম্পদও রেখে যায়। অন্যথায় ওলির উপর অপরিহার্য নয়। তবে করলে উত্তম। (বাহারে শরীয়ত)

রোযা ভঙ্গের ও সমস্ত অবস্থাদি,যার জন্য কাফ্ফারাও প্রয়োজন

রমাযানের রোযা ইচ্ছেকৃতভাবে ভেঙ্গে ফেললে কাফফারার প্রয়োজন হয়। রোযা ভঙ্গের কাফ্ফারা হচ্ছে একজন গোলাম বা বাদী আযাদ করা। এটা সম্ভব না হলে লাগাতার ষাট রোযা রাখা। এটাও সম্ভব না হলে ষাট জন মিসকীনকে পেট ভরে দুবেলা আহার করানো। রোযা রাখা অবস্থায় যদি মাঝখান থেকে একদিন বাদ পড়ে, তাহলে প্রথম থেকে পুনরায় ষাট রোযা রাখতে হবে। আগের গুলোর কোন হিসেব হবে না। মনে করুন উনষাট রোযা রাখলো কিন্তু অসুখ বা অন্য কোন কারনে ষাটের রোযাটা রাখতে পারলো না, তাহলে পুনরায় এক থেকে ষাট রোযা রাখতে হবে। আগের উনষাট বেকার হয়ে গেল। অবশ্য মহিলার যদি হায়েয হয়, তাহলে হায়েযের কারণে যে কায়েকদিন বাদ গেছে সেটা বাদ দিয়ে আগে পরে মিলে মোট ষাট হলে কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার, বাহার, আলামীগীরী) রোযা ভঙ্গের কারণে কাফফারা আবশ্যক হওয়ার কায়েকটি শর্ত রয়েছে। এ শর্তগুলো পাওয়া গেলে কাফ্ফারা আবশ্যক হবে, অন্যথায় হবে না।

কাফ্ফারা আবশ্যক হওয়ার শর্ত সমূহ

(১) রমাযান মাসে রোযা আদায়ের নিয়তে রোযাদার হওয়া চায়। (২) রোযাদার মুকীম হওয়া চায়, মুসাফির নয় (৩) বিবেকবান ও বালেগ হওয়া চায়। নাবালেগ বা পাগলে রোযা ভঙ্গ করলে এর কাফফারা নেই। (৪) রাত থেকেই রমাযানের রোযার নিয়ত হওয়া চায় (যদি ভেঙ্গে ফেলা রোযার নিয়ত দিনেই করে থাকে, তাহলে এর কাফফারা নেই) (৫) রোযা ভঙ্গের পর নিজের ইচ্ছের বর্হিভূত এমন কোন বিষয় পাওয়া না যাওয়া চায়, যার কারণে রোযা ভঙ্গের অনুমতি রয়েছে। যেমন হায়েয নিফাস হলো বা এমন রোগ হয়ে গেল যার জন্য রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে, তাহলে কাফ্ফারা আবশ্যক হবে না। আর যদি রোযা ভঙ্গের এমন বিষয় পাওয়া যায়, যেটা অজুহাত হিসেবে ধার করানো যায় কিন্তু তা নিজের ইচ্ছাধীন যেমন নিজেকে নিজে আহত করে নিল, ফলে রোযা রাখার অনুপযুক্ত হয়ে গেল অথবা মুসাফির হয়ে গেল, তাহলে কাফফারা বাদ যাবে না।

কারণ এ বিষয়গুলো নিজের ইচ্ছাধীন। তাই কাফ্ফারা আবশ্যক।
(দুরুল মুখতার, জাওহেরা, আলমগীরী বাহার)

মাসআলাঃ রোযাদার ইচ্ছেকৃতভাবে কোন ওষুধ বা খাবার গ্রহণ করলো বা কোন পানীয় পান করলো অথবা কোন জিনিষ স্বাদের জন্য খেলো বা পান করলো বা যৌন সম্ভোগ উপযোগী কোন মানুষের সাথে (পুরুষ ও মহিলা) ওর সামনের বা পিছনের রাস্তা দিয়ে সংগম করলো বীর্যপাত হোক বা না হোক, এসব ক্ষেত্রে কাযা ও কাফফারা উভয়টা আবশ্যক।

মাসআলাঃ এমন কোন কাজ করলো যদ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না কিন্তু সে মনে করে নিল যে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে। অতপর ইচ্ছেকৃতভাবে পানাহার করে নিল। যেমন শিঙ্গা বসালো বা সুরমা লাগালো বা পশুর সাথে সংগম করলো বা স্ত্রীকে স্পর্শ করলো বা চুমু দিল বা এক সাথে শুইলো বা অশ্লীল কথাবার্তা বললো কিন্তু কোন অবস্থায় বীর্যপাত হলো না বা পায়খানার রাস্তায় শুকনো আঙ্গুলী রাখলো। এসব কাজ করার পর যদি ইচ্ছেকৃতভাবে কিছু খেয়ে নেয়, তাহলে উল্লেখিত সব অবস্থায় রোযার কাযা ও কাফফারা উভয়টা আবশ্যক। আর যদি ও সব অবস্থায় যার মধ্যে রোযা ভঙ্গের ধারণা হয় না কিন্তু নিজে সন্দেহ করলো। এর পরিপ্রেক্ষিতে কোন নির্ভরযোগ্য মুফতীর রোযা ভঙ্গের ভুল ফত্ওয়ার পর ইচ্ছেকৃতভাবে খেয়ে নিল বা কোন হাদীছ ভুল বুঝা বুঝির কারণে ধরে নিয়েছিল যে ওর রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে এবং পরে ইচ্ছেকৃতভাবে পানাহার করলো, তাহলে এ অবস্থায় কাফফারা আবশ্যক নয়, যদিওবা ভুল ফতওয়া ছিল বা হাদীছের অর্থ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেনি। (দুরুল মুখতার বাহার)

যেসব বিষয় দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না

মাসআলাঃ ভুল করে পানাহার করলে বা সংগম করলে রোযা ভঙ্গ হয় না।

মাসআলাঃ মাছি বা ধোঁয়া বা ধুলি গলার ভিতর চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয় না। কিন্তু যদি ইচ্ছেকৃতভাবে নিজে ধোঁয়া পৌছায়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে, অবশ্য রোযাদার হওয়াটা স্মরণ থাকা চায়। যেমন আগরবাতি ইত্যাদির ধোঁয়া মুখের কাছে নিয়ে নাক দিয়ে নিশ্বাসের সাথে টান দিলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ শিঙ্গা বসালো বা তৈল বা সুরমা লাগালো এতে রোযা ভঙ্গ হয় না যদিওবা তৈল বা সুরমার স্বাদ কণ্ঠনালীতে অনুভব হয়। এমনকি থুথুর মধ্যে সুরমার রং দেখা গেলেও রোযা ভঙ্গ হয় না।

(রদ্দুল মুহতার, জাওহেরা ও বাহার)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ মাছি কণ্ঠনালীর ভিতর চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয় না। তবে যদি ইচ্ছেকৃতভাবে গিলে ফেলে, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেল। (আলমগীরী বাহার)

মাসআলাঃ কথা বলতে বলতে থুথুর দ্বারা ঠোঁট ভিজে গেল এবং পরে সেটা গিলে ফেললো বা কফ মুখে আসলো এবং গিলে ফেললো, এতে রোযা ভঙ্গ হলো না। কিন্তু এ সব বিষয় থেকে বিরত থাকা চায়।

(আলমগীরী, দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌছলো কিন্তু এর নীচে গেল না, এতে রোযা ভঙ্গ হলো না। (দুর্রুল মুখতার, ফতহুল কদীর)

মাসআলাঃ ভুলে খাবার খাচ্ছিল, কিন্তু স্মরণ হওয়ায় সাথে সাথে মুখ থেকে গ্রাস ফেলে দিল, তাহলে রোযা ভঙ্গ হলোনা আর যদি গিলে ফেললো, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেল। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ সুবহে সাদেক শুরু হওয়ার আগ থেকে সাহরী খেতে শুরু করেছিল, কিন্তু সুবহে সাদেক শুরু হওয়ার সাথে সাথে যদি গ্রাস মুখ থেকে বের করে ফেলে, তাহলে রোযা ভঙ্গ হলো না আর যদি গিলে ফেলে, রোযা ভঙ্গ হয়ে গেল। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ তিল বা তিল বরাবর কোন জিনিষ চর্বন করলো এবং থুথুর সাথে কণ্ঠনালীর ভিতরে চলে গেল, এতে রোযা ভঙ্গ হলো না। কিন্তু এর স্বাদ যদি কণ্ঠনালীতে অনুভব হয়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেল। (ফতহুল কদীর)

মাসআলাঃ ওষুধ চূর্ণ করছিল কিংবা আটা পিষতে ছিল এবং এর স্বাদ কণ্ঠনালীতে অনুভব হলো, এতে রোযা ভঙ্গ হলো না।

(দুর্রুল মুখতার, ফতহুল কদীর)

মাসআলাঃ কানে পানি ঢুকে গেল। এতে রোযা ভঙ্গ হলো না।

(দুর্রুল মুখতার ফতহুল কদীর)

মাসআলাঃ গীবত করলে রোযা ভঙ্গ হয় না, যদিওবা গীবত খুবই মারাত্মক কবীরা গুনাহ। কুরআন শরীফে গীবত সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ গীবত হচ্ছে নিজের মৃত ভাই এর মাংস খাওয়ার মত। আর হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে- গীবত যেনা থেকেও মারাত্মক। অনুরূপ মহিলার দিকে বরং শরম জায়গার প্রতি দৃষ্টি দিল কিন্তু হাত লাগায়নি, এতে যদিওবা বীর্যপাতও হয়ে যায় এবং তাও বার বার দৃষ্টি দেয়া বা সংগমের খেয়াল করার কারণে বীর্যপাত হয়ে থাকে বা দীর্ঘক্ষণ খারাপ ধারণা করার দ্বারা হয়ে থাকে, এ অবস্থায় রোযা ভঙ্গ হবে না।

(জাওহেরা দর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ স্বপ্নদোষ হলে রোযা ভঙ্গ হয় না।

মাসআলাঃ নাপাক অবস্থায় ভোর করলো বরং যদি সারা দিনও গোসল না করে নাপাক অবস্থায় অতিবাহিত করে, রোযা হয়ে যাবে। কিন্তু এত দীর্ঘক্ষণ ইচ্ছেকৃতভাবে গোসল না করা ও নামায কাযা করা গুনাহ ও হারাম। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে–যে ঘরে নাপাকী থাকে, সে ঘরে রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করে না। (দুর্রুল মুখতার, বাহার)

মাসআলাঃ অজায়গায় সংগম করলো, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত বীর্যপাত হবে না, ততক্ষন পর্যন্ত রোযা ভঙ্গ হবে না। অনুরূপ হস্তমৈথুন দ্বারা মজি বের হলে রোযা ভঙ্গ হবে না, যতক্ষণ মনি (বীর্য) বের না হয়, যদিওবা এ কাজটি জঘন্য হারাম। হাদীছ শরীফে এ রকম আচরণকারীকে অভিশপ্ত বলা হয়েছে। (দুর্রুল মুখতার,বাহার)

রোযার মকরূহ সমুহের বর্ণনা

মাসআলাঃ মিথ্যা, গীবত, চুগলী, গালি দেয়া, বেহুদা কথা বলা, কাউকে কষ্ট দেয়া এসব বিষয় এমনিতেও নাজায়েয ও হারাম এবং রোয়াতে আরও অধিক হারাম এবং ওসবের কারণে রোযাও মকরূহ হয়ে যায়।

মাসআলাঃ রোযাদারের বিনা অজুহাতে কোন জিনিষের স্বাদ দেখা বা চিবানো মকরূহ। স্বাদ দেখার অজুহাত হচ্ছে যেমন স্বামী বা মুনিব বদমেজাজী, লবন কমবেশী হলে অসন্তুষ্ট হতে পারে। তাই এ কারণে স্বাদ দেখলে কোন ক্ষতি নেই। চিবানোর অজুহাত হচ্ছে যেমন শিশু এত ছোট যে রুটি খেতে পারে না এবং এমন কোন নরম খাদ্যও নাই যা ওকে খাওয়ানো যাবে, এমন কোন বেরোযাদারও নেই, যে রুটিটা চিবায়ে দিবে। এমতাবস্থায় শিশুকে খাওয়ানোর জন্য রুটি ইত্যাদি চিবানো মকরূহ নয়। (দুর্রুল মুখতার ও বাহার)

স্বাদ দেখার অর্থঃ স্বাদ দেখার অর্থ সেটা নয়, যা আজকাল বলা হয় যে কোন কিছুর স্বাদ বুঝার জন্য ওখান থেকে কিছু খেয়ে নেয়া। এ রকম স্বাদ দেখার দ্বারা রোযা মকরূহ নয় বরং ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর কাফফারার শর্তসমূহ পাওয়া গেলে কাফফারাও আবশ্যক হবে। আসলে স্বাদ দেখার অর্থ হচ্ছে মুখে রেখে স্বাদ অনুভব করা। পরে থুথু করে ফেলে দেয়া, যাতে ওখান থেকে কোন কিছু কণ্ঠনালীর ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে; অন্যথায় রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ এমন কোন জিনিষ ক্রয় করলো, যার স্বাদ দেখা প্রয়োজন। অন্যথায় ক্ষতি হতে পারে, তাহলে স্বাদ দেখলে কোন ক্ষতি নেই। (দুর্রুল মুখতার)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ মহিলাকে চুমু দেয়া, জড়ায়ে ধরা এবং শরীর স্পর্শ করা মকরূহ, যদি বীর্যপাত হওয়ার ভয় থাকে অথবা সংগমে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। আর ঠোঁট বা মুখে চুমু দেয়াটা যে কোন অবস্থায় মকরূহ। অনুরূপ অশ্লীল আচরণও মকরূহ। (রদ্দুল মুখতার ও বাহার)

মাসআলাঃ গোলাপ বা মেশক ইত্যাদির ঘ্রাণ লওয়া, দাড়ি গোঁফে তৈল লাগানো এবং সুরমা লাগানো মকরূহ নয়। কিন্তু যদি রূপচর্চার উদ্দেশ্যে সুরমা লাগানো হয় বা তৈল এ জন্য লাগানো হয় যেন দাড়ি বেড়ে যায় অথচ দাড়ি এক মুটি বরাবর আছে, তাহলে এ দুটি বিষয় রোযা ছাড়াও মকরূহ আর রোযায়তো আরও বেশী মকরূহ। (দুরুল মুখতার)

মাসআলাঃ রোযাদারের জন্য কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার ব্যাপারে অতিরিক্ত করা মকরূহ। কুলির ব্যাপারে অতিরিক্ত করার অর্থ হচ্ছে মুখ ভরে পানিনেয়া।

মাসআলাঃ ওযূ ও গোসল ব্যতীত ঠাণ্ডা লাগানোর উদ্দেশ্যে কুলি করা , নাকে পানি দেয়া বা ঠাণ্ডার জন্য গোসল করা বরং শরীরে ভিজা কাপড় জড়ানো মকরূহ নয়। তবে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার জন্য ভিজা কাপড় জড়ানো মকরূহ, কারণ ইবাদতে মনক্ষুন্ন হওয়া ভাল নয়। (আলমগীরী রদ্দুল মুহতার ও বাহার)

মাসআলাঃ মুখে থুথু জমায়ে গিলে ফেলা রোযা ভিন্ন অন্য সময়েও ভাল নয় আর রোযাতে এ রকম করা মকরূহ। (আলমগীরী বাহার)

মাসআলাঃ রোযাতে মিসওয়াক করা মকরূহ নয় বরং অন্যান্য সময় যে রকম সুন্নাত, রোযাতে তদ্রুপ সুন্নাত।

ইফতার–সাহরীর বর্ণনা

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) ফরমায়েছেন, সাহরী খাও, কারণ সাহরীর মধ্যে বরকত রয়েছে। আমরা ও আহলে কিতাবের রোযাসমূহের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সাহরীর গ্রাস।

(বুখারী মুসলিম ও তিরমিযী নাসাঈ) আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর ফিরিশতাগণ সাহরী গ্রহনকারীদের জন্য দরূদ প্রেরণ করেন (তবরানী আওসাত, ইবনে হারবান) সাহরীর সবকিছুই বরকতময়, একে বর্জন না করা চায়। কমপক্ষে এক ঢোক পানি হলেও পান করে নেয়া চায়, কেননা সাহরী গ্রহণকারীদের উপর আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ দরূদ প্রেরণ করেন (ইমাম আহমদ)। হুযুর (আলাইহিস সালাম) ফরমান, আল্লাহ তাআলা ফরমায়েছেন, আমার বান্দাদের মধ্যে আমার অধিক প্রিয় পাত্র সে, যে ইফতারে তাড়াতাড়ি করে (আহমদ

তিরমিযী ইবনে খোযাইমা ও ইবনে হাববান) আরও ফরমায়েছেন, ইফতারে তাড়াতাড়ি করা এবং সাহরীতে দেরী করাকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। (তবরানী ও আওসত)

মাসআলাঃ সাহরী খাওয়া ও এতে দেরী করা সুন্নাত। কিন্তু সুবহে সাদেক হয়ে যাওয়ার সন্দেহ হওয়ার মত দেরী করা মকরূহ। (আলমগীরী, বাহার)

মাসআলাঃ ইফতারে তাড়াতাড়ি করা সুন্নাত। তবে ইফতার যেন তখনই করা হয়, যখন সূর্যাস্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। যতক্ষণ নিশ্চিত হওয়া না যায়, ইফতার না করা চায়, যদিওবা মুয়াযযিন আযান দিয়ে থাকে আর মেঘলা দিনে ইফতারে তাড়াতাড়ি না করা চায়। রেদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ ইফতার–সাহরীর বেলায় তোপ ও সাইরেন তখনই নির্ভর যোগ্য হবে, যদি কোন পরহিজগার বিজ্ঞ ও নক্ষত্র জ্ঞান বিশারদ আলেমের হুকুমে দেয়া হয়। আজকালকার সাধারণ আলেমগণ এ বিষয়ে অজ্ঞ এবং পঞ্জিকাও প্রায় সময় ভুল হয়ে থাকে; এর উপর নির্ভর করা না জায়েয। তবে যদি কোন দ্বীনদার ও নক্ষত্র জ্ঞান বিশারদ আলেম কর্তৃক ইফতার সাহরীর সময়সূচী তৈরী করা হয়, সেটা অনুযায়ী আমল করা যায়।

মাসআলাঃ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমায়েছেন, যখন কেউ রোযা ইফতার করে, তখন যেন খেজুর বা খোর্মা দ্বারা ইফতার করে। কারণ সেটা বরকতময় আর যদি পাওয়া না যায়, তাহলে যেন পানি দ্বারা ইফতার করে কারণ সেটা পবিত্রতাকারী। হুযুর (সাল্লাল্লাহ তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) ইফতারের সময় এ দুআটি পড়তেনঃ اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

(আল্লাহুমা লাকা সুমতু ওয়া আলা রিযকেকা আফতারতু) অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার জন্যই রোযা রেখেছি এবং তোমারই প্রদত্ত রিযিক দ্বারা ইফতার করেছি।

কোন্ কোন্ অবস্থাসমূহ রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে

মাসআলাঃ সফর, গর্ভাবস্থা, শিশুকে দুধ পান, অসুস্থতা, বার্ধক্য,জীবনের ভয়, শরয়ী বাধ্য বাধকতা, মস্তিষ্ক বিকৃতি, জিহাদ এ সব হচ্ছে রোযা না রাখার অজুহাত। এসব বিষয়ের কারণে কেউ যদি রোযা না রাখে, তাহলে গুনাহগার হবে না। কিন্তু অজুহাত অপসারিত হওয়ার পর বাদ পড়া রোযাগুলো রাখা ফরয।

মাসআলাঃ সফর বলতে শরয়ী সফর বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ এতটুকু দুরত্বে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হওয়া, যেটা এখান থেকে ওখান পর্যন্ত তিন দিনের পথ

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদিওবা সফর কোন অবৈধ কাজ উপলক্ষে হয়ে থাকে। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ দিনে সফর করলো, তাহলে সেই দিনের রোযা ইফতার করার জন্য আজকের সফর অজুহাত নয়। অবশ্য যদি ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে কাফফারা আবশ্যক হবে না কিন্তু গুনাহগার হবে। আর যদি সফর করার আগে ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে কাফফারাও আবশ্যক আর যদি দিনে সফর করলো এবং ঘরে কোন কিছু ভুলে ফেলে যাওয়ায় ওটা নেয়ার জন্য ফিরে আসলো এবং ঘরে এসে বোয়া ভেঙ্গে ফেললো, তাহলে কাফফারা ওয়াজিব। (আলমগীরী ও বাহার)

মাসআলাঃ মুসাফির শরয়ী অর্ধদিবসের আগে ফিরে আসলো এবং তখনও কিছু খায়নি, তাহলে রোযার নিযত করে নেয়া ওয়াজিব। (জাওহেরা ও বাহার)

মাসআলাঃ মুসাফির ও ওর সফর সঙ্গীদের রোযা রাখলে যদি কোন ক্ষতি না হয়, তাহলে সফরে রোযা রাখা উত্তম। অন্যথায় না রাখাটা ভাল।

(দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ যদি গর্ভবতী বা দুগ্ধদানকারী মহিলার নিজের বা শিশুর বাস্তব ভয় হয়, তাহলে সেই সময় রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। সেই দুগ্ধদানকারিনী মহিলা শিশুর মা হোক বা ধাত্রী, যদিওবা রমাযান মাসে দুধ পান করানোর চাকুরী নিয়ে থাকে। (দুর্রুল মুখতার রদ্দুল মুহতার, বাহার)

মাসআলাঃ রোগীর রোগ বৃদ্ধি পাওয়া বা দেরীতে আরোগ্য লাভ করা বা সুস্থ ব্যক্তির রোগাক্রান্ত হয়ে যাবার দৃঢ় বিশ্বাস হয় বা সেবক বা সেবিকার ভীষণ দুর্বল হয়ে যাবার দৃঢ় সন্দেহ হয়, তাহলে ওরা সবার জন্য ওই দিনের রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। (জাওহেরা, দুর্রুল মুখতার ও বাহার)

মাসআলাঃ উপরোক্ত অবস্থাসমূহে দৃঢ় ধারনার প্রয়োজন। কেবল কল্পনা বা খেয়াল যথেষ্ট নয়। দৃঢ় ধারনার তিনটি ধরণ রয়েছে–হয়তো বাহ্যিক লক্ষণ পাওয়া যায়, অথবা ওই ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে বা ফাসিক নয় এমন কোন বিজ্ঞ মুসলমান ডাক্তার বলেছেন। যদি বাহ্যিক লক্ষণ পাওয়া না যায় বা কোন অভিজ্ঞতা না থাকে অথবা অনুরূপ কোন ডাক্তারও না বলেন, তাহলে রোযা ভঙ্গ করা নাজায়েয বরং নিছক ধারণা বা কাফির অথবা ফাসিক ডাক্তারের কথা মত রোযা ভঙ্গ করলে, কাফফারাও আবশ্যক হবে। (রদ্দুল মুহতার ও বাহার) আজকাল অধিকাংশ ডাক্তার কাফির না হলেও নিশ্চয়ই ফাসিক। তাছাড়া বিজ্ঞ ডাক্তারের খুবই অভাব। এদের কথা মোটেই নির্ভর যোগ্য নয়। ওদরে কথা অনুসারে রোযা না রাখা বা ভঙ্গ করা নাজায়েয। এসব ডাক্তারদেরকে দেখা যায় যে মামুলী রোগের জন্যও রোযা নিষেধ করে। এতটুকু পার্থক্য জ্ঞানও রাখে না যে কোন্ রোগের জন্য রোযা ক্ষতিকর এবং কোন্ রোগের জন্য নয়।

মাসআলাঃ এমন ক্ষুধা ও তৃষ্ণা যার জন্য প্রাণ হানির বাস্তব ভয় বা মস্তিষ্ক বিকৃতির সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহলে রোযা রাখবে না। (ফত্হুল কদীর আলমগীরী ও বাহার)

মাসআলাঃ সাপে দংশন করলো এবং প্রাণহানির ভয় হলো, তখন রোযা ভেঙ্গে ফেলবে। (রদ্দুল মুহতার ও বাহার)

মাসআলাঃ অতিশয় বৃদ্ধ (অর্থাৎ যার বয়স এমন হয়েছে যে দিন দিন দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে) যখন রোযা রাখতে অক্ষম হয় অর্থাৎ এখন রাখতে পারছে না এবং সামনে ও রাখতে পারবে বলে কোন আশা করতে পারছে না, তখন ওর রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে এং প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে ফিদয়া অর্থাৎ একজন মিসকীনকে দুবেলা পেট ভরে খাবার খাওয়ানো ওর উপর ওয়াজিব। বা প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে সদকায়ে ফিতর বরাবর মিসকীনকে দিয়া দিবে। (দুর্রুল মুখতার, আলমগীরী ও বাহার)

মাসআলাঃ যদি এ ধরণের বৃদ্ধ গরমকালে গরমের জন্য রোযা রাখতে পারে না। কিন্তু শীত কালে রাখতে পারে, তাহলে গরমকালে রোযা ভঙ্গ করে ফেলবে এবং এ সবের পরিবর্তে শীতকালে রোযা রাখা ফরয। (রদ্দুল মুহতার ও বাহার)

মাসআলাঃ যদি ফিদয়া দেয়ার পর শরীরে রোযা রাখতে পারে মত শক্তি এসে গেল, তাহলে রোযার কাযা আদায় করা ওয়াজিব। এবং ফিদয়া সদকায়ে নফল হয়ে গেল। (আলমগীরী নেহায়া ও বাহার)

মাসআলাঃ কারো বদলে অন্য কেউ রোযা রাখতে বা নামায পড়তে পারে না। অবশ্য নিজের রোযা নামায ইত্যাদির ছওয়াব অন্যদেরকে পৌছানো যায়। (হেদায়া আলমগীরী দুর্রুল মুখতার, ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ নফলী রোযা ইচ্ছেকৃতভাবে শুরু করার দ্বারা আবশ্যক হয়ে যায়। যদি ভঙ্গ করে কাযা ওয়াজিব হবে বা কোন কারণে ভঙ্গ হয়ে গেলে যেমন হায়েয হয়ে গেল, তবুও কাযা ওয়াজিব।

(হেদায়া দুর্রুল মুখতার ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ ঈদদ্বয় বা কুরবানী ঈদের পরবর্তী তিন দিন কেউ নফল রোযা রাখলো, তাহলে ওই রোযা পূর্ণ করা ওয়াজিব নয় বরং ওই রোযা ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব। এবং ওটা ভেঙ্গে ফেললে কাযা ওয়াজিব নয় আর যদি ওই দিনসমূহে রোযা মানত করে থাকে, তাহলে মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব, তবে ওই দিনসমূহে নয় বরং অন্য দিন সমূহে। (রদ্দুল মুহতার ও বাহার)

মাসআলাঃ মেহমানের স্বার্থে নফল রোযা ভঙ্গের অনুমতি রয়েছে, যদি এর কাযা আদায় করার ভরসা থাকে। আর এ ভঙ্গের অনুমতিটা হচ্ছে দ্বিপ্রহরের

pdf By Syed Mostafa Sakib

আগ পর্যন্ত, এর পরে নয়। তবে মা বাপের অসন্তুষ্টির কারণে আসরের পরও ভঙ্গ করা যায়। (আলমগীরী ও রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ কোন ইসলামী ভাই দাওয়াত দিলে, দ্বিপ্রহরের আগে নফল রোযা ভঙ্গের অনুমতি রয়েছে। তবে পরে কাযা আদায় করতে হবে।

মাসআলাঃ মহিলা স্বামীর অনুমতি বিনা নফল, মানত ও অন্যকোন প্রকারের রোযা যেন না রাখে। যদি রেখে ফেলে, স্বামী ভঙ্গ করাতে পারে;তবে ভঙ্গ করলে কাযা ওয়াজিব হবে এবং সেই কাযার জন্য স্বামীর অনুমতি নিতে হবে আর যদি স্বামীর ক্ষতি না হয়, তাহলে কাযার বেলায় ওর অনুমতির প্রয়োজন নেই বরং সে মানা করলেও কাযা রাখা যাবে। রমাযানের রোযা এবং এ কাযার অন্য স্বামীর অনুমতির কোন প্রয়োজন নেই বরং সে নিষেধ করলেও রাখবে।

(দুর্রুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ কোন কারণে যদি রোযা রাখা হলো না। পরে যদি বাঁধা পড়ে, সেটা রাখা ফরয। (দুর্রুল মুখতার ও অন্যান্য কিতাব)

কয়েকটি নফল রোযার ফযীলত

আশুরাঃ অর্থাৎ ১০ই মুহরমের রোযা। উত্তম হচ্ছে নয় তারিখও রোযা রাখা। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) নিজে আশুরার রোযা রেখেছেন এবং অন্য লোকদেরকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ফরমায়েছেন, রমাযানের পর আফজল রোযা হচ্ছে মুহরমের রোযা। (বুখারী মুসলিম আবু দাউদ ও তিরমিযী) আরও ফরমায়েছেন আশুরার রোযা এক বছরের আগের গুনাহ বিলোপ করে দেয়। (মুসলিম)

আরাফাঃ অর্থাৎ জ্বিলহজ্বের নয় তারিখের রোযা। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) ফরমায়েছেন, আরাফার রোযা এক বছর আগের ও এক বছর পরের গুনাহ বিলোপ করে দেয়। (মুসলিম ও আবু দাউদ) হযরত সিদ্দীকা (রাদি আল্লাহ তাআলা আনহা) ফরমান, রসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহ তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) আরাফার রোযাকে হাজার হাজার রোযা সমতূল্য বলতেন কিন্তু হজ্ব আদায়কারীগণকে, যারা আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করতেন; এ রোযা থেকে নিষেধ করেছেন।

(বায়হাকী তবরানী আবু দাউদ নাসাঈ)

শাওয়ালের ছয় রোযাঃ রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) ফরমায়েছেন, যে রমাযানের রোযা রাখলো, এর পর শাওয়ালের ছয়

রোযা রাখলো, তাহলে সে যেন সারা বছর রোযা রাখলো। আরও ফরমায়েছেন, যে ঈদের পরে ছয় রোযা রাখে, তাহলে সে যেন পূর্ণ বছর রোযা রাখলো (মুসলিম আবু দাউদ, তিরমিযী নাসাঈ ও ইবনে মাযা)

মাসআলাঃ উত্তম হচ্ছে এ ছয় রোযা যেন বিরতি দিয়ে রাখা হয়। তবে যদি ঈদের পর লাগাতার ছয় দিন একসাথে রাখে, তাতেও কোন ক্ষতি নেই। (দুর্রুল মুখতার ও বাহার)

শাবানের রোযা ও ১৫ই শাবানের ফযীলতঃ রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) ফরমায়েছেন, যখন শাবানের পনের তারিখের রাত আসে, তখন সেই রাত কিয়াম (নফল ইবাদত) কর এবং দিনে রোযা রেখো। কারণ আল্লাহ তাআলা সূর্য ডুবার পর থেকে আসমান জমীনে বিশেষ তজল্লী দান করেন এবং ফরমান, আছে কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী? যেন ওকে ক্ষমা প্রদান করি; আছে কোন রুজি তলবকারী? যেন ওকে রুজিদান করি; আছে কোন মসীবত গ্রস্থ? যেন ওকে রেহায় দান করি; আছে এমন কেউ আছে তেমন কেউ ? এ রকম ফজর হওয়া পর্যন্ত বলতে থাকেন। (ইবনে মাজা) আরও ফরমায়েছেন, শাবানের পনের তারিখ আল্লাহ তাআলা সমগ্র মাখলুকের প্রতি তজল্লী প্রদান করেন এবং সবাইকে ক্ষমা করে দেন কিন্তু কাফির ও পরস্পর শত্রুতাকারীদেরকে নয়। (তবরানী ও ইবনে মাজা)

আয়্যামে বীযের রোযাঃ অর্থাৎ তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখের রোযা। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) ফরমায়েছেন, প্রতিমাসের তিনদিনের রোযা এমন, যেন সব সময়ের রোযা। (বুখারী ও মুসলিম) আরও ফরমায়েছেন, যার পক্ষে সম্ভব যে যেন প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখে। প্রতি রোযা দশটি গুনাহ বিলোপ করে এবং গুনাহ থেকে এমনভাবে পাক করে দেয় যেমন পানি কাপড়কে। (তবরানী) হযরত ইবনে আব্বাস ফরমায়েছেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহ তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) সফর মুকীম যে কোন অবস্থায় সর্বদা আয়্যামে বীযের রোযা রাখতেন (নাসাঈ)

সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযাঃ রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) ফরমায়েছেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমলসমূহ পেশ করা হয়। তাই আমি পসন্দ করি যে আমার আমল যেন ওই সময় পেশ করা হয়, যখন আমি রোযাদার। আরও ফরমায়েছেন, এ দুদিন আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুসলমানের মাগফিরাত করেন কিন্তু ওই লোকদের নয়, যারা পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। ওদের ব্যাপারে ফিরিশতাগণকে বলা হয়, ওদেরকে বাদ দাও যতক্ষণ এরা সন্ধি না করে।

(তিরমিযী ও ইবনে মাজা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

বুধ ও বৃহস্পতিবারের রোযাঃ রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) ফরমায়েছেন, যে বুধ ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখে, ওর জন্য দোযখ থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হয়। আরও ফরমায়েছেন, যে বুধ ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখে, আল্লাহ তাআলা ওর জন্য জান্নাতে এমন এক মহল তৈরী করবেন যার বহিরাংশ ভিতর থেকে দেখা যাবে এবং ভিতরের অংশ বাইর থেকে।

মাসআলাঃ নির্দিষ্ট করে শুক্রবার রোযা রাখা মকরূহ। অবশ্য আগে বা পরে আরও রোযা মিলায়ে রাখা যায়, কারণ নফল ও সুন্নাত রোযা একটা রাখা মকরূহ।

ইতেকাফ

ইতেকাফের নিয়তে আল্লাহর ওয়াস্তে মসজিদে অবস্থান করার নাম ইতেকাফ। ইতেকাফ তিন প্রকার ওয়াজিব, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ও মুস্তাহাব। মানতের ইতেকাফ হচ্ছে ওয়াজিব যেমন কেউ মানত করলো, অমুক কাজ হয়ে গেলে আমি একদিন বা দুদিনের ইতেকাফ করবো এ ধরণের ইতেকাফ ওয়াজিব এবং তা পালন করা আবশ্যক। ওয়াজিব ইতেফাফের জন্য রোযা শর্ত। রোযা ছাড়া শুদ্ধনয়।

ইতেকাফে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাঃ এটা রমাযানের শেষ দশ দিন করা হয় অর্থাৎ ২০শে রমাযান সূর্যাস্তের সময় ইতেকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান নিতে হয় এবং ৩০শে রমাযান সূর্যাস্তের পর বা ২৯ শে রমাযান চাঁদ দেখার খবর হওয়ার পর বের হয়। যদি বিশ তারিখ মাগরিবের নামাযের পর ইতেকাফের নিয়ত করে, তাহরে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায় হবে না। এ ইতেকাফ হচ্ছে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কেফায়া অর্থাৎ যদি সবাই বর্জন করে, তাহলে সবাই দায়ী হবে আর যদি যে কোন একজন পালন করে, তাহলে সবাই দায়মুক্ত হয়ে গেল, এ ইতেকাফের জন্যও রোযা শর্ত। তবে সেই রমাযানের রোযাই যথেষ্ট। (দুর্রুল মুখতার, আলমগীরী ও হেদায়া)

মুস্তাহাব ইতেকাফঃ ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ইতেকাফ ব্যতীত যে ইতেকাফ করা যায়, সেটা মুস্তাহাব ইতেকাফ। মুস্তাহাব ইতেকাফের জন্য রোযা শর্ত নয়। এটা কিছুক্ষণের জন্যও করা যায়। মসজিদে যখন যান এ ইতেকাফের নিয়ত করে নিন, যদিওবা কিছুক্ষণ অবস্থান করে মসজিদ থেকে চলে আসেন। যখন বের হয়ে যাবেন, ইতেকাফ শেষ হয়ে যাবে। নিয়তের বেলায় কেবল

এতটুকুই যথেষ্ট যে আমি আল্লাহর ওয়াস্তে মুস্তাহাব ইতেকাফের নিয়ত করলাম।

(আলমগীরী, বাহার ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ পুরুষের ইতেকাফের জন্য মসজিদ প্রয়োজন আর মহিলা নিজ ঘরের ওই জায়গায় ইতেকাফ করবে, যে জায়গাটা নামাযের জন্য নির্ধারিত করা হয়।

(হেদায়া, রদ্দুল মুহতার ও বাহার)

মাসআলাঃ ইতেকাফকারীর জন্য মসজিদ থেকে বিনা কারণে বের হওয়া হারাম। যদি বের হয়, তাহলে ইতেকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। ভুলে বের হলেও ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপ মহিলা যদি স্বীয় ইতেকাফের জায়গা থেকে বের হয়, তাহলে ইতেকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে, যদিওবা ঘরের মধ্যে থাকে, (আলমগীরী ও রদ্দুল মুহতার) মসজিদ থেকে বের হবার দুটি অজুহাত রয়েছে, এক শারীরিক অজুহাত, অপরটি শরয়ী অজুহাত। শারীরিক অজুহাত হচ্ছে, পায়খানা, প্রস্রাব শৌচকার্য, ফরয গোসল, ওযু (যদি ওযু গোসলের জন্য মসজিদের ভিতরে ব্যবস্থা না থাকে) শরয়ী অজুহাত হচ্ছে ঈদ বা জুমার নামাযের জন্য বের হওয়া। যদি ইতেকাফরত মসজিদে জামাত না হয়, তাহলে জামাত পড়ার জন্যও বের হওয়া যায়। উল্লেখিত অজুহাতসমূহ ব্যতীত অন্য কোন কারণে যদি কিছুক্ষণের জন্যও ইতেকাফের জায়গা থেকে বাইর হয়, তাহলে ইতেকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে, যদিওবা ভুলেও বের হয়ে থাকে।

মাসআলাঃ ইতেকাফকারী রাতদিন মসজিদেই থাকবে, ওখানেই পানাহার করবে, ঘুমাবে, ওসব কাজের জন্য বের হলে, ইতেকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। (দুর্রুল মুখতার, হেদায়া ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ ইতেকাফকারী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির মসজিদে পানাহার ও ঘুমাবার অনুমতি নেই। যদি এসব কাজ করতে চায়, তাহলে ইতেকাফের নিয়ত করে মসজিদে যাবে, নামায পড়বে বা আল্লাহর যিকর করবে, অতপর এ কাজ করতে পারে। তবে পানাহারের ব্যাপারে এ সতর্কটা অপরিহার্য যে মসজিদ যেন নোংরা না হয়। (রদ্দুল মুহতার, বাহার ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ ইতেকাফকারীর নিজের প্রয়োজনে বা ছেলেমেয়ের প্রয়োজনে মসজিদে বেচা কেনা করা জায়েয যদি সেই জিনিষ মসজিদে রাখা না হয় বা রাখা হলেও সামান্য, যা জায়গা ব্লক করে রাখে না। আর যদি বেচা কেনাটা ব্যবসার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তাহলে নাজায়েয। সেই জিনিষ মসজিদে না থাকলেও নাজায়েয। (দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার ও বাহার)

মাসআলাঃ ইতেকাফকারী যেন নিশ্চুপও না থাকে এবং কথাও না বলে বরং

pdf By Syed Mostafa Sakib

যেন কুরআন শরীফ তিলাওয়াত, হাদীছ পাঠ ও অধিক দরূদ পাঠ করে এবং দ্বীনি শিক্ষা দান করে বা গ্রহণ করে, নবী ওলি ও নেকবান্দাদের জীবনী পাঠ করে বা দ্বীনি বিষয়ে কিছু লিখে। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ নফল ইতেকাফ ভঙ্গ করলে, এর কাযা নেই। কিন্তু যদি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ইতেকাফ ভঙ্গ করে, তাহলে যেদিন ভঙ্গ করে, কেবল সেই একদিনের কাযা যেন আদায় করে, পুরা দশদিনের কাযা ওয়াজিব নয়। মানতের ইতেকাফ ভঙ্গের ক্ষেত্রে যদি কোন নির্দিষ্ট মাসের মানত থাকে, তাহলে অবশিষ্ট দিনের কাযা আদায় করবে। অন্যথায় যদি লাগাতার ওয়াজিব হয়ে থাকে, তাহলে প্রথম থেকে পুনরায় ইতেকাফ থাকতে হবে আর যদি লাগাতার ওয়াজিব না হয়ে থাকে, তাহলে অবশিষ্ট দিনের ইতেকাফ পালন করবে।

মাসআলাঃ ইতেকাফ যে কারণেই ভঙ্গ হোক, ইচ্ছেকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত, যে কোন অবস্থায় কাযা ওয়াজিব। (রদ্দুল মুহতার)

যাকাতের বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ফরমান, ওরাই কল্যাণ লাভ করে, যারা যাকাত আদায় করে। আর ও ফরমান, তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে আরও দিবে এবং আল্লাহ তাআলা উত্তম রুজী প্রদানকারী। আরও ফরমান, যে সব লোক কৃপণতা করে ওটার সাথে, যা আল্লাহ তাআলা স্বীয় মেহেরবানীতে ওদেরকে দিয়েছেন, ওরা যেন এটা মনে না করে যে তা ওদের জন্য ভাল বয়' এটা ওদের জন্য অকল্যাণকর, কিয়ামতের দিন সেই জিনিষের শৃঙ্খল ওদে গলায় পরানো হবে, যেটার সাথে কৃপণতা করেছিল। আর৹ফরমান, যেসব লোক সোনাচান্দি সঞ্চয় করে এবং ওগুলো আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা, ওদেরকে ভয়ানক আজাবের সুসংবাদ শুনায়ে দাও। যে দিন জাহান্নামের আগুনে জ্বালানো হবে এবং ওগুলো দ্বারা ওদের কপালে, দুপাশে এবং পিঠে দাগ দেয়া হবে এবং ওদেরকে বলা হবে–এটা ওটাই, যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে। তাই এখন সঞ্চয় করার স্বাদ গ্রহণ কর। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ফরমায়েছেন, যে সম্পদ বিনষ্ট হয়, তা যাকাত না দেয়ার কারণেই বিনষ্ট হয়ে থাকে। আরও ফরমান, যাকাত প্রদান করে নিজেদের সম্পদ সমূহকে মজবুত কিল্লাসমূহের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। নিজেদের রোগসমূহের চিকিৎসা সদকা দ্বারা কর এবং বলা মছীবত নাযিল হলে প্রার্থনা ও কান্না কাটি করে সাহায্য কামনা কর। আরও ফরমায়েছেন, আল্লাহ তাআলা চারটি জিনিষ ফরয করেছেন, যে ব্যক্তি ওগুলো থেকে তিনটি আদায় করে,

সেটা ওর কোন কাজে আসবে না যতক্ষণ পূর্ণচারটি আদায় না করে। ওই চারটি জিনিষ হচ্ছে, নামায যাকাত, রোযা ও হজ্ব। আরও ফরমায়েছেন, যে যাকাত না দেয়, ওর নামায কবুল হয় না।

(তবরানী আওসত, আবু দাউদ, ইমাম আহমদ, কবীর)

মাসআলাঃ যাকাত ফরয, এর অস্বীকারকারী কাফির এবং অনাদায়কারী ফাসিক ও কতলের উপযুক্ত আর আদায় করার বেলায় বিলম্বকারী গুনাহাগার ও সাক্ষ্যের অনুপযোগী। (আলমগীরী ও বাহার)

শরীয়তের পরিভাষায় যাকাত ওটাকে বলা হয়, আল্লাহর ওয়াস্তে কোন মুসলমান ফকীরকে সম্পদের শরীয়ত নির্ধারিত একটি অংশের মালিক বানিয়ে দেয়া।

মাসআলাঃ ভোগ করার অনুমতি দেয়ার দ্বারা যাকাত আদায় হবে না। যেমন ফকীরকে যাকাতের নিয়তে খাবার খাওয়ানো হলে যাকাত আদায় হবে না। কারণ এর দ্বারা মালিক বানিয়ে দেয়া হলো না। তবে যদি খাবার দিয়ে দেয়া হয় এবং ওর ইচ্ছে হলে খাবে বা নিয়ে যাবে, তাহলে আদায় হয়ে যাবে। অনুরূপ যাকাতের নিয়তে কাপড় দিয়ে দেয়া হলে আদায় হয়ে যাবে। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ মালিক করার জন্য এটাও প্রয়োজন যে এমন লোককে যাকাত দিবে, যে গ্রহণ করতে জানে, অর্থাৎ এমন কাউকে যেন দেয়া না হয়,যে ফেলে দিবে বা ধোঁকা খাবে, এ রকম হলে যাকাত আদায় হবে না। যেমন ছোট শিশু বা পাগলকে যাকাত দিলে আদায় হবে না। যে শিশুর গ্রহণ করার মত জ্ঞান না হয়, ওর পক্ষে ওর গরীব পিতা গ্রহণ করতে পারে বা সেই শিশুর জিম্মাদার বা সেই শিশুর লালন পালনকারী গ্রহণ করতে পারে। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে (১) মুসলমান হওয়া (২) বালেগ হওয়া (৩) বিবেকবান হওয়া (৪) আযাদ হওয়া (৫) নেছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া (৬) পূর্ণভাবে মালিক হওয়া (৭) নেছাব ঋণমুক্ত হওয়া (৮) নেছাব ব্যবহারিক সামগ্রী থেকে মুক্ত হওয়া (৯) সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া (১০) বছর অতিবাহিত হওয়া।

মাসআলাঃ কাফিরের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কোন কাফির মুসলম্যান হলে ওকে ওর কুফরী যুগের যাকাত আদায় করার নির্দেশ দেয়া যাবে না।

(সকল কিতাব দ্রষ্টব্য)

মাসআলাঃ নাবালেগের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

(হেদায়া ও অন্যান্য কিতাব)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ পাগলের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়, যদি পূর্ণ বছর পাগল অবস্থায় থাকে আর যদি বছরের প্রথম ও শেষে ভাল হয়ে যায়, তাহলে মাঝখাণে আরোগ্য না হলেও যাকাত ওয়াজিব। আর যদি বদ্ধ পাগল হয় অর্থাৎ পাগল অবস্থায় বালেগ রয়েছে, তাহলে ওর বছর গণনা জ্ঞান ফিরে আসার পর থেকে শুরু হবে। অনুরূপ সাময়িক পাগলও যদি পাগল অবস্থায় পূর্ণ বছর অতিবাহিত করে, তাহলে যখন আরোগ্য হবে, তখন থেকে বছর শুরু হবে। (জাওহেরা, আলমগীরী, রদ্দুল মুহতার ও বাহার)

মাসআলাঃ নেছাব থেকে কম পরিমাণ সম্পদের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ শরীয়ত যে পরিমাণ সম্পদ যাকাত আদায়ের জন্য নির্ধারিত করেছে, সেটা থেকে কম হলে যাকাত ওয়াজিব নয়।

মাসআলাঃ পূর্ণভাবে সম্পদের মালিক হওয়া চায় অর্থাৎ সম্পদের উপর কর্তৃত্ব থাকলেই যাকাত ওয়াজিব হবে, অন্যথায় নয়।

মাসআলাঃ যে সম্পদ হারানো গেল বা সমুদ্রে ডুবে গেল বা কেউ আত্মসাৎ করলো কিন্তু ওর কাছে আত্মসাতের কোন সাক্ষী নেই বা জঙ্গলে পুঁতে রেখেছিল, কিন্তু কোথায় পুঁতে রেখে ছিল স্মরণ নেই বা অপরিচিতের কাছে আমানত রেখেছিল কিন্তু ওকে স্মরণ নেই বা কর্জ গ্রহিতা কর্জের কথা অস্বীকার করলো, ওর কাছে কোন সাক্ষী নেই। পরে এ মাল পেয়ে গেল, তাহলে যত দিন পর্যন্ত এ মাল হস্তগত হয়নি, ততদিনের যাকাত ওয়াজিব নয়।

(দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ যদি কর্জ এমন লোককে দেয়া হয়েছে যে স্বীকার করে কিন্তু আদায় করতে দেরী করতেছে অথবা অপারগ বা কাযীর দরবারে ওর অক্ষমতার কথা প্রকাশ করছে বা কর্জ গ্রহিতা অস্বীকার করছে কিন্তু কর্জদাতার কাছে সাক্ষী মওজুদ আছে, তাহলে যখন মাল পাওয়া যাবে, তখন বিগত বছর সমূহের যাকাতও ওয়াজিব হবে। (তনবীর ও বাহার)

মাসআলাঃ বন্ধকী জিনিষের যাকাত, বন্ধক দাতা ও বন্ধক গ্রহিতা কারো উপর ওয়াজিব নয়। এবং বন্ধক ছাড় করার পরও বন্ধককালীন সময়ের যাকাত ওয়াজিব নয়। (দুর্রুল মুখতার, বাহার ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ নেছাবের মালিক বটে কিন্তু এতটুকু কর্জ রয়েছে যে কর্জ আদায় করার পর নেছাব থাকে না, তাহলে যাকাত ওয়াজিব নয়। এ কর্জ বান্দার হোক বা আল্লাহর যেমন কোন ব্যক্তি কেবল একটি নেছাবের মালিক এবং দু'বছর অতিবাহিত হয়ে গেল, যাকাত আদায় করেনি, তাহলে প্রথম বছরের যাকাত ওয়াজিব, দ্বিতীয় বছরের নয়, কারণ প্রথম বছরের যাকাত ওর উপর

কর্জ হিসেবে রয়ে গেল, যেটা বের করে ফেললে নেছাব পরিমাণ বাকী থাকে না, সুতরাং দ্বিতীয় বছরের যাকাত ওয়াজিব হলো না। (আলমগীরী ও রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ যে কর্জ মেয়াদী হয়ে থাকে, সেটা যাকাত প্রতিরোধক নয় (রদ্দুল মুহতার) মোহরের কর্জ সাধারণত দাবী করা হয় না। তাই স্বামীর উপর যতই মোহরের কর্জ থাকুক না কেন, যখন ওর নেছাব পরিমাণ মাল থাকে, যাকাত ওয়াজিব। (আলমগীরী ও বাহার)

মাসআলাঃ কর্জ ওই সময় যাকাত প্রতিরোধক যদি তা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার আগের হয়ে থাকে আর যদি নেছাব পরিমাণ সম্পদের উপর বছর অতিবাহিত হওয়ার পর কর্জ হয়ে থাকে, তাহলে যাকাতের উপর কর্জের কোন প্রতিক্রিয়া হবে না অর্থাৎ যাকাত দিতেই হবে। (রর্দুল মুহতার ও বাহার)

মাসআলাঃ যে মালটি মূল বা ব্যবহারিক সামগ্রীর আওতাধীন নয়, ওটার উপর যাকাত ওয়াজিব, যদি তা নেছাব পরিমাণ হয়ে থাকে। মূল ব্যবহারিক সামগ্রী অর্থাৎ জিন্দেগী যাপনের জন্য যেসব জিনিষের প্রয়োজন হয়, ওসবের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। যেমন বসবাস করার ঘর, শীত-গ্রীষ্মে পরিধান করার কাপড়, গৃহের আসবাব সামগ্রী, বাহনের জন্তু, খেদমতের বাঁদী-গোলাম, যুদ্ধের হাতিয়ার, পেশাদারদের হাতিয়ার, বিদ্বান লোকদের প্রয়োজনীয় কিতাব, খাদ্যশস্য। (হেদায়া, আলামগীরী রদ্দুল মুহতার) সার কথা হলো তিন প্রকার মালের উপর যাকাত প্রযোজ্য। (১) অলংকার অর্থাৎ সোনা চান্দি (২) ব্যবসায়িক সামগ্রী (৩) বিচরণকারী পশু অর্থাৎ চারণভূমিতে ছেড়ে দেয়া পশু।

(অধিকাংশ কিতাব দ্রষ্টব্য)

মাসআলাঃ মণিমুক্তার উপর যাকাত ওয়াজিব নয়, যদিওবা হাজার হাজার থাকে। তবে যদি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে রাখা হয়, তাহলে যাকাত ওয়াজিব।

(আলমগীরী দুর্রুল মুখতার ও বাহার)

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি নেছাবের মালিক, যদি বছরের মাঝখানে ওর আরও কিছু সম্পদ বৃদ্ধি পায়, তাহলে এ নতুন মালের বছর পৃথক হবে না বরং আগের মালের বছর সমাপ্তির সাথে ওটারও বছর সমাপ্তি হবে যদিওবা বছর পূর্ণ হবার এক মিনিট আগে নতুন সম্পদ অর্জন করে থাকে।

মাসআলাঃ যাকাত দেয়ার সময় বা যাকাতের জন্য মাল পৃথক করার সময় যাকাতের নিয়ত হওয়াটা প্রয়োজন। নিয়তের অর্থ হচ্ছে, যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে যেন বিনা চিন্তাভাবনায় বলতে পারে যে এটা যাকাতের মাল।

(আলমগীরী)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ সারা বছর দান খয়রাত করতে রইলো। এরপর নিয়ত করলো যে যা কিছু দান করা হয়েছে, তা যাকাত ।এ রকম নিয়ত করলে যাকাত আদায় হবে না। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ যাকাতের মাল হাতের উপর রেখেছিল, ফকীরেবা ছিনিয়ে নিয়ে গেল, তাহলে যাকাত আদায় হয়ে গেল। আর যদি হাত থেকে পড়ে গেল এবং একজন ফকীর তা উঠায়ে নিল, তাহলে যদি সে ওকে চিনে এবং রাজি হয়ে গেল আর মাল বিনষ্টও হয়নি, তাহলে আদায় হয়ে গেল। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ যাকাতের টাকা মৃত ব্যক্তির দাফন কাফনে ও মসজিদ নির্মাণে ব্যবহার করতে পারে না। কারণ সেখানে ফকীরকে মালিক করে দেয়া বুঝায় না। যদি ওসব ব্যাপারে খরচ করতে চায়, তাহলে এর নিয়ম হচ্ছে ফকীরকে মালিক করে দেয়া। পরে সে যেন ওসব কাজে খরচ করে। এতে উভয়ে ছওয়াব লাভ করবে। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যদি শত হাতে ছদকা বদল হয়, তাহলে সবাই দাতার মত ছওয়াব পাবে এবং ওর ছওয়াবে কোন কমতি হবে না। (রদ্দুল মুহতার, বাহার ও কাযী খাঁ)

মাসআলাঃ যাকাত দেয়ার সময় ফকীরকে যাকাত বলে দেয়ার প্রয়োজন নেই বরং কেবল যাকাতের নিয়তই যথেষ্ট। এমন কি অন্য কোন শব্দ বলে, যেমন হাদিয়া, শিশুদেরকে মিষ্টি খাওয়ানোর জন্য, ঈদ করার জন্য, বলে দিল এবং নিজে মনে মনে যাকাতের নিয়ত করলো, আদায় হয়ে যাবে। অনেক অভাবী লোক যাকাত নিতে চায় না। ওদেরকে যাকাত দিবার সময় যেন যাকাতের শব্দ ব্যবহার না করে। (বাহার) যদি নেছাবের অধিকারী অগ্রীম কয়েক নেছাবের যাকাত দিতে চায়, তাহলে দিতে পারে অর্থাৎ বছরের শুরুতে এক নেছাবের মালিক ছিল কিন্তু দু'তিন নেছাবের যাকাত দিয়া দিল। বছর শেষে যত নেছাবের যাকাত দিয়ে ছিল, তত নেছাবের মালিক হয়ে গেল, তাহলে সবের যাকাত আদায় হয়ে গেল আর যদি সারা বছর এক নেছাবেরই মালিক রইলো এবং বছরের পর আরও অধিক মাল লাভ করলো, তাহলে পরবর্তী গুলোর হিসেব হবে না। (আলমগীরী ও বাহার)

মাসআলাঃ এক হাজারের মালিক কিন্তু দু'হাজারের যাকাত দিয়ে দিল এবং নিয়ত করলো যে বছরের মধ্যে আর এক হাজার হয়ে গেলে এটা সেটার যাকাত। তা নাহলে পরবর্তী বছরের হিসেবে ধরা হবে, তাহলে এটা জায়েয।

(আলমগীরী ও বাহার)

মাসআলাঃ যদি যাকাত দিয়েছে কিনা সন্দেহ হয়, তাহলে পুনরায় দিয়ে দিবে।

(আলমগীরী, রদ্দুল মুহতার সেরাজিয়া ও বাহারুর রায়েক)

সোনা চান্দি ও বাণিজ্যিক মালামালের যাকাতের বর্ণনা

সোনার নেছাব হচ্ছে বিশ মিছকাল অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা এবং চান্দির নেছাব হচ্ছে দু'শ দেরহাম অর্থাৎ সাড়ে বায়ান্ন তোলা। সোনা– চান্দির যাকাতে ওজনই ধর্তব্য, মূল্য নয়। যেমন সাত তোলা সোনা বা এর কম ওজনের অলংকার বা বরতন তৈরী করা হলে কারিগরী খরচের কারণে দু'শ দেরহাম থেকে অধিক হয়ে যায়। আজকাল সাড়ে সাত তোলা সোনার মূল্য চান্দির কয়েক নেছাবের সমতূল্য হবে। মোট কথা ওজনে যদি নেছাব পরিমাণ না হয়, তাহলে যাকাত ওয়াজিব নয়, মূল্য যা হোক না কেন। অনুরূপ সোনার যাকাত সোনা দ্বারা এবং চান্দির যাকাত চান্দি দ্বারা যদি দেয়া হয়, তাহলে ওটার মূল্য নয়, বরং ওজনই বিবেচ্য। যদিওবা কারিগরী খরচের কারণে এর মূল্য বৃদ্ধি পায়। মনে করুন, চান্দির বাজারদর দশ আনা ভরি (তোলা) এবং যাকাত বাবত একভরি ওজনের একটি চান্দির টাকা দিল যা ষোল আনা সমতুল্য। কিন্তু যাকাতের বেলায় এক ভরি তথা দশ আনাই ধরা হবে, টাকার মূল্য মান হিসেবে অতিরিক্ত ছয় আনার কোন হিসেব হবে না। (দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার ও বাহার)

মাসআলাঃ ইতিপূর্বে যে বলা হয়েছে, যাকাত আদায়ের ব্যাপারে মূল্য ধর্তব্য নয়, এটা ওই অবস্থায় যখন কোন জিনিষের যাকাত সেই জিনিষ দ্বারা আদায় করা হয়। যদি সোনার যাকাত চান্দি দ্বারা এবং চান্দির যাকাত সোনা দ্বারা আদায় করা হয়, তখন মূল্যই বিবেচ্য হবে। যেমন সোনার যাকাতে চান্দির কোন জিনিষ দেয়া হলো, যার মূল্য এক স্বর্ণমুদ্রা, তাহলে এক স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করা হয়েছে বলে ধরা হবে, যদিওবা ওই জিনিষের চান্দি পনের টাকা বরাবরও না হয়। (রদ্দুল মুহতার বাহার)

মাসআলাঃ সোনা চান্দি যখন নেছাব পরিমাণ হয়, তখন ওসবের যাকাত ওগুলোর একচল্লিশাংশ। ওগুলো এমনিই হোক বা ওসবের মুদ্রা যেমন চান্দির টাকা বা সোনার আশরফী বা ওগুলো দ্বারা কোনকিছু তৈরীকৃত হোক যেমন অলংকার, বরতন, ঘড়ি, সুরমাদানি মোটকথা যে রকম থাকুক না কেন, জাকাত ওয়াজিব। উদাহরণ স্বরূপ সাড়ে সাত তোলা সোনা আছে, তাহলে সোয়া দু মাশা (এক চল্লিশাংশ) যাকাত ওয়াজিব বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা চান্দি আছে, তাহলে এক তোলা তিন মাশা ছয় রতি যাকাত ওয়াজিব। (দুর্রুল মুখতার ও বাহার)

মাসআলাঃ সোনা চান্দি ব্যতীত ব্যবসার কোন জিনিষ আছে, যার মূল্য যদি সোনা চান্দির নেছাব পরিমাণ হয়, তাহলে সেটার উপরও যাকাত ওয়াজিব অর্থাৎ ওই জিনিসের মূল্যের চল্লিশভাগের একাংশ আর যদি ব্যবসায় জিনিষের মূল্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

নেছাব পরিমাণ না হয় কিন্তু ওর কাছে ব্যবসায় জিনিষ ছাড়া সোনা চান্দিও আছে, তাহলে ব্যবসার জিনিষ ও সোনা চান্দি মিলে যদি নেছাব পরিমাণ হয়, তাহলে যাকাত ওয়াজিব। আর ব্যবসার জিনিষের মূল্য ওই মুদ্রা দ্বারা নির্ধারণ করবে, যেটার প্রচলন বেশী। যেমন হিন্দুস্থানে চান্দির টাকার প্রচলনটা বেশী। তাই এখানে সেটা দ্বারা মূল্য নির্ধারণ করবে। যদি কোন জায়গায় সোনাচান্দির মুদ্রার সমান প্রচলন থাকে, তাহলে যে কোন একটা দ্বারা মূল্য নির্ধারণ করা যাবে, কিন্তু যদি টাকা দ্বারা মূল্য নির্ধারণ করলে নেছাব পরিমাণ হয় না অথচ আশরফী (স্বর্ণমুদ্রা) দ্বারা মূল্য নির্ধারণ করলে নেছাব পরিমাণ হয়ে যায় অথবা আশরফী দ্বারা হয় না অথচ টাকা দ্বারা হয়ে যায়, তাহলে যেটা দ্বারা নেছাব পূর্ণ হবে, সেটা দ্বারা মূল্য নির্ধারণ করা হবে। আর যদি উভয় দ্বারা নেছাব পরিমাণ হয়ে যায়, কিন্তু একটাতে নেছাব ছাড়াও নেছাবের এক পঞ্চমাংশ অতিরিক্ত হয়, তাহলে সেটা দ্বারাই মূল্য নির্ধারণ করবে যেটার হিসেবে নেছাব ছাড়া নেছাবের একপঞ্চমাংশ অতিরিক্ত হয়। (দুর্রুল মুখতার ও বাহার)

মাসআলাঃ যদি নেছাবের অতিরিক্ত জিনিষ থাকে এবং তা নেছাবের এক পঞ্চমাংশ হয়ে থাকে, তাহলে ওটার যাকাত ওয়াজিব। উদাহরণস্বরূপ কারো কাছে ৬৩ তোলা চান্দি আছে, তাহলে ১ তোলা ৬ মাশা ৭$\frac{১}{৫}$ রত্তি যাকাত ওয়াজিব। অর্থাৎ সাড়ে বায়ান্ন তোলার পর প্রতি সাড়ে ১০ তোলায় ৩ মাশা ১$\frac{১}{৫}$ রত্তি বৃদ্ধি করা হবে। অনুরূপ সোনা যদি ৯ তোলা থাকে তাহলে ২ মাশা ৫$\frac{৩}{৫}$ রত্তি যাকাত ওয়াজিব অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলার পর প্রতি দেড় তোলায় ৩$\frac{৩}{৫}$ রত্তি বৃদ্ধি করা হবে। তবে এক পঞ্চমাংশের কম হলে মাফ অর্থাৎ সোনা ৯ তোলা থেকে যদি এক রত্তিও কম হয়, তালে যাকাত কেবল সাড়ে সাত তোলারই ওয়াজিব অর্থাৎ সোয়া ২ মাশা যাকাত দিতে হবে বাকী এক রতি কম দেড় তোলার যাকাত মাফ। অনুরূপ চান্দি যদি ৬৩ তোলা থেকে এক রত্তিও কম হয়, তাহলে যাকাত শুধু সাড়ে বায়ান্ন তোলারই দিতে হবে অর্থাৎ ১ তোলা ৩ মাশা ৬ রত্তি দিতে হবে এবং বাকী এক রত্তি কম সাড়ে দশ তোলার যাকাত মাফ। অনুরূপ ব্যবসার মালামালেরও একই হুকুম।

(দুর্রুল মুখতার, আলমগীরী ও কাযী খান)

মাসআলাঃ কারো কাছে, সোনাও আছে চান্দিও আছে এবং উভয়টা নেছাব পরিমাণ আছে, তাহলে সোনাকে চান্দি ও চান্দিকে সোনা ধার্য করে যাকাত

আদায় করা প্রয়োজন নেই। বরং প্রত্যেকের যাকাত আলাদা আলাদা প্রদান করা ওয়াজিব। তবে যাকাত দাতা উভয় নেছাবের যাকাত একই জিনিষ দ্বারা আদায় করতে চাইলে আদায় করতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মূল্য ওটা ধার্য করা ওয়াজিব হবে, যেটায় ফকীরেরা লাভবান হয়। যেমন হিন্দুস্থানে আশরফী থেকে চান্দির টাকার প্রচলন বেশী, তাই সোনার মূল্য চান্দির দ্বারা নির্ধারণ করে চান্দি যাকাত দিবে।

মাসআলাঃ সোনাও আছে চান্দিও আছে কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোনটাই নেছাব বরাবর নেই। তাহলে সোনার মূল্যকে চান্দির সাথে মিলাবে বা চান্দির মূল্যকে সোনার সাথে মিলাবে। মিলানোর পরও যদি নেছাব পরিমান না হয়, তাহলে কোন যাকাত নেই। আর যদি সোনার মূল্য চান্দির সাথে মিলালে নেছাব পরিমাণ হয়ে যায় আর চান্দির মূল্য সোনার সাথে মিলালে নেছাব পরিমাণ হয়না বা এর বিপরীত হয়, তাহলে যেটাতে নেছাব পূর্ণ হবে, সেটাই করা ওয়াজিব। আর যদি উভয় ক্ষেত্রে নেছাব পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে যেটা ইচ্ছে সেটা করবে। কিন্তু যদি একটি ক্ষেত্রে নেছাবের অতিরিক্ত এক পঞ্চমাংশ বৃদ্ধি পায়, তাহলে সেটাই গ্রহণ করা ওয়াজিব। যেমন সোয়া ছাব্বিশ তোলা চান্দি আছে এবং পৌনে চার তোলা সোনা আছে। যদি পৌনে চার তোলা সোনার মূল্য সোয়া ছাব্বিশ তোলা চান্দির সাথে মিলানো হয় বা সোয়া ছাব্বিশ তোলা চান্দির মূল্য পৌনে চার তোলা সোনার সাথে মিলানো হয়, তাহলে চান্দিকে সোনা বা সোনাকে চান্দি হিসেবে ধরা যায়। আর যদি পৌনে চার তোলা সোনার পরিবর্তে ৩৭ তোলা চান্দি পাওয়া যায়, কিন্তু সোয়া ছাব্বিশ তোলা চান্দি দ্বারা পৌনে চার তোলা সোনা পাওয়া না যায়, তাহলে সোনাকে চান্দি হিসেবে ধার্য করা ওয়াজিব। কারণ এ ক্ষেত্রে নেছাব পূর্ণ হয়ে যায় বরং এক পঞ্চমাংশ অতিরিক্ত হয়ে থাকে, অথচ অন্য ক্ষেত্রে নেছাবও পূর্ণ হয়না। অনুরূপ যদি প্রত্যেক নেছাবে কিছু অতিরিক্ত হয় এবং অতিরিক্তটা নেছাবের এক পঞ্চমাংশ হয়, তাহলে ওটারও যাকাত দিতে হবে। আর যদি প্রত্যেক নেছাবের এক পঞ্চমাংশের কম অতিরিক্ত থাকে, তাহলে উভয়টা মিলানোর পরও কোনটার এক পঞ্চমাংশ নেছাবের বরাবর না হয়, তাহলে এর যাকাত দিতে হবে না। আর যদি উভয় মিলে নেছাব বা নেছাবের এক পঞ্চমাংশ হয়, তাহলে যে কোন একটা করার ইখতিয়ার রয়েছে। তবে যদি একটাতে নেছাব পরিমাণ হয় এবং অন্যটাতে এক পঞ্চমাংশ হয়, তাহলে সেটাই গ্রহণ করবে, যেটাতে নেছাব পরিমাণ হয়ে থাকে। যদি একটাতে নেছাব বা এক পঞ্চমাংশ হয়ে থাকে এবং অন্য ক্ষেত্রে কোনটা হয় না, তখন ওটা করা ওয়াজিব, যেটাতে নেছাব পরিমাণ হয় বা এক পঞ্চমাংশ হয়ে থাকে।

(দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার ও বাহার)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ সোনা চান্দির পয়সা যদি চালু থাকে এবং সাড়ে বায়ান্ন তোলা চান্দি বা সাড়ে সাত তোলা সোনার মুল্য বরাবর থাকে, তাহলে যাকাত ওয়াজিব আর যদি অচল হয়ে যায়, তাহলে ব্যবসার জন্য না হয়ে থাকলে যাকাত ওয়াজিব নয়। (ফতওয়ায়ে কারীউল হেদায়া ও বাহার)

মাসআলাঃ কাগজের টাকারও যাকাত ওয়াজিব, যত দিন এটা প্রচলিত ও চালু থাকে। এটাও পারিভাষিক মুদ্রা এবং এটার হুকুমও পয়সার অনুরূপ (বাহার) অর্থাৎ সাড়ে বায়ান্ন তোলা চান্দি বা সাড়ে সাত তোলা সোনার মুল্য বরাবর কাগজের নোটের উপর যাকাত ওয়াজিব এবং ইতোপূর্বে উল্লেখিত সোনা চান্দির হিসেব মতে যাকাত প্রদান করতে হবে।

মাসআলাঃ ব্যবসার মালামালের ক্ষেত্রে বছর অতিবাহিত হওয়ার পর যা মূল্য নির্ধারণ হবে, সে হিসেবে যাকাত দিতে হবে। তবে শর্ত হচ্ছে যে বছরের শুরুতে ওটার মূল্য যেন দুশত দিরহামের (রৌপ্য মুদ্রা) কম না হয়।

মাসআলাঃ ভাড়া দেয়ার মত ডেকসী সমূহের যাকাত নেই। অনুরূপ ভাড়া দেয়ার জন্য ঘর থাকলে সেটারও যাকাত নেই। (আলমগীরী, কাযী খান)

চারণ ভূমিতে খোলামেলা অবস্থায় পালিত পশুর যাকাত

তিন প্রকারের পশুর উপর যাকাত ওয়াজিব, যদি সায়েমা হয়। এ তিন প্রকার পশুগুলো হচ্ছে, উট, গরু ও ছাগল। সায়েমা ওই পশুকে বলা হয়, যেটা বছরের অধিকাংশ সময় চারণভূমিতে থাকে এবং এর থেকে একমাত্র দুধ বা বাচুর কাম্য করা হয়, বা মোটা তাজা করা উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। (তনবীর ও বাহার) যদি গৃহপালিত হয় বা বোঝা বহন, হালচাষ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তাহলে সেটা যদিওবা চারণ ভূমিতে থাকে সায়েমা নয় এবং ওটার উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। অনুরূপ যদি মাংস খাওয়া উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তখনও সায়েমা হিসেবে গণ্য হবে না, যদিওবা জংগলে থাকে আর যদি ব্যবসার পশু চারণভূমিতে রাখা হয়, সেটাও সায়েমা হিসেবে গণ্য হবে না বরং ও সবের যাকাত মূল্য ধার্য করে আদায় করতে হবে। (দুর্রুল মুখতার রদ্দুল মুহতার)

উটের যাকাতঃ পাঁচ উটের কমে যাকাত ওয়াজিব নয়। যদি পাঁচ বা পাঁচের অধিক থাকে কিন্তু পঁচিশের কম, তাহলে প্রতি পাঁচে একটি ছাগল ওয়াজিব অর্থাৎ পাঁচ হলে একটি ছাগল, দশ হলে দুটি ছাগল, এ হিসেবে দিতে হবে। (হেদায়া দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ যাকাতে যে ছাগল দেয়া হবে, সেটা যেন এক বছরের কম না হয়। ছাগল, ছাগী যেটা ইচ্ছে, দেয়া যায়। (রেদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ দু'নেছাবের মাঝখানে যা থাকে সেটা মাফ অর্থাৎ ওসবের কোন যাকাত নেই। যেমন সাত আটটি উট থাকলেও সেই একটি ছাগলই যথেষ্ট।

মাসআলাঃ পঁচিশটি উট থাকলে এক বছরের অধিক বয়সের একটি উষ্ঠী দিতে হবে। পয়ত্রিশ পর্যন্ত একই হুকুম অর্থাৎ একটি উষ্টীই দিতে হবে।

ছত্রিশ থেকে পয়তাল্লিশ উটের জন্য দু'বছরের অধিক বয়সের একটি উষ্টা দিতে হবে। ছিয়াল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত উটের জন্য তিন বছরের অধিক বয়সের একটি উষ্ঠী, একষট্টি থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত উটের জন্য চার বছরের অধিক বয়সের একটি উষ্ঠী, ছিয়াত্তর থেকে নব্বই পর্যন্ত উটের জন্য, দুই বছরের অধিক বয়সের দুটি উষ্ঠী, একানব্বই থেকে একশ বিশ পর্যন্ত উটের জন্য, তিন বছরের অধিক বয়সের দুটি উষ্ঠী। এরপর একশ পয়তাল্লিশ পর্যন্ত দুটি তিন বছরের অধিক বয়সের উষ্ঠী এবং প্রতি পাঁচে একটি ছাগল যেমন একশ পঁচিশে দুটি তিন বছরের অধিক বয়সের উষ্ঠী ও একটি ছাগল এবং একশ ত্রিশটি উটের জন্য দুটি তিন বছরের অধিক বয়সের উষ্ঠী ও দুটি ছাগল এ হিসেবে দিতে হবে। অতপর একশ পঞ্চাশটি উটের জন্য তিন বছরের অধিক বয়সের তিনটি উষ্ঠী দিতে হবে। যদি এর থেকে অধিক থাকে, তাহলে ওরকমই করবে, যেভাবে শুরুতে নির্ধারিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি পাঁচে একটি ছাগল, পচিশে একটি এক বছরের অধিক বয়সী উষ্ঠী, ছত্রিশে দু'বছরের অধিক বয়সী একটি উষ্ঠী। এ পর্যন্ত ছিয়াশি বরং একশ পচানব্বই পর্যন্ত উটের যাকাতের হিসেব হয়ে গেল। অর্থাৎ তিনটি তিন বছরের অধিক বয়সী উষ্ঠী ও একটি দু'বছরের অধিক বয়সের উষ্ঠী দিতে হবে। অতপর একশ ছিয়ানব্বই থেকে দু'শ পর্যন্ত উটের জন্য চারটি তিন বছরের অধিক বয়সী উষ্ঠী অথবা পাঁচটি দুবছরের অধিক বয়সের উষ্ঠীই। দু'শতের পর সেই নিয়মে দিতে হবে, যেভাবে একশ পঞ্চাশের পর দেয়ার জন্য বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ প্রতি পাঁচে একটি ছাগল, পঁচিশে একটি এক বছরের অধিক বয়সের একটি উষ্ঠী, এরপর দুশত ছিয়াল্লিশ থেকে দুশ পঞ্চাশ পর্যন্ত পাঁচটি তিন বছরের অধিক বয়সী উষ্ঠী দিতে হবে। এ হিসেবে পরবর্তীগুলোর যাকাত দিতে হবে। (প্রায় কিতাব

মাসআলাঃ উটের যাকাত বাবত যে উটের বাচুর দেয়া হয়, সেটা নিশ্চয় মাদী হতে হবে। নর হলে মাদী সমমূল্য মান হতে হবে, অন্যথায় অগ্রাহ্য করা যাবে।

গরু মহিষের যাকাত

মাসআলাঃ ত্রিশের কম গরু হলে যাকাত ওয়াজিব নয়। যদি ত্রিশ পূর্ণ হয়, তাহলে ও সবের যাকাত হবে এক বছর বয়সী একটি নর বাচুর বা একটি মাদী বাচুর। চল্লিশ হলে একটি দুবছর বয়সী নর বাচুর বা মাদী বাচুর। উনষাট পর্যন্ত একই হুকুম। ষাট হলে দুটি একবছর বয়সী নর বাচুর বা মাদী বাছুর এবং প্রতি চল্লিশে প্রতি ত্রিশে একটি এক বছর বয়সী নর বাচুর বা মাদী বাছুর এবং প্রতি চল্লিশে

pdf By Syed Mostafa Sakib

একটি দুবছর বয়সী নরবাচুর বা মাদী বাচুর। যেমন সত্তরে একটি দুবছর বয়সী বাচুর ও একটি এক বছর বয়সী বাচুর এবং আশিতে দুটি দুবছর বয়সী বাচুর। এ হিসেবে দিতে হবে। (প্রায় কিতাব দ্রষ্টব্য)।

মাসআলাঃ গরু ও মহিষের একই হুকুম। যদি উভয়টা থাকে, তাহলে উভয়টা এক সাথে হিসেব করলে যদি ত্রিশ হয়, তাহলে যাকাত দিতে হবে এবং যাকাতে ওটার বাচুরই নিতে হবে, যেটার সংখ্যা অধিক। অর্থাৎ গরু যদি অধিক হয়, তাহলে গরুর বাচুর আর যদি মহিষের সংখ্যা বেশী হয়, তাহলে মহিষের বাচুর আর যদি উভয়টার সংখ্যা বরাবর হয়, তাহলে ওই বাচুরটা নেয়া হবে, যেটা মাধ্যম আকৃতির। (আলমগীরী)

ভেড়া ছাগলের যাকাতঃ চল্লিশের কম হলে ভেড়া–ছাগলের কোন যাকাত নেই। চল্লিশ হলে একটি ছাগল এবং এ হুকুম একশ বিশ পর্যন্ত অর্থাৎ একশ বিশ পর্যন্ত একটি ছাগল। এবং একশ একুশে দুটি ছাগল, দুশত একে তিনটি ছাগল এবং চারশতে চারটি ছাগল। অতপর প্রতি শতে একটি ছাগল এবং দু'নেছাবের মাঝখানে যা থাকে, ওসবের যাকাত মাফ। (প্রায় কিতাব দ্রষ্টব্য)

মাসআলাঃ ভেড়া, দুম্বা ছাগলের অন্তর্ভূক্ত। তাই এক প্রকারের দ্বারা নেছাব পূর্ণ না হলে অন্য প্রকারের সাথে একত্রিত করা যাবে এবং যাকাত হিসেবে ভেড়া দুম্বাও দেয়া যাবে।তবে এক বছরের কম বয়সী যেন না হয় (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ কারো কাছে উট, গরু, ছাগল সব আছে কিন্তু কোনটা নেছাব পূর্ণ নয়, তাহলে নেছাব পূর্ণ করার জন্য ওগুলোকে একত্রিত করা যাবে না এবং যাকাতও ওয়াজিব হবে না। (দুর্রুল মুখতার ও বাহার)

মাসআলাঃ ঘোড়া, গাধা খচ্চর যদিওবা চারণভূমিতে থাকে, ওগুলোর যাকাত নেই। তবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে হলে ওসবের মুল্য নির্ধারণ করে এক চল্লিশাংশ যাকাত হিসেবে দিতে হবে। (দুর্রুল মুখতার)

কৃষিদ্রব্য ও ফলসমুহের যাকাতের বর্ণনা

রসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহ তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) ফরমায়েছেন, যে জমীনকে আসমান ও ঝর্ণাসমূহ উর্বর করেছে বা জমীন উশরী হলে অর্থাৎ নদীর পানি দ্বারা উর্বর হলে দশমাংশ (উৎপন্ন দ্রব্যের দশমাংশ) আর যে জমীনকে উর্বর করার জন্য পশুর দ্বারা পানি আনা হয়, যেখানে দশমাংশের অর্ধেক (অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যের বিশাংশ) বুখারী ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ যেসব ক্ষেত খামার বৃষ্টি বা নদীনালার পানি দ্বারা উর্বর করা হয়, সে ক্ষেত্রে দশমাংশ অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যের দশমাংশ ওয়াজিব এবং যে ক্ষেত্রে

জলসিঞ্চন সেচন যন্ত্র বা বালতি দ্বারা করতে হয়, সে ক্ষেত্রে অর্ধউশর অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যের বিশাংশ ওয়াজিব। আর যদি ক্ষেত কিছুদিন বৃষ্টির পানি দ্বারা এবং কিছুদিন সেচনযন্ত্র বা বালতি দ্বারা সিক্ত করা হয়, তাহলে যদি বৃষ্টি পানির সাহায্য বেশী নেয়া হয় এবং মাঝেমধ্যে বালতি বা সেচ যন্ত্রের সাহায্যে পানি দেয়া হয়, তাহলে দশমাংশ ওয়াজিব, অন্যথায় দশমাংশের অর্ধেক। দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ যে জমি নগদ টাকা নিয়ে কৃষি কাজের জন্য দেয়া হয়, সেটার উশর (দশমাংশ) কৃষকের উপর। (রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ উশরী জমি যদি বর্গা হিসেবে দেয়া হয়, তাহলে উশর (দশমাংশ) উভয়ের উপর আর যদি খরাজী জমি বর্গার উপর দেয়া হয়, তাহলে খরাজ (খাজনা) মালিকের উপর (রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ জমি তিন প্রকার (১) উশরী (২) খরাজী (৩) উশরীও নয়, খরাজীও নয়। খরাজী জমীনে খরাজ দেয়া ওয়াজিব এবং উশরী জমীন এবং যেটা উশরীও নয়, খরাজী নয় এ দু প্রকারের জমির ক্ষেত্রে ওশর দেয়া ওয়াজিব। উশরী জমি ওটাই, যেটাতে উশর দেয়া ওয়াজিব হয় অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যের দশমাংশ এবং খারাজী জমি হচ্ছে ওটাই, যেটার বেলায় খরাজ (খাজনা) দেয়াটা ওয়াজিব হয় অর্থাৎ অতটুকু দেয়া ওয়াজিব বা ইসলামী শাসক নির্ধারন করে। যেটা উৎপন্ন দ্রব্য থেকে নির্ধারণ করতে পারে যেমন এক চতুর্থাংশ বা এক তৃতীয়াংশ অথবা নগদ টাকাও নির্ধারণ করতে পারে যেমন বিঘা প্রতি দশ বা বিশ টাকা বা আরও কিছু অধিক যেমন হযরত উমর (রাদি আল্লাহ তাআলা আনহু) নির্ধারণ করেছিলেন।

মাসআলাঃ যদি জানা যায় যে ইসলামী রাজত্বে এতটুকু খরাজ (খাজনা) নির্ধারণ ছিল, তাহলে সেটাই প্রদান করবে, যদি তা ওই পরিমাণ থেকে বেশী না হয়, যা হযরত উমর ফারুক (রাদি আল্লাহ তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, আর যেক্ষেত্রে বর্ণিত নেই, যেটার বেলায় যেন অর্ধেক থেকে বেশী না হয় এবং এটাও শর্ত যে জমীনের যেন অতটুকু উৎপন্ন করার উর্বরা শক্তিও থাকে। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ ইসলামী রাজত্বে কতটুকু নির্ধারিত ছিল যদি তা জানা না থাকে, তাহলে হযরত উমর যা নির্ধারণ করেছিল, তাই দিবে। আর যদি হযরত উমরের নির্ধারিতটাও জানা না থাকে, তাহলে অর্ধেক দেবে। (ফতওয়ায়ে রেজভীয়া)

মাসআলাঃ যেখানে ইসলামী রাজত্ব নেই, ওখানকার লোকেরা নিজেরাই ফকীর ইত্যাদিদেরকে যারা খরাজের হকদার, দিয়া দিবে। (বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ হিন্দুস্থানে মুসলমানদের জমিসমুহ খরাজী মনে করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন নির্দিষ্ট জমি খরাজী হওয়াটা শরয়ী দলীল দ্বারা প্রমানিত না হয়। (বাহারে শরীয়ত)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ উশর ওয়াজিব হওয়ার বেলায় বিবেকবান বালেগ হওয়া শর্ত নয়, পাগল ও নাবালেগের জমীনে যা কিছু উৎপন্ন হয়, ওটাতেও উশর (দশমাংশ) ওয়াজিব। (আলমগীরী ও বাহার)

মাসআলাঃ যার উপর উশর ওয়াজিব হলো, সে মারা গেল কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্য মওজুদ আছে, তাহলে ওটা থেকে উশর (দশমাংশ) নেয়া হবে।(আলমগীরী ও বাহার)

মাসআলাঃ উশরের বেলায় বছর অতিবাহিত হওয়াও শর্ত নয় বরং একটি জমীনে বছরে যদি কয়েকবার শস্য উৎপন্ন হয়, তাহলে প্রত্যেক বার উশর (দশমাংশ) ওয়াজিব। (দুর্রুল মুখতাও ও রর্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ উশরে নেছাব শর্ত নয়। উৎপন্ন দ্রব্য যদি এক কেজিও হয়, উশর ওয়াজিব। (দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ উশরী জমীনে বা পাহাড় বা জংগলে মধু পাওয়া গেল, তাহলে সেটার বেলায়ও উশর ওয়াজিব। অনুরূপ পাহাড় জংগলের ফলসমূহের বেলায়ও উশর ওয়াজিব, যদি ইসলামী শাসক কাফির, ডাকাত ও বিদ্রোহীদের থেকে এগুলোকে হেফাজত করে, অন্যথায় ওয়াজিব নয়।(দুর্রুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ গম, জব, ধান এবং সব রকমের শস্য, আখরোট, বাদাম এবং সব রকমের ফল, তুলা ইক্ষু, তরমুজ বাঙ্গী কিরা শসা সব রকমের তরকারী ইত্যাদির উপর উশর ওয়াজিব, কম উৎপন্ন হোক বা বেশী।(আলমগীরী ও বাহার)

মাসআলাঃ বাড়ীর আঙ্গিনায় বা কবর স্থানে যা উৎপন্ন হয়, ওগুলোতে উশরও নেই, খরাজও নেই। (দুর্রুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ মুসলমান নিজের ঘরভিটাকে বাগান করে নিল, তাহলে এতে যদি উশরী পানি দেয়া হয়, তাহলে উশরী আর যদি খরাজী পানি দেয়া হয়, তাহলে খরাজ আর যদি উভয় প্রকারের পানি দেয়া হয়, তাহলে তখনও উশর দিতে হবে।

যদি কোন জিম্মি স্বীয় ঘরের আঙ্গিনায় বাগান করলো, তাহলে যে কোন অবস্থায় খরাজ নেয়া হবে। আসমান, কুপ, ঝর্ণা ও সমুদ্রের পানি হচ্ছে উশরী পানি এবং অনারবীগণ যে খাল খনন করেছে, ওটার পানি হচ্ছে খরাজী পানি। কাফিরেরা কুপ খনন করেছিল কিন্তু এখন তা মুসলমানদের কবজায় এসে গেল বা খরাজী জমীনে কুপ খনন করা হলো, ওটার পানিও খরাজী।(আলমগীরী ও দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ জমীন উশরী হওয়ার অনেক প্রেক্ষাপট রয়েছে। যেমন মুসলমানগণ জয় করলো এবং জমীন মুজাহিদগণের মধ্যে বন্টন হয়ে গেল বা ওখানকার লোক আপনা আপনি মুসলমান হয়ে গেল। যুদ্ধের প্রয়োজন হয়নি বা উশরী জমীনের পাশে পরিত্যক্ত জমীন ছিল, যেটা চাষের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে বা ওই

ক্ষেতকে উশরী পানি দ্বারা সিক্ত করা হয়েছে এসব প্রেক্ষাপটে জমীন উশরী হয়ে যায়। আরও অনেক প্রেক্ষাপট আছে, যা বড় বড় কিতাবে উল্লেখিত আছে।

মাসআলাঃ জমীন খরাজী হওয়ারও অনেক প্রেক্ষাপট রয়েছে, যেমন. মুসলমানগণ জয় করে ওখানকার অধিকারীদেরকে ইহসান স্বরূপ দিয়া দিন বা অন্য কাফিরদেরকে দিয়া দিল বা সেই দেশটা আপোষের মাধ্যমে জয় হলো বা কোন জিম্মি লোক মুসলমান থেকে উশরী জমি ক্রয় করে নিল বা জমীন খরাজী পানি দ্বারা সিক্ত করা হলো, এ সব প্রেক্ষাপটে জমীন খরাজী হয়ে যায়। এ ছাড়া আরও অনেক প্রেক্ষাপট রয়েছে।

মাসআলাঃ খরাজী জমীন উশরী পানি দ্বারা সিক্ত করা হলে খরাজী থাকবে।

মাসআলাঃ ওই জমীন, যেটা খরাজীও নয়। উশরীও নয়, এর উদাহরণ হচ্ছে মুসলমানগণ জয় করে নিজেদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত বাকী রাখলো বা জমীনের মালিক মারা গেল এবং জমীন বায়তুল মালের (সরকারী কোষাগার) অধীনে হয়ে গেল, এসব অবস্থায় জমীন উশরীও নয়,খরাজীও নয়।

মাসআলাঃ সরকারকে যে খাজনা দেয়া হয়। এর দ্বারা খরাজে শরয়ী আদায় হয় না। বরং সেটা মালিকের জিম্মায়। এটা আদায় করা প্রয়োজন। খরাজের হকদার শুধু ইসলামী ফৌজ নয় বরং সাধারণ মুসলমানদের সমস্ত কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা যায়.যেমন মসজিদ নির্মাণ, মসজিদের ব্যয় ভার বহন, ইমাম, মুয়াযযিনের বেতন প্রদান দ্বীনি শিক্ষার শিক্ষক, দ্বীনি ছাত্রদের রক্ষণাবেক্ষণ, উলামায়ে আহলে সুন্নাতের খেদমতে ব্যয় করা, যারা ওয়াজ নসীহত করে, দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেয় এবং ফত্ওয়ার কাজে নিয়োজিত থাকে। পুল, মুসাফির খানা তৈরীর জন্যও ব্যয় করা যায়। (ফত্ওয়ারে রেজভীয়া)।

যাকাত কোন্ ধরণের লোকদেরকে দেয়া যায়

মাসআলাঃ সাত ধরণের লোক যাকাতের হকদার ফকীর, মিসকীন, যাকাত উছুলকারক, মুক্তিপণের শর্ত যুক্ত গোলাম, কর্জগ্রস্থ ব্যক্তি, আল্লাহর রাস্তা এবং মুসাফির।

মাসআলাঃ ফকীর ও ধরনের লোককে বলা হয়, যার কাছে কিছু আছে কিন্তু নেছাব পরিমাণ নয় বা নেছাব পরিমাণ আছে, কিন্তু মূল ব্যবহারিক জিনিষ সহ (যেমন থাকার ঘর, পরিধানের কাপড়, খেদমতের বাঁদী-গোলাম, পেশার হাতিয়ার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিষ। এগুলো যতই মূল্যবান হোক না কেন বা এতটুকু কর্জ রয়েছে যে ওগুলো দিয়ে ফেললে নেছাব পরিমান থাকে না। এসব

pdf By Syed Mostafa Sakib

জিনিষ থাকলে এবং নেছাবের অধিক হলেও ফকীর হিসেবে গণ্য)। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ মিসকীন হচ্ছে যার কাছে কিছুই নেই, এমনকি খাবার, শরীর ঢাকার জন্য কাপড়ের অভাব বোধ করে, মানুষের কাছে হাত পাতৃতে বাধ্য হয়।

মাসআলাঃ মিসকীনের সাহায্য প্রার্থনা হালাল কিন্তু ফকীরের সাহায্য প্রার্থনা নাজায়েয। কারণ ওর কাছে খাবার ও শরীর ঢাকার কাপড় আছে। ওর বেলায় প্রয়োজনীয়তা ও অপারগতা ছাড়া সাহায্য প্রার্থনা করা হারাম। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ যাকাত উছুলকারককে, যাকে ইসলামী শাসক যাকাত উছুল করার জন্য নিয়োজিত করে থাকে, কাজ অনুসারে যেন এতটুকু দেয়া হয় যা ওর জন্য ও ওর সাহায্যকারীদের জন্য মোটামুটিভাবে যথেষ্ট হয়। তবে উছুলকৃত টাকার অর্ধেকের বেশী যেন না হয়। (দুর্রুল মুখতার ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ মুক্তিপণের শর্তযুক্ত গোলামকে যাকাত এ জন্য দেয়, যেন সে মুক্তিপণ আদায় করে নিজের মুনিব থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। (প্রায় কিতাবে আছে)

মাসআলাঃ কর্জ গ্রস্ত ব্যক্তি, যার উপর এতটুকু কর্জ আছে যে, তা বের করে ফেললে, নেছাব পরিমাণ সম্পদ থাকে না। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ আল্লাহর পথে ব্যয় করা। এর কয়েকটি উপায় আছে। যেমন কেউ জিহাদে যেতে চাচ্ছে কিন্তু ওর কাছে প্রয়োজনীয় আসবাব সামগ্রী নেই, তাহলে ওকে যাকাত দেয়া যায়, যদিওবা সে উপার্জনে সক্ষম, কেউ হজ্বে যেতে চায় কিন্তু ওর কাছে টাকা পয়সা নেই, ওকেও যাকাত দেয়া যায় কিন্তু ওর পক্ষে হজ্বের জন্য সাহায্য চাওয়া নাজায়েয, ছাত্র, যে দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করছে, ওকেও যাকাত দেয়া যায় বরং এধরণের ছাত্র যাকাত চেয়ে নিতে পারে যদি সে নিজেকে সেই শিক্ষা অর্জনের কাজে নিয়োজিত রাখে, যদিওবা সে উপার্জনে সক্ষম। প্রত্যক নেক কাজে যাকাত প্রদানটা আল্লাহর রাস্তায় বুঝায়, যদি মালিকত্ব দান পাওয়া যায়। মালিকত্ব দান ছাড়া যাকাত আদায় হতে পারে না। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ অনেক লোক যাকাতের মাল দ্বীনি প্রতিষ্ঠানসমূহে পাঠিয়ে দেয়। ওদের উচিত, সেটা যাকাত বলে কর্তৃপক্ষকে যেন বলে দেয়া হয়, যাতে কর্তৃপক্ষ আলাদা করে রাখে এবং গরীব ছাত্রদের জন্য খরচ করে, কোন কর্মচারীর বেতন যেন না দেয়। অন্যথায় যাকাত আদায় হবে না। (বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ মুসাফির যার কাছে টাকা পয়সা নেই, সে যাকাত গ্রহণ করতে পারে যদিওবা ওর ঘরে সম্পদ আছে। তবে অতটুকু গ্রহণ করবে, যদ্বারা প্রয়োজন মিটানো যায়, এর অতিরিক্তের অনুমতি নেই।

মাসআলাঃ যাকাত আদায় করার বেলায় এটা প্রয়োজন যে যাকে দেয়া হয় ওকে যেন মালিক বানিয়ে দেয়া হয়, অনুমতি যথেষ্ট নয়। তাই যাকাতের মাল

মসজিদে খরচ করা, মৃত ব্যক্তির কাফন দেয়া বা কর্জ আদায় করা, গোলাম আযাদ করা, পুল, মুসাফিরখানা, রাস্তা তৈরী করা, খাল বা কূপ খনন করা, কিতাব ইত্যাদি ক্রয় করে ওয়াকফ করে দেয়া, ইত্যাদি দ্বারা যাকাত আদায় হবে না, যতক্ষণ কোন ফকীরকে মালিক বানিয়ে দেয়া না হয়। অবশ্য ফকীর যাকাতের মালের মালিক হওয়ার পর নিজের পক্ষ থেকে ওসব কাজের জন্য খরচ করতে চাইলে করতে পারে (জাওহেরা, তানবীর, আলমগীরী)

মাসআলাঃ নিজের মূল (অর্থাৎ মা–বাপ, দাদা–দাদী, নানা–নানী ইত্যাদি এবং নিজের আওলাদ (অর্থাৎ ছেলেমেয়ে নাতি–নাতনী দৌহিত্র–দৌহিত্রী ইত্যাদি) কে যাকাত দেয়া যায় না। অনুরূপ ছদকায়ে ফিতর, শরয়ী মানত, কাফফারাও ওদেরকে দেযা যায় না। নফল ছদকা অবশ্য দেয়া যায় বরং দেয়াটা উত্তম।

(আলমগীরী দুর্রুল মুখতার ও বাহার)

মাসআলাঃ পুত্রবধু, জামাতা, সৎমা, সৎবাপ (মায়ের আগের স্বামী) স্ত্রীর আগের ঘরের সন্তান বা স্বামীর আগের ঘরে সন্তানকে যাকাত দেয়া যায়। আত্মীয় স্বজনগণ যাদের ভরণপোষণের জিম্মা যাকাত দাতার উপর, ওদেরকেও যাকাত দেয়া যায় যদি যাকাতকে ভরণ পোষণের হিসাবে ধরা না হয়। (রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে যাকাত দিতে পারে না। অবশ্য তালাক দেয়ার পর ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেলে দেয়া যায়।(দুর্রুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ ধনীর স্ত্রীকে যাকাত দেয়া যায়; যদি নেছাবের মালিক না হয়। অনুরূপ ধনীর পিতাকেও দেয়া যায়, যদি গরীব হয়। (আলামগীরী)

মাসআলাঃ ধনী ব্যক্তির নাবালেগ সন্তানকে যাকাত দেয়া যায় না কিন্তু বালেগ সন্তানকে দেয়া যায়, যদি ফকীর হয়। (দুর্রুল মুখতার, আলমগীরী) যে ব্যক্তি মূল ব্যবহারিক জিনিষ ছাড়া নেছাবের মালিক, ওকে যাকাত দেয়া নাজায়েয। অর্থাৎ মুল ব্যবহারিক জিনিষ ব্যতীত এতটুকু সম্পদ আছে, যার মূল্য দু'শত দিরহাম যদিওবা যেটার উপর যাকাত ওয়াজিব না হয় যেমন কারো কাছে ছয় তোলা স্বর্ণ আছে, যার মূল্য দু'শত দিরহাম যদিওবা ওর উপর যাকাত ওয়াজিব নয়, কারণ স্বর্ণের বেলায় ৭½ তোলা প্রয়োজন। তবুও ওকে যাকাত দেয়া যাবে না বা কারো কাছে বিশটি গাভী আছে, যার মূল্য দু'শত দিরহাম, তাহলে ওকে যাকাত দেযা যাবে না, যদিওবা বিশ গাভীর উপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

মাসআলাঃ ঘর, ঘরের আসবাব সামগ্রী, পরিধানের কাপড়, খাদেম, বাহনের পশু, হাতিয়ার, শিক্ষিত লোকের বই পুস্তক ইত্যাদি মুল ব্যবহারিক সামগ্রীর অন্তর্ভূক্ত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ সুস্থ সবল ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া যায় যদিওবা উপার্জনের ক্ষমতা রাখে কিন্তু ওর জন্য চাওয়া নাজায়েয। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ মণিমুক্তা ইত্যাদি যার কাছে আছে এবং তা যদি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে না হয়ে থাকে, তাহলে ওসবের যাকাত ওয়াজিব নয়। কিন্তু যদি নেছাব পরিমাণ মূল্যের হয়, তাহলে যাকাত গ্রহণ করবে না। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ বনী হাশেমকে যাকাত দেয়া যায় না। বনী হাশেম বলতে হযরত আলী, হযরত জাফর, হযরত আকীল, হযরত আব্বাস ও হযরত হারেছ ইবনে মতলবের বংশধরকে বুঝায়। (আলমগীরী, রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ যা হাশেমী বা সৈয়্যদা কিন্তু বাপ হাশেমী নয়, তাহলে হাশেমী হিসেবে গণ্য হবে না। কারণ শরীয়তের দৃষ্টিতে বংশ পরিচয় বাপের দিক থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং এ রকম লোককে যাকাত দেয়া যায়, যদি না দেয়ার অন্য কোন কারণ না থাকে। (বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ ছদকায়ে নফল ও ওয়াকফের জিনিষ বনী হাশেমকে দেয়া যায়। (দুর্রুল মুখতার ও বাহার)

মাসআলাঃ জিম্মি কাফিরকে যাকাত দেয়া যাবে না। ছদকায়ে ওয়াজেবা (যেমন, মানত, কাফিফারা ও ছদকায়ে ফিতর) ও দেয়া যাবে না। এবং আশ্রয় প্রাপ্ত কাফিরকে কোন প্রকারের ছদকা দেয়া জায়েয নেই যদিওবা সেই আশ্রয় প্রাপ্ত ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের ইসলামী শাসক থেকে নিরাপত্তা নিয়ে এসে থাকে। হিন্দুস্থান যদিওবা দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য, কিন্তু এখানকার কাফির জিম্মি নয়। তাই ওদেরকে ছদকায়ে নফল যেমন হাদিয়া ইত্যাদি দেয়াও না জায়েয। (বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ যাকাতের হকদার সম্পর্কিত যেসব লোকদের কথা বলা হয়েছে, ওদেরকে যাকাত দেয়া যাবে, তবে যাকাত উছুলকারক ছাড়া অন্যান্য সবার বেলায় ফকীর হওয়া শর্ত। আর মুসাফির যদি ধনীও হয় কিন্তু সফরকালে টাকা পয়সা না থাকলে, সে ফকীরের পর্যায়ভুক্ত। অন্য কাউকে ফকীর না হলে যাকাত দেয়া যাবে না। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ যাকাত ইত্যাদি প্রদানের ব্যাপারে আফজল হচ্ছে, প্রথমে নিজের ভাই বোনকে দেয়া। এর পর ওদের সন্তান সন্ততিকে। অতপর চাচা ও ফুফুদেরকে, অতপর ওদের সন্তান সন্ততিদেরকে, তারপর মামা ও খালাদেরকে, তাদের পরে তাদের সন্তান–সন্ততিদেরকে, (রদ্দুল মুহতার) হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির ছদকা কবুল করেনা, যার আত্মীয় স্বজন ওর

সাহায্যের মুহতাজ কিন্তু সে অন্যদেরকে প্রদান করে। (রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ বদমযহাবীকে যাকাত দেয়া নাজায়েয। (দুর্রুল মুখতার) অনুরূপ ওসব মুরতেদদেরকে প্রদান করলেও যাকাত আদায় হবে না, যারা মুখে ইসলামের দাবী করে কিন্তু আল্লাহ রসুলের শানে বেআদবী করে বা ধর্মীয় কোন প্রয়োজনীয় বিষয়কে অস্বীকার করে। (বাহার ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ যার কাছে আজকের খাবার মওজুদ আছে বা স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি উপার্জন করতে পারে, ওদের খাবার ভিক্ষা হারাম। তবে ভিক্ষা ছাড়া কেউ দিলে তা নেয়া জায়েয। আর যদি খাবার থাকে কিন্তু পরিধানের কাপড় নেই, তাহলে কাপড়ের সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে, অনুরূপ যুদ্ধরত ও দ্বীনি শিক্ষারত ব্যক্তির বেলায় সুস্থ ও উপার্জনক্ষম হলেও সাহায্য প্রার্থনা করার অনুমতি রয়েছে।
যার সাহায্য প্রার্থনা না জায়েয, ওর সাহায্য প্রার্থনায় দেয়াটাও নাজায়েয এবং প্রদানকারী গুনাহগার হবে। (দুর্রুল মুখতার ও বাহার)

মাসআলাঃ ভিক্ষা করাটা খুবই জিল্লতীপূর্ণ কাজ। প্রয়োজন ছাড়া ভিক্ষা না করা চায়। বিভিন্ন হাদীছসমূহ থেকে প্রমানিত আছে যে, প্রয়োজন ছাড়া ভিক্ষা করা হারাম। ভিক্ষাকারী হারাম খায়। (মুসলিম আবু দাউদ নাসাঈ ও অন্যান্য হাদীছ) রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াসাল্লিহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমায়ছেন, যে সাহায্য প্রার্থনা থেকে বাঁচতে চাইবে, আল্লাহ তাআলা ওকে এ কাজ থেকে বাঁচাবেন এবং যে ধনী হতে চায় আল্লাহ তাআলা ওকে ধনী করে দিবেন এবং যে সবর করতে চায়, আল্লাহ তাআলা ওকে সবর দান করবেন।

(বুখারী, মুসলিম তিরমিযী ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ)

আরও ফরমায়েছেন, যে বান্দা ভিক্ষার দরজা খুলবে, আল্লাহ তাআলা ওর জন্য আযাবের দরজা খুলবেন। (আহমদ আবু ইয়াল বযায ও তবরানী) আরও ফরমায়েছেন, যে, ভিক্ষা করে কিন্তু ওর কাছে এতটুকু আছে, যা ওকে চিন্তামুক্ত রাখে, তাহলে সে আগুনের আধিক্য কামনা করে। লোকেরা আরয করলেন, ওটা কতটুকু যা থাকলে ভিক্ষা করা জায়েয নেই। ফরমালেন, সকাল বিকালের খাবার। (আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান ও ইবনে খোযাইমা)

সদকায়ে ফিতরের বর্ণনা

রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াসাল্লিহি ওয়াসাল্লাম) ফরমায়েছেন, বান্দার রোযা আসমান ও জমীনের মাঝখানে লটকে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সদকায়ে ফিতর আদায় না করে। (দায়লমী, খতীব, ইবনে আসাকের)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। এর সময় সারা জীবন অর্থাৎ যদি আদায় না করে থাকে, তাহলে এখন আদায় করা যায়। আর আদায় না করলে বাতিল হয়ে যাবে না এবং যখনই আদায় করা হবে, কাযা হিসেবে গণ্য হবে না বরং আদা হিসেবে গণ্য হবে। তবে ঈদের নামাযের আগে আদায় করাটা সুন্নাত। (দুর্রুল

মাসআলাঃ ঈদের দিন সুবহে ছাদেক হওয়ার সাথে সাথে ছদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয়ে যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি সুবহে ছাদেকের আগে মারা গেল বা গরীব হয়ে গেল, সেই ব্যক্তির উপর ছাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হলো না। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ সুবহে ছাদেক শুরু হওয়ার পর যে শিশুর জন্ম হলো বা যে কাফির মুসলমান হলো বা যে গরীব সম্পদশালী হলো, ওদের উপর ছদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হলো না। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ সুবহে ছাদেক শুরু হবার আগে কাফির মুসলমান হলো বা শিশু জন্ম হলো বা যে গরীব ছিল, সে সম্পদশালী হয়ে গেল, তাহলে ছদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ যে সুবহে ছাদেক শুরু হওয়ার পর মারা গেল, ওর উপর ছদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ ছদকায়ে ফিতর প্রত্যেক মুসলমান আযাদ ও নেছাবের অধিকারীর উপর (মূল ব্যবহারিক সামগ্রী ব্যতীত যায় পূর্ণ নেছাব থাকে) ওয়াজিব। এতে বিবেকবান, বালেগ এবং বছর অতিবাহিত হওয়া, সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত নয়। (দুর্রুল মুখতার)

মাসআলাঃ নেছাবের অধিকারী পুরুষের উপর নিজের পক্ষ থেকে এবং নিজের ছোট ছেলে মেয়েদের পক্ষ থেকে ছদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। যদি শিশু নিজেই নিছাবের মালিক, তাহলে ওর সদকায়ে ফিতর ওর সম্পদ থেকে দেয়া যাবে। পাগল সন্তান বালেগ হলেও যদি সম্পদশালী নয়, তাহলে ওর ছদকায়ে ফিতর ওর বাপের উপর ওয়াজিব আর যদি সম্পদশালী হয়ে থাকে, তাহলে ওর সম্পদ থেকে দেয়া যাবে। (দুর্রুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার)

মাসআলাঃ ছদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য রোযা রাখাটা শর্ত নয়। যদি কোন ওজর যেমন সফর, রোগ, বার্ধক্যের কারণে বা খোদা না করুক কোন ওজর ছাড়া এমনিতে রোযা রাখলো না, তবুও ছদকায়ে ফিতর আদায় ওয়াজিব।

(রদ্দুল মুহতার ও বাহার)

মাসআলাঃ বাপ না থাকলে দাদা ব্যপের স্থলাভিসিক্ত হবে অর্থাৎ স্বীয় ইয়াতীম পরীর নাতি নাতনীর পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর দেয়াটা ওর উপর ওয়াজিব।

মাসআলাঃ নিজের স্ত্রী, এবং বিবেকবান বালেগ সন্তানের ছদকায়ে ফিতর ওর জিম্মায় নয়, যদিওবা পঙ্গু হয়ে থাকে এবং ওদের ভরণপোষণের জিম্মা ওর হয়ে থাকে। (দুর্রুল মুখতার ও বাহার)

ছদকায়ে ফিতরের পরিমাণঃ ছদকায়ে ফিতরের পরিমাণ হচ্ছে গম বা এর আটা বা সাতু অর্ধ ছাআ এবং খেজুর, মনাক্কা বা যব বা এর আটা বা সাতু এক ছাআ।

মাসআলাঃ গম বা যব দেয়ার চেয়ে ওগুলোর আটা দেয়া আফজল এবং এর থেকে আফজল হচ্ছে মুল্য দিয়ে দেয়া, তা গমের হোক বা যবের বা খেজুরের। কিন্তু দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকায় মূল্য দেয়ার চেয়ে খাদ্য সামগ্রী দেয়াটা আফজল আর যদি নিকৃষ্ট গম বা যবের মুল্য দেয়া হয়, তাহলে ভাল গম বা যবের মূল্য থেকে যা কম হবে, তা যেন পূর্ণ করে দেয়। (রদ্দুল মুহতার)

ছাআর পরিমাণঃ চূড়ান্ত যাচাই করার পর এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে এক ছাআর ওজন হচ্ছে তিনশ একান্ন চান্দির টাকার ওজনের সম পরিমাণ এবং অর্ধছাআর ওজন হচ্ছে একশ পাঁচাত্তর টাকার আট আনি ওজনের বরাবর। (ফতওয়ারে বেজভীয়া) আজকালকার প্রচলিত কেজি ওজনের হিসেবে এক ছাআ সমান প্রায় চার কেজি একশ গ্রাম এবং অর্ধ চা সমান প্রায় দু'কেজি পঞ্চাশ গ্রাম হয়ে থাকে।

মাসআলাঃ ছদকায়ে ফিতরের হকদার ওরাই, যারা যাকাতের হকদার অর্থাৎ যাদেরকে যাকাত দেয়া যায়, ওদেরকে ছদকায়ে ফিতরও দেয়া যায়; তবে যাকাত উছুলকারক ব্যতীত। কারণ ওকে ছাদকায়ে ফিতর দেয়া যাবে না।

(দুর্রুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার)

কুরবানীর বর্ণনা

কুরবানী একটি আর্থিক ইবাদত, যেটা সম্পদশালীর উপর ওয়াজিব। নির্দিষ্ট পশু নির্দিষ্ট দিনে আল্লাহর ওয়াস্তে ছওয়াবের নিয়তে জবেহ করাটা হচ্ছে কুরবানী। মুসলমান, মুকীম,নেছাবের অধিকারী আযাদের উপর এটা ওয়াজিব।

মাসআলাঃ যে রকম পুরুষের উপর কুরবানী ওয়াজিব, সে রকম মহিলার উপরও ওয়াজিব। (দুর্রুল মুখতার ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ মুসাফিরের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয় কিন্তু নফল হিসেবে করতে চাইলে করতে পারে ছওয়াব পাবে। (দুর্রুল মুখতার ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ নেছাবের অধিকারী হওয়া বলতে অতটুকু সম্পদ হওয়া বুঝায় যতটুকু সম্পদ হলে ছদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয় অর্থাৎ মূল ব্যবহারিক সামগ্রী

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যতীত দু'শত দেরহামের (৫২$\frac{১}{২}$ তোলা চান্দি বা ৭$\frac{১}{২}$ তোলা স্বর্ণ) মালিক হওয়া।

(দুরুল মুখতার, আলমগীরী ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি দু'শত দেরহাম বা বিশ দিনারের মালিক বা মূল ব্যবহারিক সামগ্রী ব্যতীত এমন কোন জিনিষের মালিক, যার মূল্য দু'শত দেরহাম, তাহলে সে ধনী হিসেবে বিবেচ্য, ওর উপর কুরবানী ওয়াজিব।(আলমগীরী)

কুরবানীর সময়ঃ ১০ই জ্বিলহজ্বের সুবহে ছাদেক থেকে বার তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত অর্থাৎ তিন দিন দু'রাত কুরবানীর সময়। তবে দশ তারিখ সবচে আফজল, এরপর এগার তারিখ তারপর বার তারিখ।

মাসআলাঃ শহরে ঈদের নামাযের পর কুরবানী করা শর্ত আর মফস্বলে যেহেতু ঈদের নামায নেই, সেহেতু সুবহে ছাদেক থেকে কুরবানী করতে পারে।

মাসআলাঃ কুরবানীর সময় কুরবানী করা আবশ্যক। সেই পরিমাণ মূল্য বা সেই পরিমাণ মূল্যের পশু ছদকা করে দিলে ওয়াজিব আদায় হবে না।(আলমগীরী)

মাসআলাঃ কুরবানীর দিন অতিবাহিত হওয়ার পর কুরবানী বাদ পড়ে গেল। এখন আর হবে না। যদি কোন পশু কুরবানীর জন্য ক্রয় করে থাকে, তাহলে সেটা ছদকা করে দিবে। অন্যথায় একটি ছাগলের মূল্য ছদকা করে দিবে।

(রদ্দুল মুহতার, আলমগীরী)

মাসআলাঃ যদি কুরবানীর শর্তসমূহ পাওয়া যায় (যা উপরে বর্ণিত হয়েছে) তাহলে একটি ছাগল বা ভেড়া জবেহ করা অথবা উট, গরু বা মহিষের সাতভাগের একভাগ ওয়াজিব। এর থেকে কম হতে পারে না। এমন কি যদি কোন অংশীদারের অংশ এক সপ্তাংশ থেকে কম হয়, তাহলে কারো কুরবানী শুদ্ধ হবে না। তবে সাতজন থেকে যদি কম অংশীদার হয় এবং অংশ কমবেশী হয় কিন্তু কারো অংশ এক সপ্তাংশ থেকে কম না হয়, তাহলে জায়েয।

মাসআলাঃ কুরবানীতে সকল অংশীদারের নিয়ত ছওয়াব অর্জনের হওয়া চায়। কেবল মাংস খাওয়ার নিয়ত যেন না হয়। সুতরাং আকীকাকারীও অংশীদার হতে পারে। (কারণ আকীকাতেও ছওয়াব অর্জনের নিয়ত হয়ে থাকে)(রদ্দুল মুহতার)

কুরবানীর নিয়মঃ কুরবানীর পশু জবেহকরার আগে শেষ পানি পান করাবেন। আগে থেকেই ছুরি ধারালো করে নিবেন, তবে পশুর সামনে নয়। পশুকে বাম পাশ করে শোয়াবেন যেন কিবলার দিকে মুখ হয় এবং জবেহকারী স্বীয় ডান পা ওটার রানের উপর রেখে ধারালো ছুরি দ্বারা তাড়াতাড়ি জবেহ করে দিবেন এবং জবেহের আগে এ দুআটি পড়ে নিবেনঃ

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ لَكَ وَمِنْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ أَكْبَرُ

দুআ শেষ হবার সাথে সাথে ছুরি চালিয়ে দিবেন। কুরবানী নিজের পক্ষ থেকে হলে জবেহ করার সময় এ দুআটি পড়বেন- اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِيْلِكَ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَحَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

জবেহের সময় রগচারটি কেটে দিবেন বা কমপক্ষে তিনটি কাটবেন। এর থেকে অধিক কাটবেন না যেন ছুরি হাড় পর্যন্ত পৌছে না যায়, কারণ এটা অনর্থক কষ্ট দেয়া। ঠান্ডা হওয়ার পর পা কাটবেন এবং চামড়া ছাড়াবেন। যদি অন্যের পক্ষ থেকে জবেহ করা হয়, তাহলে مِنِّيْ এর স্থলে مِنْ فُلَانٍ (অমুকের নামে) বলবেন। আর যদি অংশীদারী পশু হয় যেমন গরু উট মহিষ, তখন অমুকের জায়গায় সকল অংশীদারের নাম বলবেন।

মাসআলাঃ যদি অন্যের দ্বারা জবেহ করানো হয়, তাহলে নিজেও উপস্থিত থাকা উত্তম।

মাংস ও চামড়াঃ যদি অংশীদারী পশু হয়, তাহলে মাংস যেন ওজন করে ভাগ করা হয়। আন্দাজ করে যেন বন্টন করা না হয়। কারণ যদি কারো কাছে বেশী যায়, তাহলে সে মাফ করে দিলেও জায়েয হবে না কারণ সেটা শরীয়তের হক। (রদ্দুল মুহতার ও বাহার) অতপর নিজের ভাগকে পুনরায় তিন ভাগ করে এক ভাগ ফকীরদেরকে, একভাগ বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে দিবে এবং একভাগ নিজের পরিবার পরিজনের জন্য রাখবে, নিজেও খাবে এবং ছেলেমেয়েদেরও খাওয়াবে। যদি পরিবারের লোক সংখ্যা বেশী হয়, তাহলে সম্পূর্ণ ঘরের জন্য রেখে দেয়া যায়, আবার সম্পূর্ণ ছদকা করে দিতে চাইলেও দেয়া যায়; যদিওবা একভাগ নিজের জন্য রাখা উত্তম।

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী দেয়া হলে, সেটার মাংসেরও একই হুকুম। অবশ্য মৃত ব্যক্তি যদি ওসীয়ত করে যায় যে ওর পক্ষ থেকে যেন কুরবানী দেয়া হয়, তাহলে এ অবস্থায় যেন সম্পূর্ণ মাংস ছদকা করে দেয়া হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ কুরবানী যদি মৃতব্যক্তির হয়, তাহলে এর মাংস নিজেও খেতে পারে না এবং ধনীদেরকেও খাওয়াতে পারে না বরং একে ছদকা করে দেয়া ওয়াজিব। (খায়লমী ও বাহার)

মাসআলাঃ ঈদুল আযহার দিন কুরবানীকারী যেন সবার আগে কুরবানী মাংস খায়। এটা মুস্তাহাব। (বাহারুর রায়েক)

মাসআলাঃ কুরবানীর মাংস যেন কাফিরকে দেয়া না হয়। (কারণ এখানকার কাফিরগণ হচ্ছে আশ্রয়প্রাপ্ত)

মাসআলাঃ চামড়া, ভুড়ি, রশি, হাড় ইত্যাদি যেন ছদকা করে দেয়া হয়, চামড়া ইচ্ছে করলে নিজের কাজেও লাগানো যায়। যেমন মুশক, জায় নামায, বিছানা ইত্যাদি বানানো যায়। কিন্তু বিক্রি করে এর মূল্য নিজের কাজে লাগানো নাজায়েয। যদি বিক্রি করা হয়, তাহলে এর মূল্য ছদকা করে দেয়া ওয়াজিব।

মাসআলাঃ আজকাল প্রায় লোক চামড়া মাদ্রাসায় দিয়া দেয়। এটা জায়েয। যদি মাদ্রাসায় দেয়ার নিয়তে চামড়া বিক্রি করে এর মূল্য মাদ্রসায় দিয়া দেয়, তাও জায়েয আছে। (আলমগীরী ও বাহার)

মাসআলাঃ কুরবানীর মাংস বা চামড়া কসাই বা জবেহকারীকে পারিশ্রমিক হিসেবে দেয়া যায় না। অবশ্য আত্মীয় স্বজনের মত হাদিয়া হিসেবে ভাগ দিতে চাইলে দেয়া যায়। তবে যেন পারিশ্রমিকের অন্তর্ভূক্ত মনে করা না হয়।(হেদায়া)

মাসআলাঃ অনেক জায়গায় কুরবানীর চামড়া মসজিদের ইমামকে দিয়ে দেয়া হয়। যদি বেতন হিসেবে দেয়া না হয় বরং সাহায্য হিসেবে দেয়া হয়, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। (বাহারে শরীয়ত)

কুরবানীর পশুঃ উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, নর, মাদী বা খাসী হোক, সবের দ্বারা কুরবানী হতে পারে। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ বন্য পশু যেমন হরিণ, নীল গরু (বন্য গরু) ইত্যাদির কুরবানী হতে পারে না। (আলমগীরী)

মাসআলাঃ দুম্বা ভেড়ার অন্তর্ভূক্ত।

মাসআলাঃ উট পাঁচ বছর, গরু ও মহিষ দু'বছর, ভেড়া ছাগল এক বছর বয়স বা এর অধিক হতে হবে। এর থেকে কম বয়সের নাজায়েয। তবে দুম্বা বা ভেড়ার ছয় মাস বয়সের বাচ্চা যদি এতটুকু বড় হয় যে দুর থেকে দেখলে এক বছর বয়স্কের মনে হয়, তাহলে সেটার কুরবানী জায়েয।

মাসআলাঃ কুরবানীর পশু মোটা তাজা এবং ভাল হওয়া চায়। দোষত্রুটি মুক্ত হওয়া চায়। যৎসামান্য দোষত্রুটি থাকলে কুরবানী হয়ে যাবে তবে মকরূহ হবে। আর যদি দোষত্রুটি বড় আকারের হয়, তাহলে কুরবানী হবেই না।

(দুরুল মুখতার রদ্দুল মুহতার আলমগীরী)

মাসআলাঃ জন্মগত শিংবিহীন হলে জায়েয আছে। অবশ্য যদি শিং ছিল কিন্তু ভেঙ্গে গেছে, তাহলে মজ্জা সহ ভেঙ্গে গেলে না জায়েয আর এর থেকে কম ভাংলে জায়েয। (আলমগীরী ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ অন্ধ, কানা খোড়া কানকাটা লেজ কাটা দাঁতহীন ঠোঁট কাটা, নাক কাটা জন্মগত কান বিহীন, রোগা, খিজরা জাতীয়, আবর্জনা ভোজী ইত্যাদি দোষযুক্ত পশুর দ্বারা কুরবানী জায়েয নেই। (দুরুল মুখতার, বাহার)

মাসআলাঃ রোগ যদি মামুলী হয় বা খোড়াটা যদি সামান্য হয়, কুরবানীর জায়গা পর্যন্ত যেতে পারে, বা নাক, কান, লেজ এক তৃতীয়াংশ থেকে কম কাটা হয়, তাহলে কুরবানী জায়েয। (দুরুল মুখতার, হেদায়া আলমগীরী)

মাসআলাঃ কুরবানী করার সময় পশু লাফালাফি করলো এবং এর ফলে আহত হলে অর্থাৎ দোষযুক্ত হলে কোন ক্ষতি নেই। (দুরুল মুখতার)

মাসআলাঃ কুরবানী করার পর পেটে জীবিত বাচ্চা দেখা গেল, তাহলে সেটাকেও জবেহ করে দিবে এবং কাজে লাগাতে পারবে আর যদি মৃত হয় তাহলে ফেলে দিবে। (বাহার শরীয়ত)

মাসআলাঃ ক্রয় করার পর কুরবানীর আগে পশু বাচ্চা প্রসব করলো, তাহলে সেটাও জবেহ করে দিবে আর যদি বিক্রি করে ফেলা হয়, তাহলে এর মূল্য যেন ছদকা করে দেয়া হয় আর যদি কুরবানীর সময়ের মধ্যে জবেহ করা না হয়, তাহলে জীবিত ছদকা করে দিবে। (আলমগীরী, বাহার)

ফায়দাঃ আমাদের প্রিয় আকা ও মওলা হযরত আহমদ মুজতাবা মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) এর সার্বজনীন মেহেরবানী দেখুন। তিনি স্বয়ং তাঁর মৃত উম্মতের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছেন এবং সেই সময়ও উম্মতের কথা স্মরণ রেখেছেন। তাই এটা বড় সৌভাগ্যের বিষয় হবে, যার পক্ষে সম্ভব, সে যেন হুযুরের নামে কুরবানী করে। (বাহার)

আক্বীকা

শিশু জন্মের পর শুকরিয়া স্বরূপ যে পশু জবেহ করা হয়, সেটাকে আক্বীকা বলে। আক্বীকা মুস্তাহাব। এর জন্য সপ্তম দিবসই উত্তম। যদি সপ্তম দিবসে করা সম্ভব না হয়, তাহলে যখন সম্ভব হয়, তখন করবে, এতে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ ছেলের জন্য দুটি ছাগল এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল যেন জবেহ করা হয়। ছেলের জন্য নর পশু এবং মেয়ের জন্য মাদী পশু সমীচীন। তবে এর বিপরীত হলেও ক্ষতি নেই। আর ছেলের জন্য দুটি সম্ভব না হলে একটি ছাগল হলেও কোন ক্ষতি নেই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলাঃ যদি গরু, মহিষ জবেহ করা হয়, তাহলে ছেলের জন্য দুসপ্তমাংশ এবং মেয়ের এক সপ্তমাংশ যথেষ্ট।

মাসআলাঃ কুরবানীর পশুর সাথে আকীকাও শরীক করা যায়। আকীকার পশুর জন্যও সে শর্তসমূহ প্রযোজ্য, যা কুরবানীর পশুর জন্য নির্দিষ্ট।

মাসআলাঃ আকীকার মাংস ফকীর, আপনজন ও বন্ধুবান্ধবদেরকে কাঁচা বন্টন করে দিতে পারে বা রান্না করে দিতে পারে, অথবা যিয়াফতের মত দাওয়াত দিয়ে খাওয়াতেও পারে, সব রকমের জায়েয আছে।

মাসআলাঃ ভবিষ্যত মঙ্গলের জন্য হাড়সমূহ না ভাঙ্গাটাই উত্তম। তবে ভাঙ্গাটা নাজায়েয নয়। মাংস যেভাবে ইচ্ছে পাকানো যায়। কিন্তু মিষ্টি করে পাকানোটা ছেলের চরিত্র ভাল হওয়ার সহায়ক মনে করা হয়।

মাসআলাঃ আকীকার মাংস মা-বাপ দাদা-দাদী সবাই খেতে পারে।

মাসআলাঃ আকীকার চামড়ার সেই হুকুম, যা কুরবানীর চামড়ার জন্য বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ নিজের কাজে লাগাতে পারে বা গরীবদেরকে দিয়া দিতে পারে অথবা অন্য কোন সৎকাজে বা মাদ্রাসা-মসজিদে দিতে পারে।

মাসআলাঃ আকীকার পশু জবেহ করার সময় যেন এ দুআ পড়া হয়ঃ

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ اِبْنِىْ فُلَان

دَمُهَا بِدَمِهٖ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لِاِبْنِىْ مِنَ النَّارِ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۔

(নিজে জবেহ করলে ابن فلان এর স্থলে যেন ছেলের নাম বলা হয় আর যদি অন্য কেউ জবেহ করে তাহলে ابن فلان এর স্থলে ছেলের নাম ছেলের বাপের নাম যেন নেয়া হয়।)

যদি মেয়ে হয়, তাহলে এ দুআটি যেন পড়া হয়ঃ اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ بِنْتِىْ فُلَانَة

اِبْنَتِىْ ফলান এর জায়গায় যেন নাম বলা হয়। অন্যের মেয়ে হলে,

এর পরিবর্তে بنت فلان বলার পর মেয়ের বাপের নাম যেন বলা হয়)

এ দুআটি জানা না থাকলে কেবল بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে জবেহ করলে আকীকা হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়ত)

وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ وَعِلْمُهٗ اَحْكَمُ وَاَتَمُّ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Gift By—
MOIDUL ISLAM REZVI
—
Syed Mostafa Sakib
9775558085
HOWRAH, W.B.

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

-ঃ প্রকাশক ঃ-

মোঃ সাঈদুর রাহামান আশরাফী

সাঈদ বুক ডিপো

কালিয়াচক (নিউ মার্কেট) রুম নং-৫০

জেলা মালদহ (পঃবঃ) ৭৩২২০১

ফোন ঃ ০৩৫১২-২৪৪১৪৮

মোবাইল ঃ ৯৯৩৩৪৯৪৬৭০